Saga of the Hindu Mythology

হিন্দু পুরাণ

মুহম্মদ ইফতেখারুল ইসলাম খান

প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪১৮/অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২
স্বত্ব : লেখক
প্রকাশক : মিঠু কবির
অয়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার *(তৃতীয় তলা)*,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ০১৮১৮০০৫২১৯
ই-মেইল : ayanprokashon@gmail.com
প্রচ্ছদ : অচিনপাখি
বর্ণবিন্যাস : অয়ন কম্পিউটার্স
পরিবেশক : উত্তরণ, বাংলাবাজার
জাগৃতি, প্যাপিরাস
আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
মুদ্রণ : সাদাত প্রেস, কবিরাজ গলি, শাঁখারিবাজার, ঢাকা– ১১০০

মূল্য : ৪৫০ টাকা

ISBN-978-984-8212-68-4

Hindu Puran
(Saga of the Hindu mythology)
by **Muhammad Iftekharul Islam Khan**
Published by Ayan Prakashhan
islami tower *(2nd floor)*, banglabazar, Dhaka-1100
e-mail : ayanprokashon@gmail.com
Price : Taka 450
US $ 20

গ্রন্থকারের কথা

আমরা বাঙালিরা মুসলিম আর সনাতন এ দু টি প্রধান ধর্ম বিশ্বাসে বিভক্ত আছি। শান্তি, সহিষ্ণুতা ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের সমাজের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করছে। একের ধর্ম বিশ্বাস অপরে জ্ঞাত হবেন এটিই স্বাভাবিক। পবিত্র কুরআনের উদ্বোধনি অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ শুনে অনেক অ-মুসলিম আমার সম্মুখে অবাক বিস্ময়ে এর নিবেদনের চমৎকারিত্ব অনুভব করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি বাক্য শুনে নিশ্চিত ধারণা করেছেন যে, এটি পরম প্রভু হতে অবতারিত। এর বাণি অমৃতময়; এ বাণি মর্মের গভীরে অনুভূত হয়! অন্যদিকে সনাতন ধর্ম মতের প্রধানতম গ্রন্থ বেদ। এর অর্থ জ্ঞান। এটি পাঠ করলে অনুধাবন করা যায় ধর্মীয় মোড়কে কত গভীর জ্ঞান এতে লুক্কায়িত আছে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আরব অধিকারে আসার পর আরব পণ্ডিতেরা তাঁদের গ্রন্থরাজি পাঠ করে নিজেরা মহাপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। জ্ঞানের প্রবাহ নিরর্গলিত থাকা প্রয়োজন। জ্ঞান তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি বলে টিকে থাকবে। জ্ঞানের সঙ্গে অসারতা মিশ্র থাকলে তা অপনোদিত হবে। পুরাণকাহিনির বিশ্বাস প্রসঙ্গে কিছু না বলে এর সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। প্রাচীনের মর্যাদা অনন্য। পুরাকালে কবে কোন সম্রাট স্তম্ভ গাত্রে খোদাই করে লিখে গেছেন অমোঘ বাণি, 'সত্য মেব জয়তে'– 'ট্রুথ অ্যালোন ট্রিয়াম্ফ্'। কালের প্রবাহে ভেসে গেছে তার রাজ্য-রাজধানি; অথচ অমলিন থেকে গেছে সে অমোঘ বাণি। অতীত গর্ভে সম্রাট শাহ্জাহান রয়েছেন অতল তল; তাঁর গাঁথা প্রেমহার আগ্রায় আজও শুভ্র সমুজ্জ্বল। কোথা আজ কালিদাস? তাঁর কণ্ঠে আজও আছে যক্ষের বিরহি হৃদয়ের দির্ঘশ্বাস। পুরাণকাহিনি পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় সে প্রশ্ন থাক, লেখনীতে সে কাহিনি চলৎশক্তি পাক। এ কাহিনির বর্ণনা অপূর্ব-অদ্ভুত। ঘটনার ঘনঘটা এতো অধিক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে যে, মনে হবে এটি কল্পনার চেয়েও অধিক কল্পনাময়। এটি রূপময়, রসময়। কখনও বীর রসে সিক্ত, কখনও শৃঙ্গার রসে। ওল্ডটেস্টামেন্টের জেনেসিস পর্বে সৃষ্টির মহারহস্য উদ্ঘাটিত আছে। এ পুরাণকাহিনিতেও সৃষ্টির বিভিন্ন পর্ব বিবৃত আছে। এ সৃষ্টির মাঝে সুন্দরতম সৃষ্টি হচ্ছে অপ্সরাগণ। অপ্ (জল) হতে এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের সংখ্যা

৬০ কোটি। প্রধান অপ্সর রমণি হচ্ছেন : ১. উর্বশি, ২. তিলোত্তমা, ৩. রম্ভা ও ৪. মানেকা। প্রত্যেকে চরমতম সুন্দরি। প্রত্যেকে চির যৌবনা-মৌবনা; সুকান্তা, সুবর্ণা, সুদন্তা, সুকুন্তলা, সুলোচনা, সুহাসিনি ও সুমধুর ভাষিনি! তাঁদের কণ্ঠ মুরলি ধ্বনি সদৃশ্য মুররি মনোহর। তাঁদের গাত্র বর্ণ যথাক্রমে সাদা কুন্দ ফুলের মতো, লাল মন্দার ফুলের মতো, হলুদ অনুপম রম্ভার মতো ও গৈরিক। দেবগণ তাঁদের রূপে মোহিত থাকেন। তাঁদের বিবসন উপস্থিতি যোজন যোজন কাল যাবত ধ্যানমগ্ন ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করে। এমনতর চমৎকার ঘটনারাজিতে এ লেখা ভরপুর।

এ লেখায় প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসৃত হয়েছে। পাণিনিকৃত শব্দ প্রকরণে শব্দাংশে কোথাও দির্ঘস্বর প্রয়োগ করা না হয়ে থাকলে সে শব্দে দির্ঘস্বর-এর পরিবর্তে হ্রস্বস্বর প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন– কর্ম-চর–কর্তৃ-ণিন = কর্মচারি (কর্মচারী নয়), অনু-যা-ণিনি = অনুযায়ি (অনুযায়ী নয়), অনু-যুজ-যঞ-ইনি = অনুযোগি (অনুযোগী নয়), আগম-ণিনি = আগামি (আগামী নয়), ইদম-দৃশ-টক্ = ইদৃশ (ঈদৃশ নয়), আপ-সন-ক্ত = ইপ্সিত (ঈপ্সিত নয়), উৎ-আস-কালচ = উদাসিন (উদাসীন নয়), উৎ-হা-ড = উর্ধ (উর্ধ নয়), ঋণ-ইন = ঋণি (ঋণী নয়), এক + চ্বি + ভূ + ঘঞ = একিভাব (একীভাব নয়), আ-কৃ-কর্ম-ক্ত = আকির্ণ (আকীর্ণ নয়), ক্ষয়-ইন = ক্ষয়ি (ক্ষয়ী নয়), গ্রহ-কর্ম-ক্ত = গৃহিত (গৃহীত নয়), জ-কর্তৃ-ক্ত =জির্ণ (জীর্ণ নয়), তপস-বি-ণ = তপস্বি (তপস্বী নয়), তৃ-করণ-ই = তরি (তরী নয়), তপ-ণিনি = তাপি (তাপী নয়), তিজ-কর্তৃ-ক্সন = তিক্ষ্ণ (তীক্ষ্ণ নয়)। এটিই গৃহিত বানান রীতি।

তারিখ : এপ্রিল, ২০০৯

মুহম্মদ ইফতেখারুল ইসলাম খান
জেলা প্রশাসক
বগুড়া

হিন্দু পুরাণ

মুহম্মদ ইফতেখারুল ইসলাম খান

বাঙালির ধর্ম ও প্রাচীন বিশ্বাস ১৭
অ
অগস্ত্য ১৯
অক্ষয় ২১
অগ্নি ২১
অগ্নিপুরাণ ২৩
অঙ্গ ২৩
অঙ্গদ ২৪
অজ ২৪
অজাতশত্রু ২৫
অর্জুন ২৫
অদিতি ২৭
অনন্ত ২৭
অন্ধক ২৭
অন্ধ্রদেশ ২৮
অনসূয়া ২৮
অথর্ববেদ ২৯
অনঙ্গ ২৯
অনিরুদ্ধ ২৯
অপরাজিতা ২৯
অপ্সরা ৩০
অবতার ৩০
অভিমন্যু ৩২
অমরাবতি ৩৩
অম্বরিষ ৩৩
অমোঘা ৩৩
অম্বা ৩৪
অমৃত ৩৪
অশ্বিনিকুমার ৩৫
অযোধ্যা ৩৬
অরুন্ধতি ৩৬
অলকা ৩৬
৩৬ অশ্বত্থামা
৩৭ অশ্বমেধ
৩৭ অশ্বিনী
৩৮ অষ্টাবক্র
৩৮ অসুর
৩৯ অহল্যা
আ
৪০ আদিত্য
৪০ অরাবণ কি অরাম
৪১ অরোধ্য প্রমীলা
৪১ অংশুমান
৪১ আর্য
৪২ আয়ান
৪২ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র
৪৪ আয়ু
ই
৪৪ ইক্ষ্বাকু
৪৪ ইন্দুমতি
৪৫ ইন্দ্র
৪৯ ইন্দ্রজিৎ
৪৯ ইন্দ্রদ্যুম্ন
৫০ ইন্দ্রধনু
৫০ ইন্দ্রসেন
৫০ ইন্দ্রাণি
৫১ ইরাবতি
৫১ ইলা
ঈ
৫১ ঈশ্বর
উ
৫১ উগ্র
৫১ উতঙ্ক
৫৩ উত্তর

উত্তম ৫৪
উত্তরা ৫৪
উদ্দালক ৫৪
উপমন্যু ৫৫
উপরিচরবসু ৫৬
উর্ব ৫৭
উর্বশি ৫৭
উমা ৫৯
উলূপি ৫৯
উশিনর ৬০
উপনিষদ ৬০
উষা ৬১
ঋ
ঋক্ষরজা ৬১
ঋগ্‌বেদ ৬১
ঋচিক ৬২
ঋত্বিক ৬৩
ঋষি ৬৩
ঋষ্যশৃঙ্গ ৬৪
ঋষভ ৬৪
এ
একলব্য ৬৫
ও
ওঘবতি ৬৫
ওম্‌ ৬৬
ঔ
ঔব ৬৭
ক
কচ ৬৭
কর্কোটক ৬৮
কর্দম ৬৯
কদ্রু ৬৯
কর্ণ ৭১
কন্দর্প ৭১
কণ্ব ৭২
কবন্ধ ৭২
কমলা ৭৩
কল্পতরু ৭৩
কলাবতি ৭৩
কবিরাজ পণ্ডিত ৭৪
কলি ৭৪
কল্মাষপাদ ৭৪
কশ্যপ ৭৫
কংস ৭৬
কংসবতি ৭৭
কপিল ৭৭
কপিলা ৭৮
কমলযোনি ৭৮
ককুৎস্থ ৭৯
কার্তিকেয় ৭৯
কার্তবীর্য ৮০
কামগীতা ৮১
কাম ৮১
কামধেনু ৮২
কালনেমি ৮২
কালপুরুষ ৮২
কালি ৮৩
কিন্নর ৮৪
কিচক ৮৪
কুন্তি ৮৫
কুবলাশ্ব ৮৫
কুবের ৮৬
কুমার ৮৭
কুম্ভি বা কুম্ভযোনি ৮৭
কুম্ভকর্ণ ৮৭
কুরু ৮৮
কুরুক্ষেত্র ৮৮
কৃষ্ণ ৮৮

কৃষ্ণা ৯৩
কেশিনি ৯৩
কৈকেয়ি ৯৪
কৈটভ ৯৪
কৈলাস ৯৫
কৌশিক ৯৫
ক্রোধ ৯৬
খ
খাণ্ডবদাহ ৯৬
গ
গন্ধর্ব ৯৬
গঙ্গা ৯৭
গঙ্গাধর ১০০
গদ ১০০
গণেশ ১০০
গয় ১০২
গরুড় ১০৩
গান্ধারি ১০৪
গালব ১০৬
গাণ্ডিব ১০৭
গীতা ১০৮
গুণকেশী ১০৮
গোকুল ১০৯
গোবর্ধন ১০৯
গৌতমি ১০৯
গৌরি ১১০
ঘ
ঘটোৎকচ ১১১
চ
চ্যবন ১১১
চতুর্মুখ ১১৩
চতুর্বেদ ১১৩
১১৪ চণ্ডি
১১৪ চন্দ্র
১১৫ চন্দ্রবতি
১১৫ চন্দ্রবংশ
১১৫ চন্দ্রলেখা
১১৫ চন্দ্রশেখর
১১৫ চন্দ্রহাস
১১৬ চরক
১১৭ চারুমতি
১১৭ চিত্রগুপ্ত
১১৭ চিত্ররথ
১১৮ চিত্রসেন
১১৯ চিত্রাঙ্গদা
১১৯ চণ্ডিদাস
১১৯ চৈতন্য
ছ
১২১ ছায়া
জ
১২১ জগন্নাথ
১২২ জটাধর
১২২ জটায়ু
১২৩ জড়ভরত
১২৪ জতুগৃহ
১২৪ জনমেজয়
১২৫ জমদগ্নি
১২৭ জয় ও বিজয়
১২৭ জয়দ্রথ
১২৮ জরৎকারু
১৩০ জরাসন্ধ
১৩০ জলন্ধর
১৩১ জানকি
১৩১ জাম্বুবান

জাহ্নবি ১৩১
জৈগীষব্য ১৩১
জৈমিনি ১৩২
ড
ডিম্বক ১৩২
ডুণ্ডুভ ১৩৩
ত
তন্ত্র ১৩৩
তক্ষক ১৩৪
তপতি ১৩৫
তাড়কা ১৩৬
তারকাসুর ১৩৬
তালজঙ্ঘা ১৩৭
তিলোত্তমা ১৩৭
তুলসি ১৩৮
তৃষ্ণা ১৩৯
তুকারাম ১৩৯
ত্রিজট ১৪০
ত্রিজটা ১৪০
ত্রিপুর ১৪০
ত্রিমূর্তি ১৪১
ত্রিশঙ্কু ১৪১
দ
দক্ষ ১৪১
দন্তবক্র ১৪২
দময়ন্তি ১৪২
দশরথ ১৪৪
দশাবতার ১৪৫
দশাশ্বমেধ ১৪৬
দংশ ১৪৬
দিবোদাস ১৪৬
দিলীপ ১৪৭
১৪৭ দীর্ঘতমা
১৪৮ দুর্গা
১৪৯ দুর্যোধন
১৫০ দুষ্মন্ত
১৫০ দ্রুপদ
১৫১ দুঃশলা
১৫১ দুঃশাসন
১৫১ দেবকি
১৫২ দেবতা
১৫২ দেবগুরু
১৫২ দেবযানি
১৫৩ দেবি
১৫৪ দ্রোণ
১৫৬ দ্রোণাচার্য
১৫৭ দ্রৌপদী
ধ
১৫৮ ধন্বন্তরি
১৫৯ ধর্মধ্বজ
১৬০ ধনঞ্জয়
১৬০ ধর্মছেলে
১৬০ ধুন্ধুমার
১৬১ ধিকপ্রচেত
১৬১ ধৃতরাষ্ট্র
১৬২ ধ্রুব
ন
১৬৩ নকুল
১৬৩ নক্ষত্র
১৬৩ নটরাজ
১৬৪ নন্দ
১৬৪ নন্দনকানন
১৬৪ নন্দিনি
১৬৪ নন্দিগ্রাম
১৬৫ নভগ

নরক ১৬৫
নর-নারায়ণ ১৬৫
নরসিংহ ১৬৬
নল ১৬৬
নলরাজা ১৬৭
নাগ ১৬৭
নানক ১৬৮
নারদ ১৬৯
নারায়ণ ১৬৯
নচিকেতা ১৬৯
নিত্যানন্দ ১৭১
নিশুম্ভ ১৭২
নীল ১৭২
নীলকণ্ঠ ১৭২
নীললোহিত ১৭৩

প

পিতা ১৭৩
পঞ্চচূড়া ১৭৪
পঞ্চপাণ্ডব ১৭৪
পঞ্চবট ১৭৪
পঞ্চবটিবন ১৭৪
পবন ১৭৪
পরশুরাম ১৭৪
পরাবসু ১৭৬
পশুপতি ১৭৭
পাণ্ডু ১৭৭
পার্বতি ১৭৮
পিনাকি ১৭৮
পিনাকপানি ১৭৮
পুণ্ড্রদেশ ১৭৮
পদ্মিনি ১৭৯
পাণিনি ১৭৯
পিতৃহৃদয় ১৭৯
পুরাণ ১৮০
১৮০ পুলস্ত্য
১৮০ পুরুষোত্তম
১৮০ পুষ্পক
১৮১ পুষ্পদন্ত
১৮১ পৃথ্বিরাজ
১৮২ পৃথু
১৮২ প্রতাপাদিত্য
১৮৩ প্রদ্যুম্ন
১৮৪ প্রমথ
১৮৪ প্রলয়
১৮৪ প্রমিলা
১৮৪ প্রহ্লাদ
১৮৫ প্রিয়ম্বদা

ফ

১৮৫ ফলবতি

ব

১৮৫ বক
১৮৬ বরুণ
১৮৭ বলরাম
১৮৭ বল্লালসেন
১৮৮ বভ্রুবাহন
১৮৮ বলি
১৮৯ বশিষ্ঠ
১৮৯ বসু
১৮৯ বসুদেব
১৯০ বাণভট্ট
১৯০ বাতাপি
১৯০ বামন
১৯১ বাল্মীকি
১৯২ বালি
১৯২ বাসুদেব
১৯২ বিজয়সেন
১৯৩ বিদুর

বিদ্যাদেবি ১৯৩
বিনতা ১৯৫
বিরূপাক্ষ ১৯৫
বিশাখ ১৯৫
বিশল্যকরণি ১৯৫
বিরাটরাজ ১৯৬
বিশাখদত্ত ১৯৬
বিশ্বকর্মা ১৯৬
বিশ্বামিত্র ১৯৬
বিধিবাম ১৯৭
বিক্রমাদিত্য ১৯৭
বিশ্রবা ১৯৮
বিভীষণ ১৯৮
বিষ্ণুশর্মা ১৯৯
বিষ্ণু ১৯৯
বীরবাহু ২০০
বীরভদ্র ২০১
বুদ্ধ ২০২
বৃন্দা ২০৩
বৃন্দাবন ২০৩
বৃহন্নলা ২০৩
বৃহস্পতি ২০৩
বেদ ২০৫
বেদব্যাস ২০৬
দেবান্ত ২০৭
বেণ ২০৭
বৈকুণ্ঠ ২০৭
ব্যোমকেশ ২০৭
ব্যোমাসুর ২০৭
ব্রহ্ম ২০৮
ব্রহ্মদত্ত ২০৮
ব্রহ্মা ২০৮
ব্রাহ্মণ ২০৯

ভ

ভগবানের অবতার ২০৯
ভগদত্ত ২১০
ভগীরথ ২১০
ভরত ২১১
ভরদ্বাজ ২১২
ভানুমতি ২১২
ভাস্করাচার্য ২১২
ভিম ২১৩
ভিমসেন ২১৩
ভিষ্ম ২১৩

ম

মতঙ্গ ২১৪
মৎস্যদেশ ২১৫
মদন ২১৫
মধুছন্দা ২১৬
মধুমতি ২১৬
মনসা ২১৬
মন্থরা ২১৭
মন্দকিনি ২১৮
মরুৎ ২১৮
মহাকাল ২১৯
মহাদেব ২১৯
মহাপ্রলয় ২২৪
মহাপুরাণ ২২৪
মহাবিদ্যা ২২৪
মহাভারত ২২৪
মহাশ্বেতা ২২৫
মহিষাসুর ২২৫
মহেশ্বর ২২৫
মাধবি ২২৬
মানসপুত্র ২২৭

মারিচ ২২৭
মৃত্যু ২২৮
মিনাক্ষি ২২৮
ময় ২২৮
মহানন্দ ২২৯
মান্ধাতা ২২৯
মুচকুন্দ ২৩০
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ২৩০
মেঘনাদ ২৩০
মেনকা ২৩১
মৈত্রেয়ি ২৩১
মৈনাক পর্বত ২৩২

য

যক্ষ ২৩২
যজুর্বেদ ২৩৩
যম ২৩৪
যদু ২৩৪
যযাতি ২৩৫
যুধিষ্ঠির ২৩৫
যোগেশ্বর ২৩৭

র

রক্তবীজ ২৩৭
রতি ২৩৮
রত্নাকর ২৩৮
রম্ভা ২৩৯
রাক্ষস ২৪০
রাধা ২৪১
রাবণ ২৪২
রামচন্দ্র ২৪৬
রামায়ণ ২৪৯
রুদ্র ২৫১
রুরু ২৫৩
রেবতি ২৫৪
রণজিৎসিংহ ২৫৪
রাগ ও রাগিনী ২৫৫
রামমোহন রায় ২৫৫
রামপ্রসাদ সেন ২৫৬
রামানন্দ রায় ২৫৭
রামানুজ ২৫৭

ল

লক্ষ্মণ ২৫৭
লঙ্কা ২৫৯
লব ২৫৯
লোপামুদ্রা ২৫৯
লীলাবতি ২৬০

শ

শকুন্তলা ২৬১
শক্তি ২৬২
শঙ্খচূড় ২৬৩
শতধন্বা ২৬৩
শতরূপা ২৬৪
শত্রুঘ্ন ২৬৪
শম্বর ২৬৫
শমিক ২৬৫
শর্যাতি ২৬৫
শল্য ২৬৬
শিখণ্ডি ২৬৬
শুকদেব ২৬৮
শুক্রাচার্য ২৬৯
শ্বেতবাহন ২৭১
শ্রীবৎস ২৭১
শাকটায়ন ২৭২
শালিবাহন ২৭২
শিব ২৭৪
শুম্ভ ২৭৪

শূলপাণি ২৭৪
শূর্পণখা ২৭৪
ষ
ষণ্ড ২৭৫
ষোড়শি ২৭৫
স
সংজ্ঞা ২৭৫
সংবরণ ২৭৬
সতী ২৭৭
সত্যবতি ২৭৯
সত্যবান ২৮১
সত্যব্রত ২৮২
সত্যভামা ২৮৩
সপ্তর্ষি ২৮৩
সাতলোক ২৮৩
সাতসমুদ্র ২৮৩
সরমা ২৮৪
সরস্বতি ২৮৪
সাত্যকি ২৮৫
সাবিত্রি ২৮৬
সিন্ধু ২৮৮
সীতা ২৮৮
সুকন্যা ২৯১
সুজাতা ২৯১
সুদর্শন ২৯২
সুভদ্রা ২৯৩
২৯৩ সুমেরু
২৯৪ সুরথ
২৯৪ সুহোত্র
২৯৫ সূর্য
২৯৬ সৃঞ্জয়
২৯৭ স্কন্দ
২৯৭ স্বয়ম্ভু
২৯৮ স্মৃতি
২৯৮ সনাতন
২৯৮ সামবেদ
২৯৯ সুগন্ধমাদন (গন্ধমাদন)
২৯৯ সুদক্ষিণা
২৯৯ সুন্দ-উপসুন্দ
২৯৯ সুগ্রীব
৩০০ হংস
৩০০ হরি
৩০১ হরিশ্চন্দ্র
৩০১ হলায়ুধ
৩০১ হস্তিনাপুর
৩০১ হারিত
৩০১ হিরণ্যকশিপু
৩০২ হিড়িম্বা
৩০২ হুতাশন
ক্ষ
৩০৩ ক্ষমা

আমরা ২৫ কোটি বাংলা ভাষি এ অচলা বসুধায় বাস করি। এ জনগোষ্ঠির দু-তৃতীয়াংশ আশ্রয় নিয়েছেন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আর এক তৃতীয়াংশ সত্য ও পবিত্র জ্ঞানে সনাতন ধর্মমত আঁকড়ে ধরে আছেন। দু-টোর মাঝে বিশ্বাস ও ধর্মাচারে বিস্তর পার্থক্য। ইসলাম একেশ্বরবাদি ধর্ম আর সনাতন ধর্মে ৩৩ কোটি দেব-দেবি আরাধ্য। ধর্ম শাস্ত্রগুলোতে এতো অধিক সংখ্যক (৩৩ কোটি) দেব-দেবির পূর্ণ বর্ণনা নেই। ৩৩ কোটির তুলনায় সীমিত সংখ্যক দেব-দেবির বর্ণনা থাকলেও সে বর্ণনা আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। দেব বর্ণনার সঙ্গে প্রযুক্ত আছে দৈত্য, সুর, অসুর, মুণি, ঋষি, কবি, শাস্ত্রকর, বীর সেনাপতি ও রাজন্যবর্গ। প্রযুক্ত আছে স্বর্গবেশ্যা, স্বর্গ বৈদ্য, স্বর্গ সংগীতকার তথা কিন্নর-কিন্নরিদের জীবনাচার। বর্ণনা আছে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের সংঘাত, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, বীরত্ব ও বীর গাঁথা এবং কাপুরুষত্ব, দুর্নিবার যৌনাকর্ষণ, হাস্য-লাস্যময় নারী প্রতিকৃতি, সংগীত সুরঝংকার আর রণধ্বনি ওংকার।

দেব-দৈত্যের বর্ণনা বড়ই চিত্তাকর্ষক। কিম্ভুতকিমাকার তাদের দেহ-অবয়ব। রাবণের দশ মাথা, বিশ হাত, কালো দেহ, দীপ্ত কেশ আর আছে লাল ঠোঁট। কাম হচ্ছেন প্রেমের দেবতা। রতি তাঁর স্ত্রী। আমাদের ভাষায় যৌন সংগমের নাম রতিকর্ম। কামের নাক সুচারু, উরু কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত। কেশ নীল ও কুঞ্চিত। বক্ষ বিশাল। চোখ রক্তিম। পদতল এবং নখও রক্তিম। গায়ে বকুল ফুলের সুরভি। তিনি পুষ্পময় ও পুষ্পাকার। তিনি কুসুম কার্মুকে শোভিত।

কুবেরের দেহ কুৎসিত। তাঁর তিন পা, আট দাঁত। কুম্ভকর্ণ টানা ছ-মাস ঘুমান। কর্ণের বাবা সূর্য, মা কুন্তি। কিন্তু সূর্য ও কুন্তি স্বামি-স্ত্রী নন। তবে সংজ্ঞা সূর্যের বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামির তেজ সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজের শরির হতে ছায়াকে নির্গত করে স্বামিকে ত্যাগ করেন।

স্বর্গের গায়কদের নাম বড়ই চমৎকার। এদের নাম– হাহা, হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্ববায়ু, সোমায়ু, তুম্বুরু ও নন্দি।

যুগ প্রবর্তক দেবতা কলি। কলির বাপের নাম ক্রোধ। কলির মার নাম হিংসা। ক্রোধ ও হিংসা ভাই-বোন। এ ভাই-বোনের মাঝে বিয়ে হলে কলির জন্ম

হয়। কলি ঘোর কালো, বিদ্‌ঘুটে, কিম্ভুতকিমাকার। তার দেহ দেখতে বিকট, লোল জিহ্বা এবং শরির দুর্গন্ধময়। কলি নিজের বোন দ্বিরুক্তিকে বিয়ে করেন। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম হয়। পুত্রের নাম ভয় আর মেয়ের নাম মৃত্যু। ভয় ও মৃত্যু ভাই-বোন। কলি এখন রাজা। তাঁর রাজত্ব চলবে চার লাখ বত্রিশ সহস্র বর্ষ।

স্বর্গের সুন্দরিতমা রমণি তিলোত্তমাকে দেখে দু দৈত্য সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁকে পাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য তিল তিল করে নিয়ে বিশ্বকর্মা এ মহাসুন্দরিকে সৃষ্টি করেছেন। তিলোত্তমার দু প্রেমাসক্ত পরস্পর যুদ্ধ করে একে অপরের হাতে নিহত হলেন।

দুবাসা ঋষির বাপ অত্রি আর মা অনুসূয়া। এ ঋষি সব সময় মাত্রাতিরিক্ত ক্রুদ্ধ থাকতেন সে কারণে তার নাম হয় ক্ষ্যাপাদুর্বাসা।

অপ্সরা মেনকার সঙ্গে বিশ্বমিত্রের যৌন সংসর্গ হলে এক মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। মেনকা তাকে ফেলে রেখে চলে যান। শকুন পাখি তাকে পালন করে। এ জন্য মেয়েটির নাম হয় শকুন্তলা। কণ্বমুণি পরে তাকে প্রতিপালন করেন। রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিয়ে করেন।

সকল দেবতার রাজা ইন্দ্র। ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে ব্যাভিচারে মত্ত হলে এ পাপে তার শরিরে সহস্র যোনি সৃষ্টি হয় এবং অহল্যা পাথর হয়ে যান। এমনই চমৎকার রূপে পুরাণকাহিনি বর্ণিত।

অগস্ত্য

তিনি বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্‌বেদে বর্ণিত আছে, তিনি মিত্র অর্থাৎ তেজোময় সূর্য ও বরুণের ছেলে। আদিত্য-যজ্ঞেমিত্র ও বরুণ উর্বশিকে দেখে যজ্ঞকুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করেন। সে কুম্ভে পতিত শুক্র হতে বশিষ্ট ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। ভাগবতে অগস্ত্যকে পুলস্তের ছেলে বলা হয়। তাঁর অনেক নামের মধ্যে কয়েকটি নাম এরূপ– তিনি কুম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে নাম হয় কলসি-সূত, কুম্ভ সম্ভব, ঘটোৎভব, কুম্ভযোনি, মিত্র-বরুণের ছেলে বলে মৈত্রাবরুণি, সমুদ্র পান করেছিলেন বলে পীতাব্ধি, বাতাপিকে বিনাশ করেছিলেন বলে বাতাপিদ্বীট, উর্বশির জন্য উর্বশিয়, মহাতেজা বলে আগ্নেয়, বিন্ধ্যকে শাসন করেছিলেন বলে বিন্ধ্যকূট, ক্ষুদ্রাকৃতি বলে তাঁর নাম মান। অগস্ত্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি চিরকাল কৃতদার থাকবেন, কিন্তু একদিন ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলেন, তাঁর পিতৃপুরুষরা এক গুহার ভিতর অধোমুখে লম্বমান অবস্থায় অতি কষ্টে ঝুলছেন। জিজ্ঞেস করে অগস্ত্য জানতে পারলেন, বংশরক্ষা না করলে তাঁদের সদ্‌গতির কোন আশা নেই। অগস্ত্য আশ্বাস দিলেন যে, পিতৃ-পুরুষগণের জন্যে তিনি বংশরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তখন তিনি তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণির সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে এক পরমাসুন্দরি নারী সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বিদর্ভরাজের হাতে পালন করার ভার দিলেন। সে থেকে এ মেয়ের নাম হলো লোপামুদ্রা। কারণ, সমস্ত জীবের সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী এ নারী 'লোপ' করে নিয়েছেন। এ মেয়ে যখন বড় হলো, তখন অগস্ত্য এঁকে স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করলেন; বিদর্ভরাজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোপামুদ্রাকে তাঁর হাতে দান করলেন। কিছুদিন পরে লোপামুদ্রা একদিন ঋতুস্নান করে অগস্ত্যের কাছে এলে মুনি পুত্রোৎপাদনের জন্য এঁকে আহ্বান করলেন। লোপামুদ্রা তখন বললেন যে, পিতৃগৃহে যেরূপ অলঙ্কারভূষিতা হয়ে শয্যায় শয়ন করতেন, সেরূপ তাঁকে ভূষিত করতে ও মনিকে ভূষিত হতে বললেন। অগস্ত্য তখন জানালেন যে, এরূপ ধনরত্ন সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ঋতুকাল গত হবার সময় হয়েছে বলে

অগস্ত্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষায় বের হলেন। কিন্তু সব স্থান হতেই তিনি বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। তখন যে রাজারা তাঁকে অর্থ দিতে অসমর্থ হয়েছেন, তাঁরা তাঁকে দানবরাজ ইল্বলের কাছে যেতে বললেন। সেখানে অনেক ঘটনার পর ইল্বলের ভাই বাতাপিকে তিনি ধ্বংস করেন। অগস্ত্যের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ইল্বল তাঁকে ধনদান করলেন। এ ধনরত্ন নিয়ে মুনি লোপামুদ্রার কাছে উপস্থিত হলেন। তখন লোপামুদ্রার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায়, তিনি অগস্ত্যের কাছ হতে বীর্যবান ছেলে প্রার্থনা করলেন। এর ফলে দৃঢ়স্যু নামে এক শক্তিশালি পুত্রের জন্ম হয় এবং এ ছেলেই পূর্বপুরুষদের মুক্ত করেন। পুত্রের জন্মের পর অগস্ত্য কিছুদিন আশ্রমে বাস করে যোগবলে দেহত্যাগ করে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন।

অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্বত একদিন ইচ্ছা করলেন, সূর্য যেমন উদয়াস্তকালে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন, সেরূপ বিন্ধ্যপর্বতও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবেন। সূর্য এতে অসম্মত হয়ে বলেন যে, তিনি বিশ্বনিয়ন্তার আদিষ্ট পথেই পরিভ্রমণ করেন এবং করবেন। বিন্ধ্য ক্রোধে হঠাৎ নিজের দেহ এমনভাবে বৃদ্ধি করতে লাগলেন যে, সূর্যের পথ রোধ হল। তখন দেবতারা ভীত হয়ে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। অগস্ত্য ভক্তশিষ্য বিন্ধ্যের কাছে উপস্থিত হলে, বিন্ধ্য অবনত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য বললেন, আমি যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করি, ততক্ষণ তুমি এরূপ মস্তক অবনত অবস্থায় থাকো। বিন্ধ্যকে এ অবস্থায় রেখে অগস্ত্য ১লা ভাদ্র দক্ষিণাপথে যাত্রা করলেন এবং আর ফিরলেন না। এরূপে দেবতারা বিন্ধ্যকে দমন করলেন। এ জন্য ১লা ভাদ্র শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে আছে। ক্রমে সকল মাসের প্রথম দিনই শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই প্রতি মাসের প্রথম দিনকে 'অগস্ত্য-যাত্রা' বলা হয়।

কালকের নাম অসুররা বৃত্রাসুর বধের পর দেবতাদের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে পলায়ন প্রাণরক্ষা করে। এরা রাত্রে সমুদ্র হতে উঠে দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতো। এ অসুরদের অত্যাচারে দেবতারা অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য সমুদ্রকে পান করে ফেলেন। সমুদ্র শোষণের পর অসুররা নিরাশ্রয় হয়ে দেবতাদের হাতে ধ্বংস হয়।

শ্রুতি আছে যে, অগস্ত্য দক্ষিণাকাশে নক্ষত্ররূপে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তিনি শরৎকালের প্রথম দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন বলে ভাদ্রের ১৭ কি ১৮ দিবসে আকাশে নক্ষত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে।

ইন্দ্র একবার ব্রহ্মহত্যার পাপে সমুদ্রের ভিতর বাস করছিলেন, সে সময় ধার্মিক রাজা নহুষকে ইন্দ্রের অভাবে স্বর্গের রাজা করা হয়। সিংহাসন অধিকার

করে রাজা নহুষ ইন্দ্রের স্ত্রী শচিকে হস্তগত করতে চান। বৃহস্পতির উপদেশ অনুসারে শচি বললেন, রাজা নহুষ যদি সপ্তর্ষিচালিত রথে আরোহণ করে তাঁর কাছে আসেন, তবেই তিনি তাঁকে গ্রহণ করবেন। এ কথা অনুসারে ঋষিচালিত রথে রাজা নহুষ আসছিলেন। রথের একজন বাহক ছিলেন অগস্ত্য। হঠাৎ রাজার পা অগস্ত্যের দেহ স্পর্শ করে। এতে ঋষি অগস্ত্য রেগে গিয়ে রাজাকে 'সর্প হও'– বলে অভিশাপ দেন। তৎক্ষণাৎ নহুষ রথ হতে পতিত হয়ে সর্পে পরিণত হন। অভিশাপগ্রস্ত নহুষ তখন অগস্ত্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নহুষের একান্ত অনুরোধে ঋষি তাঁর অভিশাপকে সামান্য পরিবর্তন করেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে তিনি আবার নিজ মূর্তি ফিরে পান ও পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। বনবাসকালে রাম অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হলে অগস্ত্য এঁকে বৈষ্ণবধনু, অক্ষয়তূণিয় ও নানাপ্রকার মহাস্ত্র দান করেন।

অক্ষয়

তিনি মন্দোদরীর গর্ভজাত রাবণের ছেলে। হনুমান সীতাকে অন্বেষণ করার জন্য লঙ্কায় প্রবেশ করে। তিনি সীতার সঙ্গে পরিচিত হন। পরে সীতার কাছ থেকে অভিজ্ঞান গ্রহণ করে ফিরবার সময় তিনি অশোকবন বিনষ্ট করেন। তখন রাবণ হনুমানকে দমন করার জন্য পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা সকলেই হনুমানের হাতে নিহত হলে রাবণ ছেলে অক্ষয়কে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন, অক্ষয়ও হনুমানের হাতে নিহত হন।

অগ্নি

"ভারতবর্ষের তিন জন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। ঋগবেদ-সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নেই।" (রমেশ দত্ত)

অগ্নিকে ২০০ সূক্তে স্তব করা হয়েছে। অগ্নির ত্রিমূর্তি– আকাশে সূর্য, অন্ত রীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। পার্থিব দেবতাদের মধ্যে অগ্নি প্রধান। অগ্নিকে অনেক স্থলে যুবা যুবিষ্ঠ বলা হয়েছে (ঋগবেদ)। দুটি কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় বলে তাঁর এক নাম প্রমন্থ । অগ্নির অন্য নাম ভরণ্য (অগ্নি যজ্ঞাগ্নি রূপেই বেশির ভাগ পূজিত হয়েছেন। অগ্নি ঘৃতপৃষ্ঠ (ঋগবেদ ৫। ৩। ৩), নীলপৃষ্ঠ, জ্বালাকেশ (৩। ১৪। ১), হিরণ্যকেশ, পিঙ্গলশ্মশ্রু (৫। ৭। ৭), তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা, হিরণ্যদন্ত রূপে বর্ণিত হয়েছেন। জুহু নামে হাতায় করে ঘৃতাহুতি দেয়া হোক বলে, 'জুহু' অগ্নির মুখ বা জিহ্বা। তিনি জ্বালাময়, মধুজিহ্ব, সাতজিহ্ব, ত্রিজিহ্ব (৩। ২০। ২), অগ্নি দেবতাদেরও হব্যবাহক। অগ্নি দেব ও মানবের মধ্যস্থ।

অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, সেজন্য অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি পার্থিব দেবতাদের মধ্যে । প্রদান। অগ্নিকে বহু পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে– গর্জনকারি বৃষের ন্যায় (১। ৫৮। ৫), গোবৎস্যতুল্য, দেববাহন ঘোড়াসদৃশ (১। ৬১। ৬), শ্যেন সদৃশ আকাশবিহারি (৭। ১৫। ৪), হংসবৎ বিচরণশিল (১। ৬৫। ৫), সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় গর্জনকারি (১। ৪৪। ১২)। সমিধ্ ইন্ধন ঘৃত অগ্নির খাদ্য পানীয়। অগ্নির দীপ্তি সূর্যের ন্যায়, উষার ন্যায়, বিদ্যুতের ন্যায়। তিনি পৃথিবীর কেশরূপ বনকে ধ্বংস করেন। তাঁর রথ উজ্জ্বল দ্যুতিমান, হিরণ্ময় বিদ্যুজ্জড়িত,– দু বা ততোধিক অরুণ বা পিঙ্গল ঘোড়া দ্বারা বের হন (৭। ৪২। ২)। তিনি যজ্ঞসারথি। তিনি নিজের রথে দেবতাদের বহন করে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত করেন। অগ্নি দ্যাবা পৃথিবীর ছেলে। অরণিদ্বয় অগ্নির পিতা-মাতা। জাতমাত্রই সন্তান বাপ-মাকে ভক্ষণ করেন। অগ্নি জলের গর্ভ বা ভ্রূণ। অগ্নি দ্বিজ– আকাশে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্ম। গৃহে গৃহে অগ্নির অধিষ্ঠান বলে তিনি বহুজন্মা। তিনি হব্যবাহন ও দেববাহন উভয়ই। তিনি ইন্দ্রের মতো বলশালি ও সহস্রজিৎ। ঋগবেদের প্রথমেই অগ্নির বন্দনা আছে (১। ১), এবং অগ্নির বন্দনা করেই ঋগবেদ সমাপ্ত হয়েছে (১০। ১৯১)।

মহাভারতের আদিপর্বে কথিত আছে, এক রাক্ষস মহর্ষি ভৃগুর ভার্যা পুলোমাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু পুলোমার বাবা মেয়েকে ভৃগুর হাতে সম্প্রদান করেন। এ মেয়ে যখন গর্ভবতি, তখন রাক্ষস অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করে, এ মেয়ে কার ভার্যা? অগ্নি বলেন, যেহেতু পুলোমার অগ্নিসাক্ষি করে ভৃগুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সেহেতু সে ভৃগুর ভার্যা। ঐ রাক্ষস কিন্তু পূর্বে এ মেয়েকে মনে মনে বরণ করেছিল। তখন রাক্ষস বরাহরূপে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে অপহরণ করে। অপহরণকালে পুলোমার গর্ভচ্যুত হয়ে চ্যবন ঋষির জন্ম হয়। সে শিশুর তেজে রাক্ষস দগ্ধ হয়। অগ্নি রাক্ষসকে পুলোমার পরিচয় দিয়েছেন জানতে পেরে, মহর্ষি ভৃগু অগ্নিকে "সর্বভুক্ হও" বলে অভিসম্পাত দেন। অগ্নি তখন আহুতি গ্রহণ করবেন না বলে অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞ হতে অন্তর্হিত হন। ব্রহ্মা তখন অগ্নিকে বলেন, তুমি সদাপবিত্র এবং কেবলমাত্র তোমার গুহ্যদশের শিখা ও ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরির সর্বভুক্ হবে এবং মুখে যে আহুতি দেয়া হবে, তাই দেবগণের ভাগরূপে গৃহিত হবে।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, অগ্নি শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি ভক্ষণ করে দুঃসাধ্য অগ্নিমান্দ্য রোগে পীড়িত হন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে রোগমুক্তি ও শক্তিসঞ্চয় করার জন্য খাণ্ডববনের সমস্ত জীবজন্তুর, দৈত্যদানব, সর্প ইত্যাদি ভক্ষণ করার ইচ্ছা করেন; কিন্তু খাণ্ডববন দেব-রক্ষিত বলে ইন্দ্র এতে বাধা দিলেন। অগ্নি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাঁরা অগ্নিকে সাহায্য

করতে সম্মত হলেন' কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করলেন। তখন অগ্নি বরুণদেবের নিকট হতে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডিব-ধনু ও অক্ষয় তূণিরদ্বয় অর্জুনকে এবং সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকি গদা কৃষ্ণকে দান করলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডবদাহন হলে অগ্নি তাই খেয়ে রোগমুক্ত হন।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নানাভাবে অগ্নির উল্লেখ দেখা যায়। যেমন অঙ্গিরার ছেলে, সন্ধিলার প্রপৌত্র, সপ্তর্ষির মধ্যে অগ্নি একজন। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ ছেলে ও দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামি (বিষ্ণুপুরাণ)। ধর্মের ঔরসে ও বসু ভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম (মহাভারত– অনুশাসন)। দক্ষের মেয়ে স্বাহাকে তিনি বিয়ে করেন এবং তাঁর তিনটি ছেলে হয়– পাবক, পবমান ও শুচি (বিষ্ণুপুরাণ)। এঁদের আবার পঁয়তাল্লিশটি ছেলে হয়।

হরিবংশে তাঁর বর্ণনা এরূপ– কালোবস্ত্রাবৃত, ধূম্রপতাকা, সঙ্গে জ্বলন্ত লোহিতরঙ ঘোড়াচালিত রথে তিনি ভ্রমণ করেন, এবং সাত বসু তাঁর রথের চক্র। বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত– অনল, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর, অজহস্ত, বহ্নি, রোহিতাশ্ব, ছাগরথ, সাতজিহ্বা।

অগ্নিপুরাণ

সর্বপ্রথমে অগ্নিদেবতার মুখ হতে নির্গত বলে এর নাম অগ্নিপুরাণ। মহামুনি বশিষ্ঠকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য অগ্নিদেবের মুখনিসৃত অষ্টাদশ মহাপুরাণের আট পুরাণ। প্রধানত– ১. প্রলয়, ২. সৃষ্টি, ৩. প্রকরণ ও অগ্নিকার্য, ৪. দেবপ্রতিষ্টা, ৫. নরকবর্ণনা, ৬. প্রায়শ্চিত্তবিধি, ৭. তীর্থাদিমাহাত্ম্য, ৮. জ্যোতিষ, ৯. আশ্রমবিধি, ১০. দীক্ষা, ১১. নীতি, ১২. পূজাপদ্ধতি, ১৩. সন্ধ্যাবিধি, ১৪. ধনুর্বেদ, ১৫. আয়ুর্বেদ, ১৬. ছন্দ, ১৭. শব্দানুশাসন, ১৮. ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এ গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১৫, ৪০০।

অঙ্গ

(১) বলিরাজার ক্ষেত্রজ ছেলে। তিনি বিহার অর্থাৎ ভাগল পুরের রাজা ছিলেন। তাঁর অধিকৃত সমূহ রাজ্য তাঁরই নামানুসারে খ্যাত হয়েছে। ভাগলপুরের উত্তরস্থিত অঙ্গদেশ (রাজধানি চম্পা)। জন্মান্ধ মহর্ষি দির্ঘতমার ঔরসে, বলিরাজের মহিষি সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ ছেলের জন্ম হয়। মহাভারতে অঙ্গদেশের নাম উল্লেখ আছে। মহাভারতে অঙ্গদেশের নাম উল্লেখ আছে। দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশের অধিপতি করেছিলেন। অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জুন বহুবিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা দেখান।

এতে ধৃতরাষ্ট্রের-ছেলেরা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন এবং কর্ণকে অস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করার জন্যে অর্জুনকে বলেন। কিন্তু কর্ণ রাজা নন বলে অর্জুন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মত হন। তখন দুর্যোধন সূত ছেলে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অঙ্গের জন্ম সম্বন্ধে মহাভারতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, জন্মান্ধ মহর্ষি দির্ঘতমা প্রদ্বেষি নামে এক সুন্দরি মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে গৌতম প্রভৃতি কয়েকটি পুত্রের জন্মের পর তিনি স্বামির প্রতি বিরূপ হন। স্ত্রীর এ দুর্ব্যবহারের জন্য দির্ঘতমা নিয়ম করেন যে, জীবিত-মৃত স্বামির প্রতি অসম্মান দেখিয়ে কোন নারী যদি অন্য স্বামি গ্রহণ করে, তবে সে পতিতা হবে। স্বামির এ কথা শুনে স্ত্রী রেগে গিয়ে ছেলেদের স্বামিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে বলেন। ছেলেরা বাবাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলে, তিনি ভাসতে ভাসতে বলিরাজ্যের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। বলিরাজ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে দির্ঘতমাকে আশ্রয় দেন। বলিরাজের স্ত্রী সুদেষ্ণা তখন নিঃসন্তানা। বলিরাজ দির্ঘতমাকে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। অন্ধ ও অতিবৃদ্ধ মহর্ষির কাছে নিজে না গিয়ে সুদেষ্ণা তাঁর ধাত্রিমেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। এ শূদ্রমেয়ের গর্ভে ১১ জন ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। এরপর রাজার নির্বন্ধে সুদেষ্ণা স্বয়ং দির্ঘতমার কাছে গেলে দির্ঘতমা তাঁর অঙ্গস্পর্শ করে বলেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বি ছেলে হবে এবং ছেলেগুলির নাম হবে যথাক্রমে– অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এবং তাদের দেশগুলিও এ সকল নামে খ্যাত হবে।

(২) বেণের বাবা। তাঁর স্ত্রীর নাম সুনীথা। উগ্রস্বভাব ছেলে বেণের দৌরাত্মে রাজর্ষি অঙ্গ বিষয়বিবাগি হয়ে গৃহত্যাগ করেন।

অঙ্গদ

কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালির ছেলে। রাম বালিকে হত্যা করলে কাকা সুগ্রীব রাজ্যলাভ করে অঙ্গদকে যুবরাজ করেন। পরে বানর সেনাদের অধিনায়ক হয়ে তিনি রামের পক্ষে লঙ্কায় যুদ্ধ করেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন।

অজ

রঘুর ছেলে ও রামের পিতামহ। দশরথের বাবার নাম অজ। শাপ ভ্রষ্টা অপ্সরা বিদর্ভরাজমেয়ে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হবার জন্য তিনি যাত্রা করলে পথিমধ্যে এক হাতি তাঁকে আক্রমণ করে। তখন তিনি এ হাতিকে মারার আদেশ দেন। এ হাতিটি গুরুতর আহত হলে তার দেহ থেকে অপরূপ সুন্দর গন্ধর্ব বেরিয়ে এসে জানায় যে, সে একজন ঋষিকে উপহাস করার জন্য তাঁর শাপে মত্ত হাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। আজ অজ তাঁকে হাতি রূপ থেকে মুক্ত করেছেন।

সেজন্য গন্ধর্ব অজকে সম্মোহন নামে একটি বাণ দান করেন। এ বাণের সাহায্যে অজ স্বয়ম্বর সভায় সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে ইন্দুমতিকে বিয়ে করেন। ইন্দুমতির গর্ভে দশরথের জন্ম হয়।

অজাতশত্রু

উপনিষদে এ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানি ছিল বারাণসি। মহর্ষি গর্গ এঁকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতে আসেন; কিন্তু রাজার ব্রহ্মজ্ঞান দেখে বিস্মিত হন। এ যুগে যেসব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মাজ্ঞানের চর্চা করতেন, তিনি তাঁদেরই অন্যতম।

অর্জুন

তৃতীয় পাণ্ডব। কুন্তির গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র। তিনি দ্রোণাচার্যের নিকট ধনুবিদ্যা শিক্ষা করে তদানিন্তন বীরগণের মধ্যে অসাধারণ বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। একদিন গুরুদ্বেষি দ্রুপদ রাজাকে পরাজিত করে দ্রোণাচার্যের নিকট আনয়ন করলে আচার্য অর্জুনকৃত এ প্রীতিকর কার্যকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ স্বীকার করেছিলেন।

বিদুরের উপদেশে জতুগৃহ দাহ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে পাণ্ডবগণ কুন্তিসহ প্রচ্ছন্নভাবে একচক্রানগরিতে যখন বাস করেন তৎকালে অর্জুন দ্রৌপদির বিয়ে উপলক্ষে মৎস্যচক্ররূপ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদিকে লাভ করেন এবং মার আদেশে পাঁচ ভাই তাঁর পাণিগ্রহণ করেন।

দেবর্ষি নারদ এরূপ নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, দ্রৌপদির সাথে পাঁচপাণ্ডবের মধ্যে কোন এক ভাইর অবস্থিতিকালে অন্য কেউ তথায় প্রবেশ করলে তাঁকে ১২ বছর গৃহত্যাগি হতে হবে। একদিন জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ অস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন হলে অর্জুন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে সেখানে যধিষ্ঠির ও দ্রৌপদিকে দেখে অতিশয় সঙ্কুচিত হন এবং নারদ প্রবর্তিত নিয়মানুসারে ১২ বৎসরের জন্য গৃহত্যাগ করেন। এ সময় নাগমেয়ে উলুপির সাথে তাঁর বিয়ে হয়, এরপর মণিপুরের উপস্থিত হয়ে রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদার পাণি গ্রহণ করেন। অনন্ত র দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণের বোন সুভদ্রার সাথে সাক্ষাৎ হলে পরস্পরের অনুরাগ সঞ্চার হয়। কিন্তু বলরাম তাতে বিরোধি হওয়ায় কৃষ্ণের পরামর্শে সুভদ্রাকে অপহরণ করে বিয়ে করেন। তাঁর গৃহত্যাগের ১২ বছর পূর্ণ হলে অর্জুন সুভদ্রা সহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন।

একদিন অগ্নিদেব দ্বারা প্রার্থিত হয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুন খাণ্ডব বন দাহে অগ্নিকে সাহায্য করেন। এ সময়ে অগ্নিদেব অর্জুনকে গাণ্ডিব ধনুঃ অক্ষয় তূনিরদ্বয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন।

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির সস্ত্রীক ভাইদের সাথে যখন বনে বাস করেন, তখন অর্জুন ব্যাসদেবের অনুমত্যানুসারে ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়ে প্রথমে ইন্দ্রের পরে মহাদেবের আরাধনা করেন। অর্জুনের বল পরীক্ষার জন্য কুমিররূপি মহাদেবের সাথে অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, ঐ যুদ্ধে পরিতুষ্ট, হয়ে পশুপতি অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন। এ সময়ে ইন্দ্রাদিদেবগণের নিকট হতেও অর্জুন নানা অস্ত্র লাভ করেন এবং স্বর্গে অবস্থিতি করে। নৃত্যগীতাদি গান্ধর্ববিদ্যায় বিশেষ শিক্ষিত হন।

একদিন উর্বশি অনুরক্ত হয়ে অর্জুনের নিকট এলে অর্জুন তাকে কৌরববংশের মা বলে নিজ মার ন্যায় তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করলে উর্বশি রেগে তাঁকে ক্লীব হবে বলে অভিসম্পাত করেন।

তিনি দেবদ্বেষি নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরবাসি দৈত্যগণকে হত্যা করেন এবং গন্ধব রাজ চিত্রসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দুর্যোধনকে সপরিবারে মুক্ত করেন।

বিরাটরাজের ভবনে অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন উর্বশির শাপে এক বৎসর ক্লীব হয়ে অবস্থিতি করেন এবং বিরাট কন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেন। সে সময় তিনি নিজ নাম গোপন করে বৃহন্নলা নামে অভিহিত হয়েছিলেন। বিরাটরাজের গরু চুরির ইচ্ছায় দুর্যোধন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উত্তর গো গৃহে আগমন করলে অর্জুন রাজপুত্র উত্তরের সারথি হয়ে যুদ্ধে যান। তখন পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হয়েছিলো। সুতরাং বিপক্ষ অর্জুনকে চিনতে পারলেও কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিলো না। কুরুসৈন্য দেখে উত্তর ভয় পেয়ে যুদ্ধে পরাম্মুখ হলে অর্জুন স্বয়ং যুদ্ধ করে ভিষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন প্রভৃতিকে পরাজিত করে বিরাটরাজের গোধন মোচন করেন।

বিরাটরাজ অর্জুনের পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর বিরত্বে বিস্মিত ও প্রীত হয়ে নিজ কন্যা উত্তরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে অর্জুন ছাত্রি মেয়েস্থানীয় বিবেচনায় তার প্রস্তাবে অসম্মত হন এবং নিজ ছেলে অভিমন্যুর সাথে উত্তরার বিয়ে দেন।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুন অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে কৃষ্ণের সহায়তায় কুরুপক্ষীয় ভিষ্ম কর্ণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক দুর্জেয় বীরগণকে সসৈন্যে হত্যা করেন।

ভীষণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান পাণ্ডবরাজ্য স্থাপিত হলে যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হন, অর্জুন সে যজ্ঞিয় অশ্বের রক্ষক হয়ে নানা দেশ পর্যটন করেন। মণিপুরে স্বীয়পুত্র বভ্রুবাহনের সাথে যুদ্ধে অর্জুন হতচৈতন্য হলে উলুপী পাতাল হতে সঞ্জীবনি মণি আনয়ন করে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করেন। এরূপে যজ্ঞিয় ঘোড়া নিয়ে অর্জুন গৃহে প্রত্যাগমন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। পরে অর্জুনের পৌত্র পরিক্ষিৎকে রাজ্যাভিষ্যিক্ত করে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন।

অদিতি

দক্ষপ্রজাপতির মেয়ে ও মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী। ১. ইন্দ্র, ২. বিষ্ণু, ৩. সূর্য, ৪. ত্বষ্টা, ৫. বরুণ, ৬. অংশ, ৭. অর্যমা, ৮. রবি, ৯. পুষা, ১০. মিত্র, ১১. বরদমনু ও ১২. পর্জন্য– এ বারো জন দেবতার তিনি মা; এ জন্য তিনি দেবমা নামে আখ্যাত হন। বামন অবতারে বিষ্ণু তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্র এঁকে সমুদ্রমন্থনলব্ধ কুণ্ডল দান করেন। পারিজাত লাভের জন্য কৃষ্ণও ইন্দ্রের মধ্যে যে বিবাদ হয়, তা তিনি মীমাংসা করে দেন। তাঁর বোন দিতি হতে দৈত্যদের জন্ম হয়।

অনন্ত

অনন্ত শেষনাগ। নাগদের মধ্যে অনন্তই সর্বপ্রধান। কদ্রুর গর্ভে ও কশ্যপ মুনির ঔরসে তাঁর জন্ম। তিনি তুষ্টিকে বিয়ে করেন। তিনি ভ্রাতাদের অসৎ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের ত্যাগ করে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন এবং পৃথিবীকে তাঁর মাথার উপর এমনভাবে ধারণ করতে বলেন যে, যেনো পৃথিবী বিচলিত না হয়। এ আদেশ পেয়ে অনন্ত রসাতলে প্রবেশ করেন এবং পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করেন। ব্রহ্মার এতে সন্তুষ্ট হয়ে নাগশত্রু গরুড়কে অনন্তদেবের সখা করে দেন। অনন্তদেবের অন্যান্য নাম– শেষনাগ, বাসুকি, গোনস। কালিকাপুরাণ-মতে প্রলয়ান্তে নারায়ণ লক্ষ্মীর সঙ্গে অনন্তের মধ্যম ফণায় শয়ন করেন। অনন্তের ছটি ফণা শতদলের ন্যায় বিস্তৃত হয়ে বিষ্ণুকে ছত্রের আচ্ছাদনে রক্ষা করে। দক্ষিণা ফণা বিষ্ণুর উপাধান ও উত্তর ফণা পাদপীঠ হয়। বিষ্ণুপুরাণ মতে তিনি বলরামের অবতার।

অন্ধক

(১) তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই অন্ধ ছিলেন। অন্ধক নিজে বৈশ্য এবং তাঁর স্ত্রী শূদ্র-মেয়ে। সরযূ নদী তীরে এক আশ্রমে তাঁরা দুজনে বাস করতেন। একদিন রাজা দশরথ হরিণি করতে সে নদীর তীরে এসে পড়েন। অন্ধকমুনির একমাত্র ছেলে সিন্ধু সে সময়ে (রাত্রে) কলসিতে জল ভরছিল। দশরথ কলসিতে জলপূর্ণ হবার শব্দকে ভুলক্রমে হরিণ মনে করে শব্দভেদি বাণ নিক্ষেপ করে সিন্ধুকে বধ করেন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি দশরথকে শাপ দেন যে, ছেলেরশোকে কাতর হয়ে রাজাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ছেলেশোকে কাতর হয়ে অন্ধকমুনি ও তাঁর স্ত্রী জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন করেন।

(২) দৈত্যর নাম। কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে এ দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। দিতির সমস্ত ছেলেকে দেবতারা হত্যা করেন। সে কারণে দিতি কশ্যপের

কাছে দেবতাদের অবধ্য এক ছেলে প্রার্থনা করেন। কশ্যপ সম্মত হয়ে দিতিকে আলিঙ্গন করায় তাঁর আঙ্গুল হতে এক পুত্রের জন্ম হয়। এ পুত্রের এক হাজার হাত, দু হাজার চক্ষু ও দু হাজার পা ছিলো। অন্ধ না হলেও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অন্ধের মতো চলতো বলে একে অন্ধক বলা হতো। ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণি অন্ধকের অত্যাচারে ও উপদ্রবে অস্থির হলে, দেবতারা নারদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন একদিন নারদ সাধারণের অগম্য মন্দার পর্বতের দেবভোগ্য মন্দার পুষ্পমালা গলায় ধারণ করে অন্ধকের ভবনে যান। মালার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অন্ধক তা সংগ্রহ করার জন্যে মন্দার পর্বতে যায়। তখন সেখানে মহাদেব উমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে রত ছিলেন; এমন সময় অন্ধককে দেখে রেগে গিয়ে মহাদেব শূল নিক্ষেপ করেন। মহাদেবের হাতে অন্ধক নিহত হন। (হরিবংশ)

অন্ধ্রদেশ

তামিল নাড়ু প্রদেশের উত্তরাংশ ও কর্ণাটকার কিয়দংশ।

অনসূয়া

(১) মহর্ষি অত্রির স্ত্রী। দক্ষপ্রজাপতি ও প্রসূতির মেয়ে। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসূয়াশূন্য। তাই তাঁর নাম হয়েছিল অনসূয়া। একদিন অনসূয়ায় সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্রাহ্মণ অতিথি বেশে তাঁর কুটিরে উপস্থিত হন। অতিথি সৎকারের উদযোগ করার আগেই ব্রাহ্মণবেশধারি এ তিন দেবতা তাঁকে জানালেন যে, ছেলেরূপে তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে তাঁরা আতিথ্যগ্রহণ করবেন না। অনসূয়া অতিথির দেহে স্বামির পাদোদক ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "বলো ভব"; তখন বাৎসল্য হেতু তাঁর স্তন দিয়ে দুধের ধারা প্রবাহিত হলো। সে স্তন্য পান করে এ তিন দেবতা পরম পরিতৃপ্ত হলেন। তাঁর এরই অপূর্ব মহিমা দেখে ত্রিমূর্তি বর দিতে চাইলেন, অনসূয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে ছেলেরূপে কামনা করেন। সতীর এ ইচ্ছে পূর্ণ হলো। তিনি তিন পুত্রের মা হলেন। ব্রহ্মার অংশে সোম, মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয়। বনবাসকালে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে চিত্রকূটে অত্রিমুনির আশ্রমে অতিথি হন। অনসূয়া তখন অতি বৃদ্ধা। জরাপ্রযুক্ত তাঁর সর্বশরির শিথিল। পতির পথগামিনি হয়ে অনসূয়া কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সীতার বিনয়ে ও মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে অনসূয়া সীতাকে দিব্য ১. বরমাল্য, ২. রত্নাভরণ, ৩. অঙ্গরাগ ও ৪. গন্ধানুলেপন দান করলেন। এগুলির বৈশিষ্ট্য ছিলো এ যে, ব্যবহৃত হলেও নিয়ত অম্লান থাকতো।

(২) কণ্বমুনির মেয়ে শকুন্তলা যে সময়ে কণ্বমুনির আশ্রমে ছিলেন, সে সময়ে এ অনসূয়া শকুন্তলার প্রধানা সহচারি ছিলেন।

অথর্ববেদ

অথর্ববেদ ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে প্রায় ৭৩০টি স্তোত্র ও ৬০০০ টি শ্লোক আছে। সমুদয় গ্রন্থের ছ-ভাগের এক ভাগ গদ্যে রচিত। এ অথর্বন ও অঙ্গিরস এ ঋষিদ্বয়ের রচিত।

অনঙ্গ

কামদেব মহাদেবের রোষে পড়ে ভস্মিভূত হয়ে যে বিপদে পতিত হয়েছিল তা স্মরণ করে পুনরায় মহাদেবের সামনে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা করার জন্য মহাদেবের আনুকূল্য অপরিহার্য। সতী মহাদেবকে বিমোহিত করে রামের পক্ষে কাজ করাবেন। তাই কামদেব সতীর প্রতি মহাদেবের আকর্ষণ সৃষ্টির সহায়ক হবে। আতঙ্কগ্রস্ত কামদেবকে অভয় দান করছেন সতী। দেবির বরে কামদেব চিরজয়ি বলে মহাদেবকে ভয়ের কিছু নেই। অগ্নিদেবও এখন বশিভূত থাকবে। দেবতাদের ইচ্ছে পূরণের জন্য মদন এখানে সহায়ক হিসেবে নির্ভয়ে যাতে কাজ করতে পারে সেজন্য সতী তাকে নিশ্চিত করেছেন। বিষ জীবন নাশের কারণ। কিন্তু বিষ থেকে প্রস্তুত ঔষধ দিয়েই প্রাণ রক্ষা পায়। বিষ অকল্যাণকর হয়েও ঔষধ হিসেবে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করে বলে তাকে ভয় করা অনুচিত। মদনের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাই এভাবে অভয় দান করা হয়েছে।

অনিরুদ্ধ

তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এবং প্রদ্যুম্নের ছেলে। তিনি একজন মহাবীর হিসেবে খ্যাত ছিলেন। রুক্মিরাজার পৌত্রি ভিষ্মকের মেয়ে তার স্ত্রী। তার পুত্রের নাম বজ্র। দৈত্যকুলপতি বাণ রাজার মেয়ে উষা তার রূপ গুণে মোহিত হয়ে একে মানসে পতিত্বে বরণ করলে উষার সখি চিত্রলেখা অন্তঃপুরে উষার ঘরে অনিরুদ্ধকে গোপনে আনেন। উষার বাবা বাপাসুর তা জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে হত্যা করার জন্য সেনা প্রেরণ করেন। সেনা অনিরুদ্ধের হাতে নিহত হলে বাণ রাজা অনিরুদ্ধের সাথে যুদ্ধে নেমে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে তাঁকে বন্দি করেন। সে সংবাদ পেয়ে বলরাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন শোণিত পুরে বাণরাজার পুরিতে উপস্থিত হলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে বাণাসুর পরাস্ত হলে অনিরুদ্ধ কারামুক্ত হয়ে উষার সাথে দ্বারকায় ফিরে আসেন।

অপরাজিতা

দুর্গার অপর নাম।

অপ্সরা

অপ্ (জল) থেকে তাঁরা উৎপন্ন হয়েছিল বলে তাদের নাম অপ্সরা। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময়ে তাঁরা সমুদ্রের ভেতর থেকে অসংখ্য পরিচারিকার সঙ্গে ওঠেন। দেবদানব কেউ তাঁদের গ্রহণ করলেন না। সেজন্য তাঁরা সাধারণ স্ত্রী রূপে গণ্য হলেন। তাঁরা সংখ্যায় ৬০ কোটি। কামদেব অপ্সরাদের অধিপতি। তাঁরা নৃত্যকলাদিতে পারদর্শিনি। রামায়ণ, মহাভারতে অপ্সরাদের গন্ধর্বদের স্ত্রীরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা ইন্দ্র সভায় গায়িকা, নর্তকীরূপে গন্ধর্বদের সাথে নৃত্য ও সঙ্গীত উৎসবে যোগদান করেন। দেবতারা তাঁদের নানাভাবে কাজে নিযুক্ত করেন। যখন কোন মুণি বা ঋষি কঠোর তপস্যাবলে দেবতাদের চেয়েও ক্ষমতাশালি হয়ে ওঠেন, তখন ভয়ে দেবতারা কখনও কখনও মুণি-ঋষিদের প্রলুব্ধ করে তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরাদের পাঠিয়ে দিতেন। অপ্সরাদের সৌন্দর্য ও যৌন আবেদনের কথাই সব সময়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অপ্সরারা নিজেদের দেহের পরিবর্তন করতে পারেন। অপ্সরাদের মধ্যে প্রসিদ্ধা ১. উর্বশি, ২. মেনকা, ৩. রম্ভা, ৪. তিলোত্তমা, ৫. ঘৃতাচি প্রভৃতি।

অবতার

দেবতারা সময়ে সময়ে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আগমন করেন, অথবা আবির্ভূত হন। স্বয়ং ভগবান (পূর্ণব্রহ্ম) বা তাঁর অংশে জীবদেহে পূর্ণাবতার বা অংশবতার রূপে ধরাধামে অবতরণ করেন এবং অধর্মের নাশ, ধর্মসংস্থাপন এবং জীবোদ্ধার করেন।

তৈত্তিরিয়-সংহিতায় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে অবতারতত্ত্বের বিবরণ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা শূকর, কূর্ম ও মৎস্য অবতারে পৃথিবী-সৃষ্টি বা রক্ষা করেন। পৃথিবীর রক্ষক হিসাবে বিষ্ণু অনেকবার অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দুস্কৃত-দমনের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য তাঁকে বারংবার জন্মাতে হয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– "বিনাশায় চ দুস্কৃতাম"। মহাভারতের যুগে বিষ্ণু যখন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে পরিগণিত হলেন, তখন অবতার বলে তাঁর প্রকাশ আরম্ভ হলো। এরপর পুরাণের যুগেই বিষ্ণু দশ অবতারে পূর্ণ প্রকাশ হলেন। এ দশ অবতারের নাম– ১. মৎস্য, ২. কূর্ম, ৩. বরাহ, ৪. নৃসিংহ, ৫. বামন, ৬. পরশুরাম, ৭. রামচন্দ্র, ৮. কৃষ্ণ, ৯. বুদ্ধ ও ১০. কল্কি। পর্যায়ক্রমে দশ অবতারের বর্ণনা দেয়া হলো :

(১) মৎস্য অবতার– জলপ্লাবনে বিবস্বত মুনকে রক্ষা করার জন্য ভগবান মৎস্য অবতাররূপ গ্রহণ করেন। এ মৎস্য মানবজাতির জন্মদাতা। একটি ক্ষুদ্র

মৎস্য মনুর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি এ মৎস্যকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে লাগলেন; পরে সে এত দ্রুত বর্ধিত হতে লাগলো যে, সমুদ্রে তাকে স্থাপন করতে হল। মনু তাঁর ঈশ্বরত্ব বলে পূজা করলেন। ভগবান তখন মনুকে আসন্ন প্লাবনের কথা জানালেন। প্লাবন উপস্থিত হলে ঋষিগণ ও অন্যান্য সামগ্রীর বীজ সঙ্গে নিয়ে মনু একটা নৌকোয় উঠলেন। তখন মৎস্যরূপে বিষ্ণু প্রকাণ্ড শিঙ-ধারি হয়ে উপস্থিত হলেন। এ নৌকোকে সর্প রজ্জু দিয়ে শিঙ-এর সঙ্গে বাঁধা হল এবং পরে ক্রমে ক্রমে প্লাবনের জল হ্রাস পেলো। এ অবতারে বিষ্ণু দৈত্য হয়গ্রীবকে বধ করে বেদ উদ্ধার করেন।

(২) কূর্ম– প্লাবনে যে সকল আবশ্যকিয় দ্রব্য নিমজ্জিত হয়েছিল, তা উদ্ধারের জন্য সত্যযুগে বিষ্ণু কূর্মঅবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। দুগ্ধ সাগরের নিচে তিনি নিজেকে স্থাপন করেন এবং তাঁর পিঠকে মন্দার পর্বতের কেন্দ্র করেন। সর্পরাজ বাসুকিকে তিনি এ পর্বতের চারদিকে বেষ্টন করে দেন। দু দলে বিভক্ত হয়ে দেব ও দানবরা সর্পের দু অংশ রজ্জুরূপে ধারণ করে সমুদ্র মন্থন করতে থাকেন এবং মন্থনকালে ঈপ্সিত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হন।

(৩) বরাহ– দানব হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রের নিচে পৃথিবীকে নিয়ে যায়। পৃথিবী উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু বরাহ অবতাররূপ ধারণ করেন। এক সহস্র বৎসর যুদ্ধের পর এ দানবকে হত্যা করে তিনি পৃথিবীকে উত্তোলন করেন।

(৪) নৃসিংহ– দানব হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য বিষ্ণু নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেন। হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহলাদ অত্যন্ত বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। সে জন্য বাবা রেগে গিয়ে ছেলেকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু হিরণ্যকশিপু এতে অকৃতকার্য হয়। ছেলে প্রহলাদকে হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করে যে, পুত্রের আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু সর্বত্র সর্ববিষয়ে বিদ্যমান আছেন কিনা। উত্তরে ছেলে জানালেন যে, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। বাবার সম্মুখস্থ প্রস্তরস্তম্ভেও দেবতা বিদ্যমান আছেন– এ কথা পুত্রের কাছ থেকে জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু সে স্তম্ভে পদাঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ হরিভক্ত প্রহলাদকে রক্ষা করার জন্য এবং নিজের শক্তি প্রমাণিত করার জন্য, নৃসিংহ অবতাররূপে বিষ্ণু সে স্তম্ভ হতে বেরিয়ে এসে হিরণ্যকশিপুকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। ভগবানের এ চার অবতাররূপ সত্যযুগে প্রকটিত হয়।

(৫) বামন– ত্রেতাযুগে দৈত্যরাজ বলি নানা প্রকার কঠোর তপস্যার ফলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এ তিনটি পৃথিবীর ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এর ফলে দেবতারা সর্বপ্রকার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হন। তাই দেবতাদের রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু বামন রূপে কশ্যপ ও অদিতির ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এ

বামন বলির কাছে গিয়ে মাত্র তিনবার পদক্ষেপ করার জন্য যে পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন তাহা প্রার্থনা করেন। বলি তথাস্তু বলে বামনকে বিদায় দেন। বিষ্ণুরূপি এ বামন তখন পৃথিবীতে এক পদ ও স্বর্গে অপর পদ স্থাপন করেন এবং বলির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বলির মস্তকে তৃতীয় পদক্ষেপ করে বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন। সে কারণে পাতালরাজ্য বলির অধিকারে থেকে যায়।

(৬) পরশুরাম– পরশুরাম ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ জমদগ্নির ছেলে। উদ্ধত ক্ষত্রিয়দের হস্ত হতে ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য তাঁর জন্ম হয়েছিল। (পরশুরাম দ্রষ্টব্য)

(৭) রামচন্দ্র– সূর্যবংশের রাজা দশরথের ছেলে রামচন্দ্র। বিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করে রাক্ষস-রাজ রাবণকে ধ্বংস করেন।

(৮) কৃষ্ণ– কৃষ্ণকে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার রূপে স্বীকার করা হয়।

(৯) বুদ্ধ– বুদ্ধাবতারে ভগবান জীবক্ষয়কর হিংসা নিরোধ করেছিলেন।

(১০) কলি– কলিযুগের অন্ত ভগবান বিষ্ণু সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী সুমতির গর্ভে কল্কি অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শ্বেত অশ্বের ওপর আরোহণ করে ধূমকেতুর ন্যায় জ্বলন্ত উন্মুক্ত তরবারি হাতে উপস্থিত হয়ে দুস্কৃতরে দমন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

অভিমন্যু

অর্জুন ও কৃষ্ণের বোন সুভদ্রার ছেলে। নির্ভীক ও মন্যুমান (ক্রোধি বা তেজস্বি) বলে তাঁর নাম অভিমন্যু। অল্প বয়সেই অভিমন্যু বাবা অর্জুনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে অস্ত্রবিশারদ হন। মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের মেয়ে উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিয়ে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। সে যুদ্ধে অভিমন্যু অসংখ্য কুরুসেনা বিনাশ করেন এবং ভিষ্মের রথধ্বজ ছেদন করেন। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা করেন। অর্জুন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে অন্যত্র নিযুক্ত ছিলেন। অভিমন্যু চক্রব্যূহের প্রবেশ-প্রণালী জানতেন, কিন্তু নির্গমের উপায় জানতেন না। দ্রোণকে বাধা দেবার কোন উপায় নেই দেখে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ ভেদ করতে বলেন এবং অভিমন্যুকে রক্ষা করবেন বলে আশ্বাসও দেন। এ আশ্বাসে অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করেন। শল্যপুত্র রুক্মরথ, কর্ণের এক ভাই ও দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ তাঁর হাতে নিহত হন। অন্যান্য মহারথীরাও পরাস্ত হন। তখন মহাদেবের বরে বলিয়ান জয়দ্রথ ব্যূহমুখ রুদ্ধ করে পাণ্ডবপক্ষকে প্রতিহত করেন। ১. দ্রোণ, ২. কৃপ, ৩. কর্ণ, ৪. অশ্বত্থামা, ৫. বৃহদ্বল ও ৬. কৃতবর্মা– এ ছ-রথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল ও আরো অনেক রাজা অভিমন্যুর হাতে নিহত

হন। অবশেষে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি– একে একে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও রথ ধ্বংস করেন এবং দুঃশাসনের ছেলে তাঁর মস্তকে গদাঘাত করেন। এ ভাবে সকলে মিলে অন্যায় যুদ্ধে তাঁকে নিহত করেন। অভিমন্যুর মৃত্যুকালে উত্তরা গর্ভবতি ছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর পরীক্ষিতের জন্ম হয়। ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদের সকল পুত্র নিহত হলে একমাত্র পরীক্ষিৎই পাণ্ডবদের বংশরক্ষা করেন। (মহাভারত)

অমরাবতি

ইন্দ্রের আলয় ও রাজধানি। এ নগর বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন। সুমেরু পর্বতের ওপর তা দেবতাদের বাসভূমি। এখানে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু কিছুই নাই। এখানে নন্দনকানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভি, অপ্সরা ইত্যাদি আছে। নন্দনকাননে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন– এ পাঁচটি বৃক্ষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অলকানন্দা নদী এ অমরাবতির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অপ্সরা ও গন্ধর্বরা নাচে ও গানে দেবনগরিকে ভূষিত করে রেখেছে।

অম্বরিষ

তিনি বিষ্ণুভক্ত সূর্যবংশের রাজা নাভাসের ছেলে। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে সুদর্শন চক্র দান করেন। একবার রাজা বর্ষব্যাপি ব্রত উদ্‌যাপন করেন ও তিনদিন উপবাসি থেকে দ্বাদশি তিথিতে পারণে বসবেন, এমন সময় দূর্বাসা এসে আহার্য প্রার্থনা করলেন। পরে দুর্বাসা স্নানে গেলেন কিন্তু আর ফিরলেন না দেখে সমাগত ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে রাজা ভোজনে বসলেন এবং মাত্র বিষ্ণু পাদোদক পান করলেন। এমন সময়ে দুর্বাসা নদী হতে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জেনে মহা রেগে গিয়ে জটা ছিন্ন করে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। সে জটা প্রকাণ্ড উগ্রদেবতারূপে আবির্ভূত হয়ে অম্বরিষকে বিনাশ করতে গেল। সে সময়েই বিষ্ণুর সুদর্শণ চত্র সেখানে এসে উগ্রদেবতাকে ভস্মিভূত করে দুর্বাসাকে বধ করার জন্যে ধাবিত হলো। দুর্বাসা নিরুপায় হয়ে ত্রিভুবনে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। তিনি অম্বরিষের কাছে যেতে বললেন। অবশেষে দুর্বাসা অম্বরিষের শরণাপন্ন হয়ে রক্ষা পেলেন। তারপরে অম্বরিষ ছেলেদের রাজ্য দান করে অরণ্যে তপস্যা করতে চলে গেলেন। (ভগবত)

অমোঘা ও ব্রহ্মপুত্র নদ

মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী। পরশ রূপলাবণ্যবতি অমোঘা ব্রহ্মছেলে নদের প্রসবিতা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা একবার পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে শান্তনুর আশ্রমে উপস্থিত হন

এবং স্ত্রী অমোঘার রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হন। সে সময়ে শান্তনু অন্যস্থানে গিয়েছিলেন। স্বামির অনুপস্থিতির সুযোগে ব্রহ্মা অমোঘার সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এতে অমোঘা রুষ্ট হয়ে যেমন ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিতে যাবেন, অমনি ব্রহ্মা তার বীর্য আশ্রমে স্খলিত করে প্রস্থান করলেন। স্বামি ফিরে এলে অমোঘা ব্রহ্মার এ আচরণ স্বামির কাছে বিবৃত করলেন। কিন্তু শান্তনু সব শুনে মত প্রকাশ করলেন যে, তিনি এতে স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্টই হয়েছেন। যা হোক, তেজ প্রভাবে অমোঘার গর্ভসঞ্চার হলো এবং কালক্রমে ব্রহ্মার মতো জলরাশি সমেত এক ছেলে জন্মাল। শান্তনু সে জল একটি কুণ্ডের মধ্যে রেখে দিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সে জল বৃদ্ধি পেয়ে এক নদের সৃষ্টি হল, সে নদের নাম ব্রহ্মপুত্র। (কালিকাপুরাণ)

অম্বা

কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা মেয়ে। তাঁর মধ্যমা বোন অম্বিকা এবং কনিষ্ঠা বোন অম্বালিকা। মহাবল পরাক্রান্ত ভিষ্ম স্বয়ম্বরস্থল হতে তাদেরকে অপহরণ করে আনয়ন করেন এবং নিজ ভাই বিচিত্র বীর্যের সাথে অম্বিকা ও অম্বালিকার বিয়ে হয়। অম্বা আগে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন জানতে পেরে ভিষ্ম তাঁকে শাল্বরাজের নিকট যেতে আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি শাল্বরাজের নিকট গেলে শাল্বরাজ তাঁকে ভিষ্ম অপহরণ করেছেন অতএব ভিষ্মই তাঁর পতি হবার যোগ্য এ বলে তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। পরে অম্বা হতাশ্বাস হয়ে ভিষ্মের গুরু পরশুরামের দ্বারা ভিষ্মকে অনুরোধ করাবেন মনে করে পরশুরামের শরণাপন্ন হন। পরশুরাম অম্বাকে গ্রহণের জন্য ভিষ্মকে অনুরোধ করলেও ভিষ্ম অস্বীকার করলে ভৃগুনন্দন অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। ২৩ দিন যুদ্ধের পর পরশুরামের পরাজয় হলে অম্বা নিতান্ত নিরাশ হয়ে ভিষ্মের বধজন্য শিবের আরাধনা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে এ বরদান করেন যে– "তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদ রাজার গৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করে ভিষ্মের বধের কারণ হবে"। পরে অম্বা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে জীবন ত্যাগ করেন এবং পরজন্মে দ্রুপদের ক্লীব লিংগ শিখণ্ডি হয়ে অর্জুনের সাথে ভিষ্মের যুদ্ধাকালে অর্জুনের রথে থেকে ভিষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন।

অমৃত

সুধা, পীযূষ ও জীবন-বারি, যা দেবতারা পান করে অমর হয়েছেন। মনে হয়, হোমের সময় যে সব সামগ্রি অর্পণ করা হতো তাদের এ নাম ছিল। বিশেষত সোমরসকেই অমৃত বলা হতো। অমৃতের নিঝর এবং পীযূষ নামেও এ সোমরস খ্যাত ছিল।

মহাভারতে অমৃতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে দেবতারা তাঁদের শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সে জন্য তাঁরা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শক্তি ও অমরত্বলাভ প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু দেবতাদের উপদেশ দেন যে, সমুদ্রমন্থন করে এ অমৃতকে সংগ্রহ করো। বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতমন্থনে সাহায্য করেন। মন্দারপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকি সর্পকে মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করে সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত ওঠে।

পুরাণে অমৃত সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা আছে– পৃথুরাজার উপদেশ অনুসারে ধরিত্রিকে গাভিরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস করে দোহন করা হলে, তা হতে অমৃত উৎপন্ন হয়। দুর্বাসার অভিশাপে এ অমৃত সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়। পরে ইন্দ্র দুর্বাসার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিষ্ণুর কাছে যান। তখন বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করেন এবং মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে সমুদ্রমন্থন করা হলে, তা হতে অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া প্রভৃতি উত্থিত হয়।

বায়ু ও মৎস্যপুরাণে আছে– দেব ও অসুরের সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃত উত্থিত হয়। এ সঙ্গে দধি, সুরা, সোম, লক্ষ্মী, ঘোড়া, কৌস্তুভ, পারিজাত এবং শেষে কালকূট উঠল। তারপর উঠলেন ধন্বন্তরি। অসুরদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিষ্ণু মোহিনী বেশে এ অমৃত দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করলেন। রাহুকে অমৃত গ্রহণ করতে দেখা গেলে তাঁর মস্তক খণ্ডিত হয়। এরূপে পরাজিত হয়ে অসুররা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়।

অশ্বিনিকুমার

স্বর্গবৈদ্য। বিশ্বকর্মার মেয়ের নাম সংজ্ঞা; সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে হয়। কিন্তু সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে তিনি নিজের শরির থেকে ছায়া নামক এক নারীকে নির্গত করে স্বামির কাছে রেখে চলে গেলেন। বিশ্বকর্মা পতিসেবায় বিরত হয়ে চলে আসার জন্যে মেয়েকে ভর্ৎসনা করলেন এবং মেয়েকে স্বামির কাছে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিলেন। সংজ্ঞা স্বামিগৃহে ফিরে না গিয়ে অশ্বিনিরূপ ধারণ করে উত্তরকুরুবর্ষে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এ সংবাদ জানতে পেরে সূর্য ঘোড়ারূপে উত্তর-কুরুবর্ষে গিয়ে অশ্বিনিরূপা সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে সূর্যের ঔরসে অশ্বিনিরূপা সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনি ও রেবন্ত নামে যমজ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরাই অশ্বিনিকুমার নামে খ্যাত স্বর্গবৈদ্য। পাণ্ডুপত্নী মাদ্রির কামনায় নকুল ও সহদেব নামে এঁদের ঔরসজাত দু ছেলে জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা একই রকম দেখতে ও সর্বদা একসঙ্গে থাকতেন। এ ভ্রাতৃদ্বয় পরম সৌন্দর্যের অধিকারি ও চিকিৎসাবিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শী। তাঁরা

'চিকিৎসা সারতন্ত্র' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অশ্বিনি কুমারদ্বয়ের প্রকৃত বিবরণ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। নিরুক্তকার যস্কের মতে তাঁরা ইন্দ্র ও সূর্য; বেদে তাঁরা (১) পৃথিবী ও স্বর্গ, (২) দিবা ও রাত, (৩) সূর্য ও চাঁদ, (৪) বিবস্বান ও কারণ্যুর যমজ ছেলে, (৫) আকাশের ছেলে, (৬) সিন্ধুগর্ভ সম্ভূত, (৭) দক্ষ সম্ভূত, (৮) সূযাত্মাজার স্বামি বলে উক্ত হয়েছেন। তাঁরা সুবর্ণরথে দিনে তিনবার ও রাত্রে তিনবার জগৎ ভ্রমণ করেন।

অযোধ্যা

সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর কোশলরাজ্যের রাজধানি এবং দিলীপ, রঘু, রামচন্দ্রাদি সূর্যবংশিয় ক্রোশ দির্ঘ ও ৮ ক্রোশ প্রস্থ ছিল।

অরুন্ধতি

কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবাহুরিতের গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনি বশিষ্ঠের পত্নী। তিনি অতিব বিদুষি ছিলেন। নিয়মিত পতশ্চর্যার ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছিল। পতিভক্তি ও পাতিব্রত্যের তিনি আদর্শ ছিলেন। মহাভরতের অনুশাসন পর্বে লিখিত আছে– পতিসেবারূপ ধর্মপথ যে নারী অনুসরণ করেন, তিনি অরুন্ধতির মতো স্বর্গেও পূজিতা হন। আকাশে নক্ষত্ররূপে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতি বিরাজ করেন। যাঁরা সপ্তর্ষি মণ্ডলে অরুন্ধতিকে দেখতে না পান, তাঁদের আয়ু শেষ হয়েছে বলে প্রতিপন্ন হয়। বিবাহের কুশণ্ডিকাকালে মন্ত্র উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতি নক্ষত্র দেখান হয়।

অলকা

হিমালয় পর্বতের ওপর অলকানন্দা নদীর তীরে কুবেরের রাজধানি। গন্ধর্বদের বাসস্থান।

অশ্বত্থামা

কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের ছেলে। তাঁর মা ছিলেন কৃপাচার্যের বোন কৃপি। জন্মমাত্রই নবজাতক উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের মতো হ্রেষারব করেছিলেন বলে তিনি অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে গুপ্ত অস্ত্রের প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বত্থামা বাবা দ্রোণের সঙ্গে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। মামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রে গুপ্তভাবে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে ১. ধৃষ্টদ্যুম্ন, ২. উত্তমৌজা, ৩. যুধামণ্যু, ৪. শিখণ্ডি ও

দ্রৌপদির পাঁচ ছেলে এবং পাণ্ডব শিবিরে সেনা, হস্তি ও ঘোড়া হত্যা করলেন। এ সময় পাঁচপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি সেখানে না থাকায় তাঁরা এ গুপ্ত হত্যার হাত থেকে রক্ষা পান।

অশ্বমেধ

প্রাচীন ভারতে সকল যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ প্রধান। ভারতে শ্রেষ্ঠ রাজারা নানাপ্রকার কামনায়, যেমন- ছেলে কামনায় বা রাজচক্রবর্তি হয়ে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য- এ যজ্ঞ করতেন। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর অতি সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়া, যা দেখতে মেঘের ন্যায় কালোরঙ, যার মুখ সুবর্ণের তুল্য, দু পার্শে অর্ধ চন্দ্রাকার চিহ্ন অঙ্কিত, লেজ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত, উদর কুন্দফুলের ন্যায় শ্বেতরঙ, হরিৎরঙ পা, কর্ণ সিন্দুরের ন্যায় রক্তিম, জিহ্বা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, চক্ষু সূর্যের ন্যায় তেজস্কর, বেগবান ও সর্বাঙ্গ সুগন্ধযুক্ত, তার কপালে জয়পত্র বন্ধন করে ছেড়ে দেয়া হতো। এ অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজারা সসৈন্যে অশ্বের অনুগমন করতেন। এক বৎসরকাল এ ঘোড়া পৃথিবীর চারদিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করত। এর অগ্রগতি কোন বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজা রোধ করতে এলে প্রমাণ হতো যে, তিনি অশ্বাধিকারির সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না। তখন যুদ্ধে শক্তিপরীক্ষা হতো। ঘোড়া ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করলে সে দেশের রাজাকে যুদ্ধ করতে হতো কিংবা বশ্যতা স্বীকার করতে হতো। এরূপে অশ্বের অধিকারি অন্য সমস্ত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে রাজচক্রবর্তি উপাধিলাভে সমর্থ হতেন। এক বৎসর পরে এ ঘোড়া ফিরে এলে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞের সমস্ত কাজ আরম্ভ হতো। যুপবদ্ধ ঘোড়াটিকে শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণগণ বধ করতেন। রাত্রে রাজপত্নীগণ অশ্বের মৃতদেহ রক্ষা করতেন। অশ্বের বক্ষঃস্থলের মেদ অগ্নিদগ্ধ করে যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা দগ্ধাবসার ধূম আঘ্রাণ করতেন। ঘোড়াদেহের অন্যান্য অংশ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে হোম করা হতো। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা এবং নিমন্ত্রিত নৃপতি ও অন্যান্য বর্ণের লোকদের যথাযোগ্য উপহার দিয়ে বিদায় দেয়া হতো। এ যজ্ঞের ফলে সর্বপ্রকার পাপক্ষয়, স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হতো। শত ঘোড়ামেধকারি রাজা ইন্দ্রত্বলাভ করতেন। সে জন্যে ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দু জনেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

অশ্বিনি

নক্ষত্রবিশেষ। তিনি দক্ষপ্রজাপতির মেয়ে ও চন্দ্রের স্ত্রী। এ নক্ষত্রের আকৃতি অশ্বের মস্তকের ন্যায়। এ জন্য এর নাম অশ্বিনি। এ নক্ষত্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে অবস্থান করে। তাই এ মাসের নাম আশ্বিন। চন্দ্রের সাতাশ জন স্ত্রীর

মধ্যে তিনি প্রথমা। চাঁদমণ্ডলে যে সাতাশটি নক্ষত্র বর্তমান, তার মধ্যে ঘোড়ামুন্ড কাকৃতি প্রথম নক্ষত্রটি অশ্বিনি।

অষ্টাবক্র

খ্যাতিমান মহর্ষি। তিনি সংহিতাকার। মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। তিনি কহোড়ের সঙ্গে নিজ মেয়ে সুমতির বিয়ে দেন। সুমতির অন্য নাম সুজাতা। গর্ভবতি হলে গর্ভস্থ বালক শ্রুতি দ্বারা সর্ববেদজ্ঞ হয়ে ওঠেন। সে গর্ভস্থ অবস্থায় শিশু একদিন বাবা কহোড়ের বেদপাঠ অশুদ্ধ বলায় কহোড় রেগে গিয়ে ছেলেকে অভিশাপ দেন যে, ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই যখন তার স্বভাব এত বক্র, তখন ভূমিষ্ঠ হলে তার দেহের আটস্থান বক্র হবে। গর্ভস্থ শিশু যথাসময়ে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালে তার নাম হয় অষ্টবক্র।

অষ্টবক্রের জন্মের পূর্বেই অর্থাভাবে কহোড় পিতারাজার কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখানে বরুণ-ছেলে সভাপণ্ডিত বন্দির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে কহোড় পরাস্ত হন ও শর্তানুযায়ি বন্দি তাঁকে জলে নিমজ্জিত করেন। বার বৎসর বয়সে অষ্টাবক্র সুজাতার নিকট বাবার দুরবস্থার বিবরণ শুনে তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুর সঙ্গে পিতারাজার সভায় গিয়ে তর্কে বন্দিকে পরাজিত করে জলমগ্ন বাবাকে উদ্ধার করেন। তখন কহোড় সন্তুষ্ট হয়ে অষ্টাবক্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করতে আদেশ করেন। তার ফলে তিনি নদী থেকে অবক্র এবং স্বাভাবিক সুন্দর দেহে উত্থিত হন। সে কারণে এ নদীর নাম হয় সমঙ্গা। বদান্য-ঋষির মেয়ে সুপ্রভার রূপে মুগ্ধ হয়ে অষ্টবক্র তাঁর পাণি-প্রার্থনা করেন। বদান্য তাঁকে হিমালয় ও কুবের ভবনাদির পরে এক বনে জনৈকা বৃদ্ধা তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করে আসতে বলেন। অষ্টবক্র যথাকালে সে বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হন। বৃদ্ধা তাঁকে বিধিমতে পরিচর্যা করে প্রতি রাত্রে নানাভাবে তাঁর সংযম পরীক্ষা করেন। অবশেষে তাঁর জিতেন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রি দেবি বলে আত্মপ্রকাশ করেন ও মহর্ষি বদান্যের অনুরোধে অষ্টবক্রকে পরীক্ষা করছিলেন বলে জানান। অবশেষে বদান্য তুষ্ট হয়ে মেয়ে সুপ্রভার সঙ্গে অষ্টবক্রের বিয়ে দেন। অষ্টবক্র পিতারাজাকে মোক্ষপিতা যে উপদেশসমূহ দেন, তার নামই 'অষ্টবক্র সংহিতা'।

অসুর

বেদের প্রাচীনতম অংশে অসুর অর্থে দেবতা, তুলনা পারসিক আবেস্তার 'আহুর'। দেবতা হিসাবে ইন্দ্র, অগ্নি এবং বরুণকে অসুর বলা হতো। পরে এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়– যারা দেবতার সঙ্গে বিরোধ করে, যারা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত সুধা পায়নি, তাদেরই অসুর বলে। বেদের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ, ঋক্‌বেদের শেষে এবং অর্থবেদে যারা দেবতা-বিরোধি, যাদের সুধা নেই– এ

অর্থেই এখন ব্যবহার হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে, প্রজাপতির নিঃশ্বাস একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সে প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস হতে অসুরদের সৃষ্টি হয়। শতপথ ব্রাহ্মণেও অসুরদের জন্ম সম্বন্ধে এ একই কথা লেখা আছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে ব্রহ্মার জঙ্ঘা হতে অসুরদের জন্ম। দেব-শত্রুদের এ নামে অভিহিত করা হয়। তাঁরা পূজা ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধ্বংস করতো। অসুরদের তিনটি ইন্দ্র ছিল– হিরণ্যকশিপু, বলি ও প্রহলাদ (মৎস্যপুরাণ)। তাঁরা রাত ও অন্ধকারের প্রতীক এবং তামসে পরিপূর্ণ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। যে সব অসুর দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হতো, তারা পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহ করে নানাপ্রকার বিপদ সৃষ্টি করতো (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। এ শ্রেণিতে পড়ে দৈত্য, দানব এবং কশ্যপের বংশধররা, কিন্তু পুলস্ত্যের বংশধর রাক্ষসদের বোঝায় না।

অহল্যা

ব্রাহ্মার মানসি মেয়ে ও শতানন্দের মা। 'হল' শব্দের একটি অর্থ কদর্যতা। সকল প্রকার হল্য বা বিরূপতাশূন্যা অদ্বিতীয়া সুন্দরি বলে সত্যযুগে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট মানসপুত্রিকে অহল্যা নাম দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা অহল্যাকে বহুদিনের জন্য গৌতম ঋষির কাছে রেখে যান। সঙযতচিত্ত গৌতম অতি যত্নসহকারে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে তাঁকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় ব্রহ্মার নিকট ফিরিয়ে দেন। ব্রহ্মা এতে সন্তুষ্ট হয়ে গৌতমের হাতে অহল্যাকে দান করেন। তিনি গৌতম ঋষির স্ত্রী ও ধর্মপত্নী। গৌতমের সঙ্গে অহল্যার বিয়ে হওয়ায় ইন্দ্র ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এ অপূর্ব সুন্দরি নারী তাঁরই প্রাপ্য। একদিন গৌতম চলে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে অহল্যার কাছে উপস্থিত হন এবং তার সঙ্গম প্রার্থনা করেন। অহল্যা দেবরাজকে চিনতে পেরেও সে সময় কামার্ত ছিলেন বলে দুর্মতিবশে তাঁর দ্বারা কামনা পরিতৃপ্ত করেন। ইন্দ্র সে স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই গৌতম উপস্থিত হন। ইন্দ্রকে দেখে ক্রুদ্ধ গৌতম অভিশাপ দেন যে, ইন্দ্র নপুংসক হবেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের অণ্ড খসে পড়ে। ইন্দ্র অতঃপর পিতৃদেবগণের নিকট নিজের দুর্দশা জানালে, তাঁরা মেষাণ্ড উৎপাটিত করে ইন্দ্রের দেহে সংযুক্ত করেন। গৌতম অহল্যাকে অভিশাপ দেন যে, তুমি রূপযৌবনসম্পন্না, কিন্তু তোমার মন অস্থির; সুতরাং জগতে তুমিই কেবল একমাত্র রূপবতি থাকবে না। সহস্র বৎসর তোমাকে এখানে অদৃশ্য অবস্থায় বায়ুভুক্ হয়ে অনাহারে অনুতপ্ত হৃদয়ে জীবনযাপন করতে হবে। একদিন যখন রামচন্দ্র এ গভীর অরণ্যে আসবেন, তখন সে অতিথিসৎকার করে তুমি পাপমুক্ত হবে। তারপর একদিন রাম গৌতমের আশ্রমে এলে তাঁর আগমনের ফলে অহল্যা সর্বপাপমুক্তা হন।

আদিত্য

অদিতির ছেলেগণ। অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ১. বিবস্বান, ২. অর্যমা, ৩. পুষা, ৪. ত্বষ্টা, ৫. সবিতা, ৬. ভগ, ৭. ধাতা, ৮. বিধাতা, ৯. বরুণ, ১০. মিত্র, ১১. শক্র ও ১২. উরুক্রম– এ বারোজন আদিত্যের জন্ম হয়। কালিকাপুরাণে বিধাতার স্থলে সোম। ঋক্‌বেদে একস্থানে আদিত্য-সংখ্যা ৬। যথা– ১. মিত্র, ২. অর্যমা, ৩. ভগ, ৪. বরুণ, ৫. দক্ষ ও ৬. অংশু। স্থানান্তরে ৭ এবং অন্যত্র ৮ দেখা যায়। তৈত্তিরিয়ে– ১. মিত্র, ২. বরুণ, ৩. ধাতা, ৪. অর্যমা, ৫. অংশু, ৬. ভগ, ৭. ইন্দ্র ও ৮. বিবস্বান– এ আট জন আদিত্য। শতপথ ব্রাহ্মণে বারোজন আদিত্য বারো মাসের প্রতীকস্বরূপ উল্লিখিত আছে। পুরাণে আছে– সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামির তেজ সহ্য করতে না পেতে বাবাকে জানালে বিশ্বকর্মা আদিত্যকে বারো খণ্ডে ভাগ করে সূর্যের তেজহ্রাস করেন। এ বারো ভাগে বিভক্ত সূর্য বারো নামে বারো মাসে উদিত হন। সে থেকে সূর্য ১. বৈশাখে তপন, ২. জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, ৩. আষাঢ়ে রবি, ৪. শ্রাবণে গভস্তি, ৫. ভাদ্রে যম, ৬. আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, ৭. কার্তিকে দিবাকর, ৮. অগ্রহায়ণে চিত্র, ৯. পৌষে বিষ্ণু, ১০. মাঘে অরুণ, ১১. ফাল্গুনে সূর্য এবং ১২. চৈত্রে বেদজ্ঞ নামে উদিত হন।

অরাবণ কি অরাম

লঙ্কার পরম শক্তিধর সম্রাট রাবণের প্রচণ্ড ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। লঙ্কাযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতির সন্ধানে। অদৃশ্য নিয়তির নির্মম পরিহাসে লঙ্কাপুরি বীরশূন্য হয়ে পড়ে। প্রিয়ছেলে বীরবাহুর অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বীরের অভাব ঘটে। রাজা রাবণ তুচ্ছ শক্রকে রেহাই দেবেন না এমন দৃঢ় ইচ্ছা তাঁর মনে। সান্ত্বনা লাভে ব্যর্থতা, রাণি চিত্রাঙ্গদার ধিক্কার রাজা রাবণকে প্রচণ্ড ক্রোধে চঞ্চল করে। তিনি নিজেই যুদ্ধ যাত্রা করে শক্র বিনাশ করে সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাবেন। সেখানে তাঁর নিজের জীবন বিসর্জনের আশঙ্কাও বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তবু নিজের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলেও তিনি তাঁর সঙ্কল্প নিয়ে অটল থাকেন। রাবণহীন বা রামহীন হলেই এ ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম আর দুঃখ বৃদ্ধি করবে না। তাই রাবণ সে সমাধানের সন্ধান করবেন। শ্রেষ্ঠ বীরের যে গৌরব তা রাবণের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। অগৌরবের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। বীরত্বের পরিণতি বরণ করে নেয়ায় রাবণের কোন দ্বিধা নেই। লঙ্কায় যুদ্ধের আগুন নির্বাপনের সাথে সাথে রাবণের হৃদয়ের আগুণও নিভে যাবে। আর সে পরিণতি লাভের জন্য রাবণের সামনে দুটো পথ উন্মুক্ত– হয়তো বীরবিক্রমে যুদ্ধে গৌরবময় বিজয়, না হয় শক্রহাতে ভয়াবহ মৃত্যুবরণ।

অরোধ্য প্রমীলা

প্রমোদ উদ্যান থেকে মেঘনাদ পত্নী প্রমীলা স্বামির সাথে মিলনের জন্য লঙ্কাপুরিতে প্রবেশ করবেন। সখি বাসন্তি আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, রামের দুর্বার সেনাদল লঙ্কা অবরোধ করে রেখেছে– সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। এ কথার উত্তরে প্রমীলার বীরশ্রেষ্ঠ স্বামির উপযুক্ত বক্তব্য রাখলেন। নিজের শক্তি সম্বন্ধে প্রমীলা অকুতোভয়। রামের সেনা-সামন্তদের তিনি মোটেই ভয় করেন না। কোন বাধাই তাঁকে স্বামি সান্নিধ্যে গমনে বিরত করতে পারবে না। তাই তিনি সখিকে নিজের দুর্বার মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করেন একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে। পর্বত থেকে প্রবল গতিশীল নদী যখন সাগরের উদ্দেশ্যে অপ্রতিরোধ্য যাত্রা শুরু করে তখন তার গতি রোধ করার সাধ্য কারও থাকে না। মেঘনাদ পত্নী প্রমীলা প্রবল গতিশীল স্রোতস্বিনীর মতোই সকল বাধা জয় করে যাবেন। তাঁর লক্ষ্যস্থল লঙ্কাপুরি। সে স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনও বাধা তিনি গ্রাহ্য করবেন না। প্রমীলার কার্যকলাপে তা-ই প্রমাণিত হয়েছিল। প্রমীলা তাঁর স্বামির সুযোগ্য পত্নী হিসেবে নিজের দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রমীলা চরিত্রের বলিষ্ঠতার যথার্থ নিদর্শন এ মন্তব্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামচন্দ্র প্রমীলাকে দেখে ভীত হয়ে সসম্মানে লঙ্কাপুরিতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। এতে রামচন্দ্র ভয়ার্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। পক্ষান্তরে প্রমীলার শক্তি সাহসের নিদর্শন ফুটে উঠেছে।

অংশুমান

সগররাজার নাতি। সগররাজার ৬০ সহস্র ছেলে কপিলমুণির শাপে ভস্মিভূত হলে তিনি যজ্ঞিয় অশ্বের অনুসন্ধানে বের হন এবং পাতালে গিয়ে মুণিকে স্তবে সন্তুষ্ট করে তাঁর নিকট হতে ঘোড়া আনয়ন করেন। মুণি প্রীত হয়ে তাকে এও বলেছিলেন যে স্বর্গ হতে গঙ্গাকে মহীতলে আনয়ন করতে পারলে গঙ্গার পবিত্র জলের স্পর্শে সগরবংশের উদ্ধার হবে। পরে সে বংশের সন্তান ভগীরত পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ করেন।

আর্য

ঋগ্‌বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডল, ৫১ সূক্ত, ৮ম, ঋক্ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, হিন্দুধর্মাবলম্বি সমস্ত লোকই আর্যা এবং হিন্দুধর্মবিরোধিরা আর দস্যু শব্দে অভিহিত হতেন। যথা– "বিজানীহ্যার্যান যেচ দস্যবো বর্হিস্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান। শাকিভব যমমানস্য চোদিতা বিশ্বেৎতাতে সধমাদেষু চাকন" অর্থাৎ

হে ইন্দ্র তুমি আর্যদেরকে বিশেষরূপে অবগত হও। ঐব্রতবিরোধিদেরকে নিগ্রহ করো যজ্ঞকারি যজমানের বশিভূত করো। তুমি শক্তিশালি অতএব যজমানের প্রযোজক হও। আমি যজ্ঞ মহোৎসবে তোমার ঐ সমুদয় কার্যের বিষয় কীর্তন করতে ইচ্ছে করি।

অথর্ববেদ সংহিতায় আর্যবর্তবাসি সমস্ত লোককে আর্য ও শূদ্র এ দু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়নপ্রণীত শৌতসূত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিন রঙকেই কেবল আর্য বলা হয়েছে। কাত্যায়নপ্রণীত সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে ভাষাকার লিখেছেন– "শূদ্রশ্চতুর্থো রঙ আর্যস্ত্রৈবর্ণিক" অর্থাৎ আর্য বললো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়র বৈশ্য এ তিন রঙ বোঝায়, শূদ্র চতুর্থ রঙ।

আয়ান

পূর্বে তিনি একজন ঋষি ছিলেন। এক সময়ে ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত থাকাকালিন নারায়ণ ঋষির সম্মুখে এসে জানালেন যে, তিনি তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এর জন্য তাঁকে বর দেবেন। ঋষি এ বর প্রার্থনা করলেন যে, নারায়ণের স্ত্রী যেনো তাঁর স্ত্রী হয়। নারায়ণ এ বর প্রদান করে জানালেন যে, পরজন্মে (দ্বাপরে) লক্ষ্মীকে তিনি পাবেন। কিন্তু তাঁকে ক্লীব হয়ে জন্মাতে হবে। পরে দ্বাপর যুগে লক্ষ্মী (রাধিকা) বৃষভানুরাজার মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এ সময় কৃষ্ণের জন্ম হলো। রাধিকার সঙ্গে আয়ানের বিয়ে হয়। একদিন শাক্ত আয়ান কালিপূজায় রত ছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে বনমধ্যে বিহার করছিলেন– এ সংবাদ আয়ানের বোন কুটিলা দেয়। তখন আয়ান রেগে গিয়ে রাধিকাকে মারতে অগ্রসর হলেন। এতে রাধিকা অত্যন্ত ভীত হওয়ায় কৃষ্ণ কালি মূর্তি ধারণ করলেন এবং রাধিকা কালির পদতলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে কালিভক্ত আয়ান রাধিকার উপর সন্তুষ্ট হয়ে কুটিলাকে বিস্তর তিরস্কার করলেন। এরপর আয়ানের মৃত্যু হয়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

চিকিৎসা শাস্ত্র। মহর্ষি সুক্রত লিখেছেন– 'আয়ুরশ্মিন বিদ্যতে অনেন বা আয়ু, বিন্দত্যায়ুর্ব্বেঃ" অর্থাৎ যার দ্বারা আয়ু লাভ করা যায় কিংবা যার দ্বারা আয়ুকে জানা যায় তাকে আয়ুর্বেদ বলে।

ভাবমিশ্রও লিখেছেন– "অনেন পুরুষো যস্মাদায়র্বিন্দতি বেত্তি বা। তস্মান্মুনি-বরৈরেষ আয়ুর্বেদ ইতি স্মৃত:"

কারও মতে আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপাঙ্গ, কাহারও মতে অথর্ববেদের উপাঙ্গ। যথা–

"সর্ব্বেষামের বেদনামুপবেদাভবিন্ত। ঋগ্বেদস্যায়ুর্বেদ উপবেদঃ"।

[চরণব্যুহ]

"তা খল্বায়র্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ববেদস্য"।

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়)

সুশ্রুতে লিখিত হয়েছে– প্রথমে ব্রহ্মা সহস্র অধ্যায় লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্বেদ প্রকাশ করেন। তাঁর নিকট হতে প্রজাপতি; প্রজাপতির নিকট হতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় তাদের নিকট হতে ইন্দ্র, ইন্দ্রর নিকট হতে ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। তদন্তস্থর সুশ্রুত এ আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বিশ্ব স্রষ্টা ব্রহ্মা আয়ুর্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করেছিলেন। যথা– ১. শল্যতন্ত্র ২. শালাক্যতন্ত্র, ২. কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ৪. ভূতবিদ্যাতন্ত্র, ৫. কৌমারভৃত্যতন্ত্র, ৬. অগদতন্ত্র, ৭. রসায়নতন্ত্র, ও ৮. বাজী-করণতন্ত্র।

১ম শাল্যতন্ত্র। এতে ১. তৃণ, ২. কাষ্ঠ, ৩. পাষাণ, ৪. পাংশু, ৫. স্বর্ণাদি ধাতু, ৬. ক্ষুদ্র ইষ্টক, ৭. অস্থি, ৮. কেশ, ৯. নখ ইত্যাদি শরিরে প্রবেশ করে পূয়, প্রস্রাব প্রভৃতি বন্ধ করে পীড়াদায়ক হয়। তা হতে মুক্ত হবার জন্য যন্ত্র ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করার প্রণালী এতে বর্ণিত হয়েছে।

২য় শালাক্যতন্ত্র। এতে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থ অর্থাৎ ১. চক্ষু, ২. কর্ণ, ৩. মুখ, ৪. নাসিকা, ৫. জিহ্বা, ৬. দন্ত, ৭. ওষ্ঠ, ৮. অধর, ৯. গণ্ড, ১০. তালু, ১১. আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয় তাদের বিনাশের উপায় লিখিত আছে।

৩য় কায়চিকিৎসা। এতে ১. জ্বর, ২. অতিসার, ৩. রক্তপিত্ত, ৪. শোষ, ৫. উন্মাদ, ৬. অপস্মার, ৭. কুষ্ঠ, ৮. মেহ প্রভৃতি সর্বাঙ্গব্যাপি রোগের শান্তির উপায় লিখিত হয়েছে।

৪র্থ ভূতবিধ্যাতন্ত্র। এতে ১. দৈত্য, ২. নাগ, ৩. পিশাচ, ৪. যক্ষ, ৫. রক্ষঃ ও ৬. গ্রহাদির দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের আরোগ্যের উপায়/স্বরূপ শান্তিকর্ম ও বলিদানাদির বিষয় লিখিত আছে।

৫ম কৌমা ভৃত্যতন্ত্র। এতে ১. শিশুপালন, ২. ধাত্রির দুগ্ধের দোষ সংশোধন ৩. স্তন্য-দোষ ও ৪. গ্রহদোষ হতে উৎপন্ন ব্যাধির চিকিৎসা লিখিত আছে।

৬ষ্ঠ অগদতন্ত্র। এতে ১. সাপ, ২. কীট, ৩. বৃশ্চিক, ৪. মুষিকাদির দংশন জনিত বিষ ও ৫. অপরাপর বিষের লক্ষণ এবং সে সকল বিষস্পর্শ করে অথবা দ্রব্য সংযোগে ভক্ষণ করে প্রাণিগণ বিনষ্ট হলে তার প্রতিবিধানের উপায় লিখিত আছে।

৭ম রসায়নতন্ত্র। এতে ১. বলিষ্ঠ হবার উপায়, ২. পরমায়ুঃ, ৩. মেধা, ৪. বল ইত্যাদি বৃদ্ধি এবং দেহ রোগমুক্ত করার উপায় বর্ণিত হয়েছে।

৮ম বাজীকরণতন্ত্র। এতে ১. অল্প অথবা শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি করার নিয়ম, ২. বিকৃত শুক্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার উপায়, ৩. ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তি, ৪. ক্ষীণ শরিরে বলবৃদ্ধি করার উপায় এবং ৫. মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখবার বিধান লিখিত আছে।

আয়ুর্বেদের কটি বিভাগ আছে যথা– অশ্বায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ, ব্রক্ষায়ুর্বেদ প্রভৃতি। কেউ কেউ কামশাস্ত্রকেও আয়ুর্বেদের অন্তর্গত বলেন।

আয়ুর্বেদ অতি প্রাচীন শাস্ত্র। বেদের মধ্যেও স্থানে স্থানে ঔষধি ও দেহস্ত শিরা-নাড়ি প্রভৃতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ভারতি আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালি, গ্রিক পারসিক আরব্য প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের চিকিৎসা শাস্ত্র; রচিত হবার পূর্বে সৃষ্ট ও লিখিত হয়েছে।'

আয়ু

চন্দ্র বংশের রাজা। বাবা পুরুরবা, মা উর্বশি। তিনি চ্যবন ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিত হন। তাঁর নহুষ প্রভৃতি পাঁচ ছেলে হয়। রাজকন্যা প্রভাকে তিনি বিয়ে করেন।

ইক্ষ্বাকু

সূর্য বংশের রাজাদের আদিপূরুষ। বৈবস্বত মনুর ছেলে এবং মনুর নাক থেকে উৎপন্ন। তিনি অযোদ্ধার রাজা। তিনি বৈবুক্ষা, নিমি, দন্ত ইত্যাদি একশ পুত্রের বাবা। তাদের মধ্যে ২৫ জন আর্যাবর্ত, ২৫ জন পশ্চিম দেশ, ৩ জন মধ্যদেশ এবং অবশিষ্টরা অন্যান্য দেশ শাসন করতেন। তাঁর নাম থেকে এ বংশের নাম হয় ইক্ষ্বাকু বংশ। এ বংশ শান্তনু পর্যন্ত।

ইন্দুমতি

বিদর্ভের রাজা ভোজের বোন। সূর্যবংশের রাজা রঘুর ছেলে অজের স্ত্রী। স্বয়ম্বর সভায় অন্যান্য রাজাকে উপেক্ষা করে তিনি রাজা অজের গলায় মালা দেন। অন্যান্য রাজা ঈর্ষান্বিত হয়ে অজকে আক্রমণ করেন। কিন্তু অজ সম্মোহন অস্ত্র দিয়ে সবাইকে পরাজিত করেন। একদিন ইন্দুমতি উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় শূন্য পথগামি নারদের বীণা থেকে পারিজাত মালা তাঁর দেহের ওপর পড়ে। মালা স্পর্শ মাত্রই ইন্দুমতি প্রাণত্যাগ করেন এবং তিনি অপ্সরার মূর্তি ধারণ করে স্বর্গে প্রস্থান করেন। পুরাকালের তৃণবিন্দু নামে এক ঋষির কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র হরিণি নামে এক অপ্সরাকে তাঁর তপোভঙ্গ করতে পাঠান। মুণির তপোভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর কোপে পড়ে বিদর্ভ রাজগৃহে হরিণি

ইন্দুমতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অপ্সরার অনুনয়ে মুণি বলেন, স্বর্গীয় কুসু-দর্শনে তার মুক্তি হবে।

ইন্দ্র

ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান প্রথম। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর– এ তিন শক্তির তিনি অধীন। অপর সকল দেবতার ওপর তিনি কর্তৃত্ব করেন বলে তিনি দেবরাজ নামে খ্যাতিমান। তিনি স্বয়ম্ভু নন।

ঋগ্‌বেদের দুটি সূক্তে (৩। ৪৮, ৪। ১৮) তাঁর জন্মের বিবরণ আছে। তিনি মাতৃগর্ভ থেকেই মার পার্শ্ব ভেদ করে জন্মাবার চেষ্টা করেন। জন্মগ্রহণ করেই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩। ৪৪। ৪)। তিনি জন্মাবধিই যোদ্ধা (৩। ৫১। ৮, ৫। ৩০। ৫, ৮। ৪৫। ৪) ও শত্রুদমনকারি (১০। ১১৩। ৪) ও অজেয় (১০। ১৩৩। ২)। তাঁর জন্মসময়ে ভয়ে পর্বত, আকাশ, পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল (৪। ১৭। ২) এবং দেবগণ ভীত হয়েছিলেন। তাঁর মা অদিতি। দেবগণ তাঁকে রাক্ষস বধের জন্য সৃষ্টি করেন (৩। ৪৯। ৯)। পুরুষসূক্তে (১০। ৯০। ১৩) ইন্দ্র ও অগ্নি পুরুষের মুখ হতে উৎপন্ন বলা হয়েছে। তিনি দ্যাবাপৃথিবীর ছেলে ও পিতা দু-ই (১০। ৫৪। ৩)। তাঁর বাবা দো ও ত্বষ্ঠা। অগ্নি ও পূষা তাঁর ভাই। তাঁর স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণি ও শচি।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, অমৃত নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণ নিহত ও পরাজিত হলে ইন্দ্রের বিমাতা অসুরএা দিতি কশ্যপের কাছে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারে এমন সন্তান প্রার্থনা করেন। কশ্যপ বলেন, দিতি যদি এক সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকেন, তবে প্রার্থিত ছেলে লাভ করবেন। নশত নব্বই বৎসর তপস্যা করার পর একদিন মধ্যাহ্নে দিতি মাথার দিকে পা ও পায়ের দিকে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছেন দেখে, ইন্দ্র তাঁকে অশুচি জ্ঞানে তাঁর উদরে প্রবেশ করে বজ্রদ্বারা গর্ভ সাত খণ্ড করেন। গর্ভস্থ শিশু কেঁদে ওঠায় ইন্দ্র 'মা রুদ' 'মা রুদ' (কেঁদো না) বলে শিশুকে কেটে ফেলেন। পরে সে শিশু যখন সাতমূর্তি ধরে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাঁদের নাম হয় মারুত এবং এ রূপেই তাঁরা সাতলোকে বিচরণ করতে থাকেন।

ইন্দ্রের রঙ কেশ শ্মশ্রু ঘোড়া রথ সবই হরিৎ বা পিঙ্গলরঙ। তাঁর দু দির্ঘ হস্ত, তাঁর অস্ত্র বজ্র, ধনুর্বাণ অঙ্কুশ। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ– সহস্র সহস্র নক্ষত্রে বিভূষিত আকাশই ইন্দ্র। এছাড়া তিনি প্রকাণ্ড কাঁটা ও জাল দ্বারা শত্রুদের জড়িত করতেন।

সোমরস তাঁর প্রিয় পানীয়। ইন্দ্র জন্মিয়াই তাঁর মা অদিতির স্তনে সোম দর্শন করেন (৩। ৪৮। ৩)। তিনি বাবা ত্বষ্টার সোম বলপূর্বক পান করেন (৪। ১৮। ৩)। সোমরস পান করতে করতে তাঁর উদর স্ফীত হয়েছে এবং দাড়িতে জটা বেঁধেছে। সোমরস রাখবার ঘটের নামই হয়েছিল ইন্দ্রোদর। ইন্দ্রের উদর সোমরসের হ্রদ (৩। ৩৬। ৮)। তিনি এক চুমুকে ত্রিশ হ্রদ সোমরস পান করেন (৮। ৬৬। ৪)। সোমপানে উত্তেজিত হয়ে তিনি মহাযোদ্ধা, বৃত্রহা। সোম হতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি (৯।৯৬। ৫)। বায়ুমণ্ডলের দেবতারূপে আবহাওয়ার ও বৃষ্টিপাতের উপর তাঁর প্রভূত আধিপত্য ছিল। বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাহায্যে তিনি অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ঘটাতেন। হাতে বজ্র থাকলেও রথে আরোহণ করে তীর-ধনুক ও বর্শার সাহায্যে তিনি যুদ্ধ করতেন। তিনি বহুভোজি ও চির-যুবা।

ইন্দ্রের বর্ণনা ঋগ্‌বেদের চতুর্থাংশ (২৫০ সূক্ত) জুড়ে আছে। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে আরও ৫০টি সূক্তে ইন্দ্রের বর্ণনা দেখা যায়। ইন্দ্র প্রাকৃতিক ব্যাপারে অধিষ্ঠাতা দেবতা, অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা এবং তিনি প্রধানত ঝড়-বজ্রেরও দেবতা। তিনি অনাবৃষ্টি ও অন্ধকাররূপ অসুরকে বিনাশ করেন। বৃত্র বা ব্যাপক মেঘকে তিনি বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করেন। তিনি জলকে প্রমুক্ত করেন; তিনি আলোক বিজয় করেন। তাঁর দেবকারু ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য লৌহ ও প্রস্তর দিয়ে তীক্ষ্ণ বহুসূচিমুখ ও হিরণ্য রঙ বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। ইন্দ্রের শরির প্রকাণ্ড, শক্তি প্রচুর, তিনি বজ্রবাহু। তিনি সুর ও অসুর। তিনি হিরন্ময় রথারূঢ় ও মনোরথ। হরিৎবর্ণ শত সহস্র সূর্যচক্ষু ঘোড়া তাঁর রথ বহন করে (৪। ৪৬। ৩, ৬। ৪৭। ১৮)। ইন্দ্রের রথ ও ঘোড়া ঋভুগণের নির্মিত। ইন্দ্র যখন সোমপানোন্মুক্ত হয়ে বজ্র নিয়ে মরুৎগণের সাহায্যে অনাবৃষ্টির অসুর অহি-বৃত্রকে আক্রমণ করেন, তখন আকাশ ও পৃথিবী প্রকম্পিত হয় (১। ৮০। ১১)। জলরোধকারি বৃত্রকে তিনি বজ্রে বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে পর্বত বিদীর্ণ করে বন্দি জলকে গোষ্ঠবদ্ধ গাভিগণের ন্যায় বিমুক্ত করেন। পর্বতে ও মেঘে যে দৈত্যদের বাস, তাদের পরাজিত করে ইন্দ্র জলকে মুক্তি দেন।

ইন্দ্রের শত্রু : ১. রাক্ষস, ২. অসুর, ৩. দৈত্য, ৪. অহি, ৫. বৃত্র, ৬. উরণ, ৭. বিশ্বরূপ, ৮. অর্বুদ, ৯. বল প্রভৃতি দানব। ইন্দ্র অহিকে অপসৃত করলেই আকাশে সূর্য দীপ্যমান হন। তিনি উষাকে প্রকাশিত করেন। তখন অন্ধকার গোষ্ঠ হইতে মুক্ত গাভীগুলির ন্যায় সূর্যকিরণ বর্হিগত হয়। এজন্য তিনি গো-পতি। শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে ইন্দ্রত্বলাভ হয়। সে কারণে ইন্দ্রের নাম শতমুখ, শতমন্যু। শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে পাছে কেউ ইন্দ্রত্বলাভ করে, এ ভয়ে ইন্দ্র তপস্বিদের তপস্যা ও সাধনায় নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন। এ ছিল তাঁর আত্মরক্ষার একটি

প্রধান উপায়। ইন্দ্র অসুরদের চিরশত্রু। অসুরদের অত্যাচার হতে রক্ষা লাভের জন্য এবং স্বর্গরাজ্য যাতে অসুরদের হস্তগত না হয়, সে জন্য তিনি তাদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে তাদের বিনাশ করতেন; কিন্তু এদের হাতে তিনি পরাস্তও হয়েছিলেন। এরূপে অসুরদের প্রধান– বৃত্র, নমুচি, শুষ্ণ প্রভৃতি তাঁর হাতে নিধনপ্রাপ্ত হয়। এ জন্য ইন্দ্র বৃত্রহা, বৃত্রঘ্ন, নমুচিসূদন, জম্ভভেদি, জম্ভভেদন, বলরিপু, বলভিদ, বলভেদন, বলারাতি, পুরুহুত, পাকশাসন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে খ্যাত। তিনি অসুরপুরি ধ্বংস করার জন্য পুরন্দর নামেও পরিচিত। মেঘ বাহন বলে তাঁর নাম মেঘবাহন, বারিবর্ষণ করেন বলে তিনি বৃষা। প্রধান অস্ত্রস্বরূপ বজ্রকে ধারণ করেন বলে তাঁর নাম গোত্রভিদ, বজ্রি, আখণ্ডল। তাঁর ঘোড়াগণ হরিদরঙ বলে তাঁর নাম হরিহর, হরিদশ্ব। তিনি পূর্বকোণের শাসক, স্বর্গরাজ্যের রাজা। বেদে তাঁর যে সব বিশেষত্বের কথা উল্লেখ আছে, তার সবই পৌরাণিকযুগেও বর্তমান ছিল। এখানেও তিনি বজ্র ও বিদ্যুতের নিক্ষেপক।

একবার তিনি বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পরে দধিচির অস্থনির্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করে স্বর্গরাজ্য জয় করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সোমরাস পানের মাত্রা বর্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয়াসক্তিও প্রবল হয়।

কথিত আছে যে, একদা সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার উদ্দেশে দারুণ তপস্যা করে। তখন ব্রহ্মা তাদের বর দেন যে, তাদের পরস্পরের হাতে ভিন্ন কাহারও মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা তাদের নিহত করার জন্য তিলোত্তমা নামে এক অপরূপ সুন্দরি নারীর সৃষ্টি করেন। সমস্ত প্রাণির সবচেয়ে সুন্দর অঙ্গ তিল তিল করে নিয়ে এ নারীমূর্তি সৃষ্টি হয়েছিল বলে এ নারীর নাম হয় তিলোত্তমা। ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করতে যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ করেন। তিলোত্তমাকে দেখবার জন্য তার গমনপথের অনুসরণে ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মুখ নির্গত হয়, এ ঘটনা হতেই তিনি চতুর্মুখ হন। ইন্দ্রের সহস্র নয়ন হল এবং শিব স্থির হয়ে ছিলেন বলে তাঁর নাম হয় স্থাণু। তারপর সুরা-পানমত্ত সুন্দ-উপসুন্দের কাছে তিলোত্তমা উপস্থিত হলে, তাকে লাভ করার জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হয়। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র তাঁর রূপ ধারণ করে স্ত্রী অহল্যার সতীত্বনাশ করেন বলে মুনির শাপে তাঁর সমস্ত দেহে সহস্র যোনি-চিহ্ন প্রকাশ পায়। ইন্দ্রের অনুনয়-বিনয়ে গৌতম ঐ চিহ্নগুলি লোচন-চিহ্নে পরিণত করেন। এ জন্য ইন্দ্রের আর এক নাম সহস্রাক্ষ বা নেত্রযোনি। রামায়ণের কাহিনি অনুসারে গৌতমের শাপে ইন্দ্রের অণ্ড খসে পড়ে; পরে অশ্বিনিকুমারদ্বয় মেষাণ্ড সংযোগে ইন্দ্রের পুরুষত্ব ফিরিয়ে আনেন। রামায়ণে কথিত আছে যে,

রাবণ স্বর্গে গিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকারের জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। রাবণছেলে মেঘনাদ দ্বারা পরাজিত ইন্দ্র লঙ্কায় নীত হন। এ জন্য মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নামে সুপরিচিত। ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুক্তি প্রার্থনা করেন যে, অগ্নিপূজা করলে অগ্নি হতে তাঁর জন্য ঘোড়া সমেত রথ উত্থিত হবে এবং সে রথে আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করলে ইন্দ্রজিৎ অবধ্য হবেন। অভীষ্ট বরের বিনিময়ে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে মুক্ত করেন এবং বলেন যে, অহল্যার সতীত্ব নাশের জন্য ইন্দ্রের এ দুর্গতি।

তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, ইন্দ্র যৌন-আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সুন্দরিদের প্রত্যাখ্যান করে ইন্দ্রাণিকে বিয়ে করেন। অন্যান্য গ্রন্থে আছে তিনি ইন্দ্রাণির সতীত্ব নষ্ট করেন এবং শাপ হতে রক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রাণির বাবা পুলোমাকে হত্যা করেন।

মহাভারতে কথিত আছে যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাঁর ঔরসে কুন্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং অর্জুনের জন্যই তিনি কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করে তার পরিবর্তে অব্যর্থ শক্তিঅস্ত্র দান করেন।

একবার তিনি ঋষি দুর্বাসার প্রদত্ত মালা প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধ ঋষি অভিশাপ দেন যে, তাঁর সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হবে। ইন্দ্র দৈত্যদের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে এমন দুর্দশাগ্রস্ত হন যে, সামান্য গব্যঘৃতের জন্যও তাঁকে ভিক্ষা করতে হয়।

পুরাণে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রজবাসিরা এক সময়ে ইন্দ্রের উপাসক ছিল। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় তারা ইন্দ্রের উপাসনা ত্যাগ করায় ইন্দ্র রেগে গিয়ে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সৃষ্টি করে তাদের দেশ প্লাবিত করতে থাকেন। তখন কৃষ্ণ আঙ্গুলে গোবর্ধন-পর্বত ধারণ করে ব্রজবাসিদের রক্ষা করেন। একবার কৃষ্ণ তাঁর স্ত্রী সত্যভামার অনুরোধে ইন্দ্রের পারিজাত বৃক্ষ কেড়ে নেন। তখন ইন্দ্রাণির প্ররোচনায় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্র কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধের ফলে ইন্দ্র পরাজিত হন। পরে কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের সদ্ভাব স্থাপিত হয়।

ইন্দ্রের পুত্রের নাম- জয়ন্ত। জয়ন্ত ব্যতীত ইন্দ্রছেলে- বালি ও অর্জুন। মেয়ে- জয়ন্তি। তাঁর নগরির নাম- অমরাবতি। উদ্যান- নন্দন। প্রমোদ-পুরি- বৈজয়ন্ত। ঘোড়া- উচৈঃশ্রবা। হস্তি- ঐরাবত। রথ- বিসান। রথচালক- মাতলি। তরবারি- পারন্ধ। ধনু- ইন্দ্রচাপ। অস্ত্র- বজ্র, হ্রাদিনী ও দম্ভোলি।

এরূপ মত প্রচলিত আছে যে, স্বর্গরাজ্যের যিনি অধিপতি হতেন, ইনিই 'ইন্দ্র' উপাধি লাভ করতেন। তিনি আদিত্যগণের অন্যতম। তিনি সংবর্ত, পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর বলে মর্ত্যের রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণ শস্য ও অন্নের প্রাচুর্য কামনায় ইন্দ্রের অর্চনা করতেন। বেদোক্ত ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু নামান্তর মাত্র।

ইন্দ্রজিৎ

রাবণের অন্যতম ছেলে। প্রধানা মহিষি মন্দোদরীর গর্ভে তাঁর জন্ম। এর অন্য নাম মেঘনাদ। জন্মকালে মেঘগর্জনের মতো গভীর শব্দে ক্রন্দন করেছিলেন বলে তাঁর এ নাম হয়। মহামায়ার পূজা করে মেঘনাদ মায়াবল লাভ করেন। তিনি অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাতযজ্ঞ সম্পন্ন করেন ও দুঃসাধ্য মহেশ্বর যজ্ঞ করে পশুপতির নিকট বর লাভ করেন। তিনি কামচারি আকাশগামি স্যন্দন, তামসি মায়া, অক্ষয় তূণির ও শত্রুনাশক অস্ত্রসমূহ লাভ করে দুর্ধর্ষ হন। দিগ্বিজয় করার সময় রাবণ ছেলেসহ ইন্দ্রকে জয় করার জন্য স্বর্গে যান; সে সময়ে মেঘনাদ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে পরাজিত করেন এবং শিবের বরে মায়া প্রভাবে অদৃশ্য থেকে, ইন্দ্রকে মায়াতে আচ্ছন্ন, শরজালে অবসন্ন এবং বন্দি করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রের মুক্তি-ভিক্ষা করতে আসেন। ব্রহ্মা মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা দেন। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ইন্দ্রজিৎ অমরত্ব প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা উক্ত বর দিতে অস্বীকার করে অন্য বর প্রার্থনা করতে বলায়, ইন্দ্রজিৎ প্রার্থনা করেন যে, যখন আমি যথাবিধি অগ্নির পূজা করে যুদ্ধযাত্রা করব, তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে ঘোড়া সমেত রথ উত্থিত হবে, সে রথে যতক্ষণ অবস্থান করব, ততক্ষণ আমি যেনো অমর হই। অগ্নি পূজার জপ ও হোম অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধযাত্রা করলেই আমি বধ্য হব। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ব্রহ্মা এ বরেই স্বীকৃত হন।

রামচন্দ্র বানর সৈন্যের সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশ করলে, ইন্দ্রজিৎ প্রথমেই অঙ্গদ হাতে পরাজিত হন। এতে তিনি রেগে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত গরুড়ের কৃপায় তাঁরা উভয়েই রক্ষা পান। এরপর কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ত্রিশিয়া প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হলে, ইন্দ্রজিৎ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও অজ্ঞান করেন; কিন্তু হনুমান ঔষধ এনে তাঁদের সঞ্জীবিত করেন। এরপর তিনি যুদ্ধস্থলে মায়া-সীতা প্রদর্শন করে কৌশলে রামকে পরাজিত করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু রাম এ চাতুরি বুঝতে পারায় তাঁর কৌশল ব্যর্থ হয়। তখন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে অজেয় হবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পূর্বেই নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তাঁকে বধ করেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন

(১) তিনি সূর্যবংশিয় অবন্তি বা উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি বিষ্ণুপূজা করতে মনস্থ করেন; কিন্তু আরাধনার মনোমত স্থান খুঁজে না পেয়ে অবশেষে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এসে পূজা করেন এবং যজ্ঞ শেষে এক বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ

করেন; কিন্তু কি মূর্তি স্থাপন করবেন, তা স্থির করতে অসমর্থ হন। বিষ্ণু তাঁকে স্বপ্নে তাঁর সনাতনী মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করতে বলেন এবং আরও বলেন যে, অদ্য প্রাতঃকালে সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখবে, একটা প্রকাণ্ড কাঠ ভেসে যাচ্ছে। এ কাঠ হতে আমার মূর্তি প্রস্তুত করবে। প্রভাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রতীরে এক ভাসমান কাঠ পেয়ে স্বহাতে কুঠার দিয়ে কাঠ কাটতে লাগলেন। এমন সময় ছদ্মবেশে বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা এলেন। বিষ্ণু বলেন, এ মূর্তি তৈরি করার কাজ তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে একজন কুশলী শিল্পি আছেন, তিনি বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি তৈরি করে দিতে পারবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্মত হয়ে ছদ্মবেশি শিল্পিকে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে দিতে বললেন। এরূপে ঐ তিনমূর্তি তৈরি হল।

(২) রাজা তৈজসের ছেলে। তিনি সব সময় ভগবানের তপস্যায় রত থাকতেন। এক সময় তপস্যায় রত থাকাকালে অগস্ত্য তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁর কোনরূপ অভ্যর্থনা না করায় ক্রুদ্ধ অগস্ত্যের অভিশাপে রাজা হস্তিতে পরিণত হন। পরজন্মে তিনি যূথপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরির স্পর্শে তিনি শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করেন।

ইন্দ্রধনু

বনবাস কালে এ ধনু মহর্ষি অগস্ত্য রামকে উপহার প্রদান করেন। এ অস্ত্র দিয়ে রাম রাবণকে নিধন করেন। রাম-রাবণ যুদ্ধকালে মাতলি দ্বারা ইন্দ্রপ্রমতি তাঁর সংহিতার এক অংশ নিজের ছেলে মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করান। তাঁর ছেলে মাণ্ডক্য।

ইন্দ্রসেন

(১) নল ও দময়ন্তির ছেলে। (২) যুধিষ্ঠিরের সারথি। (৩) পরীক্ষিতের ছেলে।

ইন্দ্রাণি

ইন্দ্রের স্ত্রী, জয়ন্ত ও জয়ন্তির মা। এঁকে শচি বা ঐন্দ্রী বলা হয়। ঋগবেদে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে যে, স্ত্রীকুলে ইনিই বিশেষ ভাগ্যবতি। কারণ তাঁর স্বামির কখনও বার্ধক্যজনিত মৃত্যু হবে না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে, সমবেত কয়েকটি রাজকুমারির মধ্য হতে ইন্দ্র এঁকেই স্ত্রী বরে মনোনীত করেন। কারণ, তাঁর মধ্যে যৌন আবেদন ছিল অধিক। রামায়ন ও পুরাণে তিনি দৈত্য পুলোমার মেয়ে। ইন্দ্র তাঁর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং তার শাপ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর বাবাকে হত্যা করেন। মহাভারতের মতে রাজা নহুষ তাঁর রূপে মুগ্ধ হন এবং অনেক কষ্টে তিনি নহুষের হাত থেকে পরিত্রাণ পান। দেবিদের মধ্যে ইন্দ্রাণির স্থান খুব উচ্চে নয়।

ইরাবতি

উত্তর-দুহিতা। তিনি পরীক্ষিতের পত্নী এবং জনমেজয়ের মা।

ইলা

(১) বৈবস্বত মনুর মেয়ে, বুধের পত্নী পুরুরবার মা। মনু মিত্রাবরুণের উপাসনা করে একটি সন্তান প্রার্থনা করেন; কিন্তু আরাধনার ত্রুটিবশত পুত্রের পরিবর্তে মেয়ে হয়। এ মেয়ের নাম ইলা। তিনি পরে বিষ্ণুর বরে পুরুষত্ব লাভ করে 'সুদ্যুম্ন' নামে খ্যাত হন। পরে মহাদেবের অভিশপ্ত কুমার বনে প্রবেশ করে আবার স্ত্রীভাবাপন্ন হন। তাঁর পুরোহিত বশিষ্ঠ শিবের উপাসনা করলে তিনি একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হয়ে থাকবার বর পান। (ইড়া)

(২) তিনি বায়ুকন্যা। ধ্রুবের পত্নী।

ঈশ্বর

মহাদেব (এগারোতনু দেখুন)।

উগ্র

(১) শিবের আটমূর্তির বায়ুমূর্তি। শিবের আটমূর্তি– ক্ষিতি (পৃথিবী) মূর্তি সর্ব; অপ (জল) মূর্তি ভব, তেজ (অগ্নি) মূর্তি রুদ্র; মরুৎ (বায়ু) মূর্তি উগ্র; ব্যোম (আকাশ) মূর্তি ভিম; যজমান মূর্তি পশুপতি; চাঁদ মূর্তি মহাদেব, সূর্য মূর্তি ঈশান। (২) বরাহ কল্পের এগারো দ্বাপরে মহাদেব গঙ্গাদ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বদেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁর চার ছেলে জন্মে। তাঁরা সকলেই মাহেশ্বর-যোগে পারদর্শি ছিলেন। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হলে, মাতৃকা জটাধরা তার সাহায্যার্থে উগ্র প্রভৃতি সহচরকে প্রেরণ করেছিলেন। (৪) মহিষাসুরের একজন সেনাপতি। (৫) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম।

উতঙ্ক

মহর্ষি আয়োদধৌম্যের বেদ নামে একজন শিষ্য ছিল। উক্ত বেদের শিষ্যগণের মধ্যে একজনের নাম উতঙ্ক। গুরুভক্তির জন্য উতঙ্কের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। একদিন বেদ যাজন কার্যের জন্য স্থানান্তরে যাবার সময় উতঙ্কের উপর গৃহের সমস্ত ভার দিয়ে গেলেন। উক্ত সময়ে একদিন আশ্রমের নারীরা উতঙ্কের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, গুরুপত্নী ঋতুময়ি হয়েছেন, অতএব ঋতু যাতে নিষ্ফল না হয়, তাঁকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উতঙ্ক এ অসঙ্গত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

করলেন। কারন গুরু তাকে ঈদৃষ কোন অকার্য করার আদেশ দেন নাই। গুরু আশ্রমে প্রত্যাগমনের পর এ ঘটনা শুনে শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে আর্শীবাদ করে স্বগৃহে ফিরে গিয়ে গৃহী হতে বললেন। অতঃপর উতঙ্ক গুরুকে তাঁর অভীষ্ট দক্ষিনা দিতে চাইলেন। গুরু তখন এ দক্ষিনা দান স্থগিত রাখতে বললেন; কিন্তু শিষ্য আবার দক্ষিনার কথা বলায় গুরু বললেন, তাঁর স্ত্রী শিষ্যের কাছে যা চাইবেন, তাই হবে গুরুদক্ষিনা। উতঙ্ক গুরুপত্নীর কাছে গেলে গুরুপত্নী উতঙ্ককে রাজা পৌষের ক্ষত্রিয়-পত্নীর দুটি কুন্ডল চেয়ে আনতে বললেন। কারণ, চারদিন পরে যে পুণ্যকব্রত হবে, তাতে গুরুপত্নী ঐ কুন্ডলদ্বয় ধারণ করে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে ইচ্ছা করেন। কুন্ডল আনবার যাত্রাপথে উতঙ্ক প্রকাণ্ড বৃষারূঢ় এক মহাকায় পুরুষকে দেখতে পেলেন। সে পুরুষ উতঙ্ককে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করতে বলায়, উতঙ্ক অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি উতঙ্ককে পুনর্বার উক্ত অখাদ্য ভক্ষণ করতে বলেন এবং জানান যে উতঙ্কের উপাধ্যায়ও পূর্বে তা গলাধঃকরণ করেছেন। তখন উতঙ্ক বৃষের মলমূত্র খেয়ে, সত্বর আচমন করে রাজা পৌষ্যের নিকট গিয়ে, রাণির কুণ্ডল প্রার্থণা করলেন। রাজা উতঙ্ককে রাণির কাছে গিয়ে উক্ত প্রার্থণা জানাতে বললেন। কিন্তু উতঙ্ক মহিষিকে খুঁজে পেলেন না। তখন পৌষ্য বললেন যে, সম্ভবত অশুচি থাকার দরুন রাণি দেখতে পাওনি। তখন উতঙ্কের মনে হল, তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র আসবার জন্যেই দাঁড়িয়েই আচমন করেছিলেন, সেজন্য এতে এ দোষ এসেছে। তখন তিনি পূর্বাস্য হয়ে ভাল করে আচমন করে অন্তঃপুরে গিয়ে রাণিকে দেখতে পেলেন ও অভীষ্ট কুণ্ডল লাভ করলেন। রাণি তাঁকে উপদেশ দিলেন যে, নাগরাজ তক্ষক এ কুণ্ডল দুটির প্রার্থী, উতঙ্ক যেনো যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেন কুণ্ডল দুটি নিয়ে যাবার জন্য। রাজা পৌষ্য উতঙ্কের সৎকারের অভিলাষে অন্নের ব্যবস্থা করলেন বটে, কিন্তু অন্ন শীতল ও তাতে কেশ থাকায় উতঙ্ক রাজাকে অশুচি অন্ন দেয়ার জন্য অন্ধ হবার অভিশাপ দিলেন। রাজাও নির্দোষ অন্নের দোষ দেয়া হয়েছে মনে করে উতঙ্ককে নিঃসন্তান হবার অভিশাপ দিলেন। উতঙ্ক বললেন, অশুচি অন্নদাতার অভিশাপ দেয়া অনুচিত। রাজা অন্ন পরীক্ষা করে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, অন্ন হয়ত কোন মুক্তকেশী স্ত্রী এনেছে, তাই এতে কেশ পড়েছে। তখন রাজা ক্ষমা প্রার্থানা করায় উতঙ্ক বললেন যে, অন্ধত্বলাভের পর রাজা পুনর্বার দৃষ্টি ফিরে পেবেন, কিন্তু অন্নের দোষ স্বীকার করার জন্য রাজার অভিশাপ নিষ্ফল হবে। এ বলে উতঙ্ক কুণ্ডল নিয়ে চলে যান। পথে স্নান করার সময় উতঙ্ক যখন কুণ্ডল দুটি ভূমিতে রেখেছেন তখন এক নগ্ন ক্ষপণক (দিগম্বর সন্ন্যাসি) সে দুটি নিয়ে পলায়ন করে। স্নান শেষে উতঙ্ক দৌড়ে ক্ষপণককে ধরলেন বটে, কিন্তু সে তক্ষকের রূপ ধারণ

করে সহসা আবির্ভূত এক গর্তের মধ্যে দিয়ে নাগলোকে চলে গেল। উতঙ্ক দন্ডকাষ্ঠ দিয়ে গর্ত খুঁড়তে অকৃতকার্য হয়ায় ইন্দ্রের আদেশের বজ্র দন্ডকাষ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়ে গর্ত বড় করে নাগলোক গমনের পথ করে দিল। নাগলোক গিয়ে কুণ্ডল ফিরে পাবার জন্য উতঙ্ক নাগদের স্তব করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, দু স্ত্রী সাদা ও কালো সুতো দিয়ে তাঁতে কাপড় বুনছে এবং ছ-কুমার বারো অর (পাখি) যুক্ত একটি চাকা ঘোরাচ্ছে। তাছাড়া একজন সুদর্শন পুরুষ এবং একটি ঘোড়াও সেখানে রয়েছে। এঁদের স্তব করলে সে পুরুষ উতঙ্ককে বড় প্রার্থানা করতে বলায় উতঙ্ক নাগদের বশিভূত করতে চাইলেন। তখন সে পুরুষ উতঙ্ককে অশ্বের গুহ্যদেশে ফুৎকার দিতে বললেন। আদেশ পালন করা মাত্র অশ্বের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার থেকে সধূম অগ্নিশিখা নাগলোক ব্যাপ্ত করল এবং ভীত তক্ষক উতঙ্ককে কুণ্ডলদ্বয় প্রর্তপণ করলেন। সেদিনই আবার উপাধ্যায়ানির পুণ্যকব্রতের দিন। তখন সেই পুরুষের কথামতো ঐ অশ্বে আরোহণ করে উতঙ্ক যাত্রা করলেন। গুরুপত্নী স্নানান্তে কেশ-সংস্কার করতে করতে উতঙ্কের বিলম্বাতিশয্যে তাঁকে অভিশাপ দেবার উপক্রম করছিলেন; কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই উতঙ্ক সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কুণ্ডল দান করলেন। পরে গুরুর কাছে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করায় গুরু বললেন, বস্ত্রবয়নকারি দু স্ত্রী হলেন ধাতা ও বিধাতা, কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র রাত ও দিন। ছ-কুমার ছ-ঋতু, চক্র সংবৎসর, বারো আর বারো মাস, পুরুষ ইন্দ্র এবং ঘোড়া অগ্নি। যাবার পথে বৃষারূঢ় পুরুষ ঐরাবত-আরোহি ইন্দ্র, বৃষের পুরীষ অমৃত। নাগলোকে উতঙ্ক নিরাপদ ছিলেন, কারণ, ইন্দ্র উপাধ্যায়ের সখা, তাঁর অনুগ্রহেই কৃণ্ডল আনা সম্ভব হয়েছে। তারপর গুরু তাঁকে স্বগৃহে যেতে বললেন। অতঃপর উতঙ্ক হস্তিনাপুরে গিয়ে রাজা জনমেজয়কে তক্ষকের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সর্বসত্রের অনুষ্ঠান করতে পরামর্শ দেন।

উত্তর

তিনি মৎস্যরাজ বিরাটের কনিষ্ঠ ছেলে। অন্য নাম ভূশিঞ্জয়। জ্যেষ্ঠ ভাইর নাম শঙ্খ। বিরাট-গৃহে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে দুর্যোধন বিরাট রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের গোধন হরণের জন্য সুশর্মা এবং উত্তরাঞ্চলের গোধন হরণের জন্য ভিষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে পাঠান। সুশর্মাকে বাধা দিতে গিয়ে বিরাট বন্দি হন এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভিম সুশর্মাকে পরাজিত করে বিরাটরাজ ও তাঁর গোধন উদ্ধার করেন। উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধে উত্তর বৃহন্নলারূপি অর্জুনকে সারথি করে যুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু কুরুসৈন্যর সমাবেশ দেশে পৎরাৎযস করেন। তখন অর্জুন আত্মপরিচয় দিয়ে উত্তরকে আশ্বস্ত করে তাঁকেই সারথি নিযুক্ত করে কৌরবদের পরাজিত করেন ও গোধন উদ্ধার করেন। যুদ্ধশেষে উত্তর বিরাট রাজের কাছে

অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর সঙ্গে নিজ বোন উত্তরার বিরাহের প্রস্তাব করেন। বিরাটরাজ অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিনেই ইত্তর শল্যের হাতে নিহত হন।

উত্তম

রাজা উত্তানপাদ ও রানি সুরুচির ছেলে। অন্য রানি সুনীতির ছেলে ধ্রুব। সুরুচি রাজার প্রিয়তমা মহিষি। তিনি সুনীতি ও ধ্রুবকে অবজ্ঞা করতেন। এ কারণে ধ্রুব বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। একদিন হরিণি শিকার কালে উত্তম বনমধ্যে যক্ষ দ্বারা নিহত হন। উত্তমের মা সুরুচিরও পুত্রের অনুসন্ধানকালে অরণ্যের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ঘটে।

উত্তরা

তিনি মৎস্যরাজ বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার সুদর্শনা মেয়ে এবং অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর স্ত্রী। পাণ্ডবদের বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলা নামে ক্লীববেশি অর্জুন উত্তরাকে নৃত্য-গীতাদি-কলাবিতদ্যা শিক্ষা দিতেন। উত্তর-গোগৃহ অপহরণকালে উত্তরার অনুরোধে পরাজিত কৌরব রাজাদের গাত্র হতে উত্তরার জন্য উত্তরের দ্বারা অর্জুন কৌরবদের সূক্ষ্মববস্ত্রাদি অপহরণ করিয়ে আনেন। যুদ্ধশেষে অর্জুনের পরিচয় পেয়ে বিরাটরাজ অর্জুনের হাতে উত্তরাকে সম্প্রদান করতে চান, কিন্তু মেয়েস্থানীয়া শিষ্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত অর্জুন নিজ ছেলে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সাতরথী দ্বারা অন্যায় যুদ্ধে যখন অভিমন্যু নিহত হন, তখন উত্তরা অন্তঃসত্ত্বা। অশ্বথামার মণি অপহরণকালে অশ্বথামা ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। নারদ ও ব্যাসের অনুরোধে র্অজুন আপন অস্ত্র সংবরণ করেন; অশ্বথামা অস্ত্র সংবরণে অসমর্থ হয়ে সেটি পাণ্ডব নারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করেন। পরে উত্তরা মৃত ছেলে প্রসব করলে, কৃষ্ণ যোগ বলে তার জীবনদান করেন। এ সন্তানের নাম হয় পরীক্ষিৎ। মহাপ্রস্থানকালে পাণ্ডবরা পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে যান।

উদ্দালক

একজন খ্যাতিমান ঋষি। তাঁর প্রকৃত নাম আরুণি। তিনি গুরু আয়োদধৌমের বরে উদ্দালক নামে খ্যাত হন। তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতকেতু তাঁর বাবার কাছে বসেছিলেন এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁদের সম্মুখেই তাঁর মাকে যৌন আবেদন জানায় এবং বলপূর্বক তার হস্ত ধারণ করে নিয়ে যায়। এতে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাতে, তাঁর বাবা উদ্দালক ছেলেকে

বলেন যে, 'হে ছেলে! ক্রুদ্ধ হয়ো না, এ সনাতন ধর্ম, গাভিদের ন্যায় স্ত্রীরাও অরক্ষিত।' শ্বেতকেতু এ বাক্য অস্বীকার করেন এবং তিনি স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে এ নিয়ম স্থাপন করেন যে, যে নারী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ করবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, তারা উভয়েই ভ্রূণহত্যার পাপে নিমগ্ন হবে।

উপমন্যু

(১) উপমন্যু মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য। গুরুভক্তির জন্য তিনি খ্যাতিমান। উপমন্যু গুরুর গোচারণ করতেন। একদিন শিষ্যকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হতে দেখে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আহার করে এমন স্থূল হয়েছো। শিষ্য উত্তর দিলো, সে ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ করে। গুরুকে নিবেদন না করে ভিক্ষান্ন ভোজন অনুচিত বলায়, উপমন্যু ভিক্ষা দ্রব্য গুরুকে দিতে থাকেন। তথাপি তাকে পুষ্ট হতে দেখে গুরু একদিন প্রশ্ন করলেন যে, সমস্ত ভিক্ষা দ্রব্য গুরুকে দেয়া সত্ত্বেও সে কি আহার করে? শিষ্য জানালেন যে, সমস্ত ভিক্ষান্ন গুরুকে দেবার পর সে পুনর্বার ভিক্ষা করে এবং দ্বিতীয় বারের ভিক্ষান্নে ক্ষুধা নিবারণ করে। গুরু এ কাজে তাকে নিষেধ করে বলেন, দু বার ভিক্ষা করায় তোমার লোভ বৃদ্ধি পায় ও অন্য ভিক্ষাজীবীদেরও এতে ক্ষতি হয়, অতএব তুমি এ থেকে নিবৃত্ত হও। অতঃপর উপমন্যু একবার মাত্র ভিক্ষা করে গুরুকে ভিক্ষালব্ধ সামগ্রি দিতে লাগলেন। পারে গুরু আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাকে এখনও বেশ স্থূলই দেখা যাচ্ছে; এখন তুমি কি আহার করো? উত্তরে উপমন্যু বলে যে, সে আশ্রমের গাভির দুগ্ধ পান করে। বিনা অনুমতিতে দুধ খাওয়া অন্যায় বলে গুরু তাকে এ কাজ করতেও নিষেধ করলেন। এর পরেও শিষ্যকে স্থূলকায় দেখে গুরু পুনর্বার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উপমন্যু বললেন যে, দুগ্ধ পানান্তে গোবৎসরা যে ফেন উদ্‌গার করে, সে তাই পান করে। গুরু বললেন, এ গোবৎসরা তোমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রচুর ফেন উদ্‌গার করে। এতে তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে; সুতরাং তা অনুচিত। গুরুর সকল নিষেধ পালন করেও সে যথারীতি গরু চরাতে লাগল। একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে উপমন্যু অর্কপত্র (আকন্দপাতা) আহার করে এবং সে তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীব্র বস্তু খেয়ে, অন্ধ হয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় এক কূপের মধ্যে পতিত হয়। উপমন্যুর প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব দেখে ধৌম্য সশিষ্য তাঁকে খুঁজতে বেরোলেন। ধৌম্যের আহ্বান শুনতে পেয়ে কূপের মধ্য থেকে উপমন্যু আপন অবস্থা গুরুকে জানালেন। তখন ধৌম্য উপমন্যুকে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করতে বললেন। উপমন্যুর স্তবে অশ্বিনিকুমারদ্বয় আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পিষ্টক খেতে দিলে সে গুরুকে নিবেদন না করে তা খেতে অস্বীকার

করে। তখন অশ্বিনিকুমারদ্বয় তাঁর গুরুভক্তিতে প্রীত হয়ে বলেন যে, তোমার দন্ত হিরন্ময় হবে, তুমি চক্ষুষ্মান হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে। চক্ষুলাভ করে গুরুকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করার পর গুরু বললেন, সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার আয়ত্ত হবে। গুরুগৃহে এরূপ পরীক্ষা দেবার পর উপমন্যু নিজ গৃহে গমন করেন। (মহাভারত)

(২) উপমন্যু মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদের ছেলে। তিনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে অজর অমর সর্বজ্ঞ ও সুদর্শন হওয়ার বর পান। কৃষ্ণ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে মহাদেবের তপস্যায় রত হন এবং অভীষ্ট বর লাভ করেন। (মহাভারত)

উপরিচরবসু

পুরুবংশজাত চেদিদেশের রাজা। তাঁর নাম ছিল বসু। ইন্দ্র-বংশিয়ক কৃতি রাজার ছেলে। তিনি সমস্ত শত্রু দমন করে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে দেবতারা ভীত হয়ে শান্ত বাক্যে এঁকে নিবৃত্ত করেন। তখন ইন্দ্রের সঙ্গে এর সখ্য হয় । ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হওয়াতে ইন্দ্র এঁকে স্ফটিকময় বিমান, বৈজয়ন্তিমালা এবং যষ্টি উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন বলে তাঁর নাম উপরিচর। উপরিচর অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব করে ইন্দ্রদত্ত যষ্টি রাজপুরিতে এনে ইন্দ্রপূজা করতেন ও পরের দিন ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলন করতেন। সে থেকে এ উৎসব প্রচলিত হয়। তাঁর পাঁচ ছেলে বিভিন্ন দেশে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁর রাজধানির কাছে শক্তিমতি নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামান্ধ হয়ে শক্তিমতিকে আক্রমণ করে। বসুরাজ পর্বতের এ অন্যায় ব্যবহারে রেগে গিয়ে পদাঘাতে সে পর্বত বিদীর্ণ করলে শক্তিমতি সে বিদীর্ণ পথ দিয়ে বহির্গত হন। কোলাহল পর্বতের সঙ্গমে এ নদীর গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। শক্তিমতি ছেলে-মেয়েকে রাজার হাতে অর্পণ করেন। রাজা সে ছেলেকে সেনাপতি ও মেয়ে গিরিকাকে মহিষি করেন। একদা গিরিকা ঋতুস্নাতা হয়ে স্বামির সহবাস প্রার্থণা করেন, কিন্তু পিতৃলোকদের আদেশে রাজা হরিণশিকারে বের হতে বাধ্য হন। শিকার কালে তিনি ঋতুস্নাতা সুন্দরি মহিষি গিরিকার স্মরণে কামাবিষ্ট হন এবং তাঁর স্খলিত-শুক্র এক শ্যেনপক্ষির দ্বারা রাণির কাছে প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমনে সে শুক্র যমুনার জলে পতিত হয়। ব্রহ্মশাপে মাছরূপিণি অদ্রিকা নামে এক অপ্সরাও এ শুক্র গ্রহণ করে গর্ভিণি হয়, এবং দশ মাস পরে ধীবরের জালে ধৃত হয়। মৎসির এক ছেলে ও মেয়ে পেয়ে ধীবর রাজার কাছে যায় এবং অপ্সরাও শাপমুক্ত হয়। উপরিচর ছেলেকে গ্রহণ করেন ও মেয়েকে ধীবরের হাতেই দান করেন। পুত্রের নাম হয় মৎস্যরাজ। তিনি পরে এক ধার্মিক রাজা হয়েছিলেন। মেয়ের নাম

সত্যবতি, কিন্তু মৎস্যজীবীদের কাছে থাকার জন্য তার নাম হয় 'মৎস্যগন্ধা'। এক দিন যখন এ মেয়ে যমুনায় নৌকা চালনায় রত ছিল, তখন পরাশর মুনি তার কাছে ছেলে কামনা করেন। পরাশরের প্রার্থণা পূরণ করায় মৎস্যগন্ধার দেহ সুগন্ধময় হয় এবং তার নাম হয় 'গন্ধবতি'। সদ্যগর্ভ ধারণ করে সত্যবতি যমুনার দ্বীপের মধ্যে যে ছেলে প্রসব করেন, তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। (মহাভারত)

উর্ব

পাণ্ডববংশিয় পুরঞ্জয়ের ছেলে । মহর্ষি উর্ব কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং ব্রহ্মার সমান গুনযুক্ত ও তেজস্বি ছিলেন। একবার তিনি তার উরুতে হুতাসন প্রবিষ্ট করে তপস্যায় নিবিষ্ট ছিলেন। তখন হঠাৎ তার উরু ভেদ করে এক অনল উত্থিত হয়। এর নাম উর্ব অনল। ব্রহ্মা এ অনলকে সমুদ্রে স্থাপন করেন।

উর্বশি

(১) উর্বশি– অপরূপ রূপলাবণ্যময়ি স্বর্গের অপ্সরা। এ অপ্সরার জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। কারো মতে উর্বশি নারায়ণের উরু ভেদ করে বহির্গর্ত হন, তাই তার নাম উর্বশি। আবার কথিত আছে, সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্র হতে উত্থিত অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশিও অন্যতমা। উর্বশি সাতজন মনুর সৃষ্টি– একথাও প্রচলিত আছে। ঋগ্‌বেদে উর্বশি ও পুরুরবার কাহিনি প্রচ্ছন্নভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনি পাওয়া যায় শতপথব্রহ্মণে। একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালে আহূত রাজা পুরুরবার সৌন্দযে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে উর্বশির নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়। ফলে ইন্দ্রের শাপে উর্বশিকে মর্ত্যে বাস করতে হয়। অভিশপ্তা উর্বশি মর্ত্যে এসে পুরুরবার স্ত্রী হতে চাইলেন, কিন্তু শর্ত হল– দিনে তিনবার পুরুরবা উর্বশিকে আলিঙ্গন করতে পারবে বটে, তবে উর্বশির ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরুবার তাঁর সঙ্গে শয়ন করতে পারবেন না। তাছাড়া পুরুরবাকে যেনো কোন দিন নগ্ন অবস্থায় দেখবার সুযোগ উর্বশির না হয়। এ প্রতিশ্রুতি দেবার পর পুরুরবা উর্বশিকে স্ত্রীরূপে পান। এরূপে তাঁরা বহু বর্ষ একসঙ্গে কাটান। বহু বর্ষ গত হবার পর গন্ধর্বরা স্বর্গে উর্বশির অভাব অনুভব করতে থাকে। কি উপায়ে উর্বশিকে ফিরিয়ে আনা যায়, সে বিষয়ে তারা চিন্তাকুল হয়ে পড়ে। অতঃপর একদিন তারা রাতে গোপনে এসে উর্বশির শয্যার সঙ্গে দুটি মেষশাবক বেঁধে রেখে যায়। তারপর গন্ধর্বরা দুটি মেষশাবকের মধ্যে একটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। উর্বশি নিদ্রিত রাজকে মেষশাবক উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন। নিজের শয্যায় পুরুরবা তখন নগ্ন অবস্থায় ছিলেন। উর্বশির অনুরোধে বিচলিত হয়ে তিনি

ত্রস্ত পদে চোর ধরতে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলে, গন্ধর্বরা এ সুযোগে বজ্রপাতের ব্যবস্থা করে তারই উজ্জ্বল আলোকে রাজপ্রসাদ আলোকিত করে দিল। এবং রাজার এ নগ্নাবস্থা দেখে উর্বশি তক্ষণাৎ শাপমুক্ত হয়ে অদৃশ্য হলেন।

উর্বশির শোকে ও দুঃখে জর্জরিত হয়ে পুরুরবা উর্বশিকে পুনরায় পাবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়লেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রের নিকটে চারজন হংসি দেহধারি অপ্সরির সঙ্গে স্নানরতা উর্বশিকে বার বার গৃহে ফিরে আসবার জন্য পুরুরবা অনুরোধ করলেন, কিন্তু পুরুরবার আকুল ক্রন্দনে উর্বশির মন বিচলিত হলো না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর উর্বশি এ শর্তে সম্মত হলেন যে, বৎসরের শেষ রাত্রে পুরুরবা এলে তাঁর সঙ্গে উর্বশি শয্যাগ্রহণ করবেন এবং তাতেই তাঁদের ছেলেসন্তান হবে। বৎসরান্তে পুরুরবা ফিরে এলে উর্বশি তাঁকে প্রথম ছেলে আয়ুকে দান করলেন। এভাবে তাঁদের বাৎসরিক মিলন চলতে লাগল। এর ফলে প্রতি বৎসরেই উর্বশি রাজাকে একটি একটি করে পাঁচটি সন্তান দান করলেন। কোন কোন মতে সন্তানের সংখ্যা সাতটি। একদিন উর্বশি পুরুরবাকে জনালেন যে গন্ধর্বরা একটি প্রজ্জ্বলিত পাত্র এনে পুরুরবাকে বললেন, "এ অগ্নি গ্রহণ করুন এবং বেদের বিধান অনুসারে একে তিন ভাগে বিভক্ত করুন, তবেই আপনার অভিষ্ট পূর্ণ হবে।" সে থেকে উর্বশি ও পুরুরবা অবিচ্ছিন্ন হয়ে গন্ধর্বলোকে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের ভালোবাসা চিরস্থায়ি হয়ে রইলো। এ অখ্যানটি শতপথব্রাহ্মাণে ও পুরাণে পাওয়া যায়।

(২) উর্বশি– বেদের মতে মিত্রাবরুণ আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে অপ্সরা উর্বশির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় ওঁদের রেতঃপাত হয়। রেতের যে ভাগ কুম্ভে পড়ে, সে ভাগ হতে বশিষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। এতে এ দু দেবতা রেগে গিয়ে উর্বশিকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে পৃথিবীতে নির্বাসিতা হতে হবে। এখানে এসে উর্বশি পুরুরবার স্ত্রী হন।

(৩) উর্বশি– দিব্যাস্ত্র ও নানা অস্ত্রশস্ত্র লাভ ও নৃত্য-গীতাদি দিব্যাস্ত্র ও নানা অস্ত্রশস্ত্র লাভ ও নৃত্য-গীতাদি বিদ্যাশিক্ষার জন্য যখন অর্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করেন, সে সময় ইন্দ্রের অনুজ্ঞায় উর্বশির অর্জুনের সঙ্গ কামনা করেন। উর্বশির গর্ভে ও পুরুরবার ঔরসে, আয়ু জন্মগ্রহণ করে। তাঁরই প্রপৌত্র পুরু। তাই উর্বশি পৌরবংশের মা। অর্জুন তাঁকে মার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করেন। উর্বশি বলেন, তাঁকে গুরুস্থানীয়া মনে করা অনুচিত। কারণ, অপ্সরারা কোন নিয়মাধীন নয়। তখন অর্জুন বলেন, উর্বশি মাতৃবৎ পূজনীয়া এবং তিনি পুত্রবৎ রক্ষণীয়। এরূপে অর্জুন দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হবার পর রেগে গিয়ে উর্বশি তাঁকে অভিশাপ দেন যে,

তিনি সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবেন। এ অভিশাপের ফলে বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন বৃহন্নলা নামে নর্তকের ছদ্মবেশ ধারণ করেন ও এ অভিশাপ তাঁর বরস্বরূপ হয়।

(৪) উর্বশি– মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রম-উর্বশি' নাটকে উল্লিখিত আছে যে, কেশি দৈত্য উর্বশিকে অপহরণ করলে পুরুরবা তাঁর কবল থেকে উর্বশিকে উদ্ধার করেন ও উভয়ে পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হন। স্বর্গে অভিনয়কালে ভুলক্রমে পুরুরবার নাম উল্লেখ করে ফেলায় শাপগ্রস্তা হয়ে উর্বশি মর্ত্যে পুরুরবার স্ত্রী হন। ছেলে-মুখ দর্শনের পর উর্বশির শাপমোচন হয়। পরে নারদের বরে উর্বশি ও পুরুরবার মিলন চিরস্থায়ি হয়।

(৫) উর্বশি– পদ্ম পরাণের বিবরণ এরূপ– পুরাকালে কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্মছেলে হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র তাঁর উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে তাতে বিঘ্ন জন্মাবার জন্য কয়েকজন অপ্সরার সঙ্গে বসন্ত ও কামদেবকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। এ অপ্সরারা বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ করতে অক্ষম হয়। তখন কামদেব অপ্সরাদের উরু থেকে উর্বশিকে সৃষ্টি করলেন। উর্বশি বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতে পারায় ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে ও তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে চাইলেন। উর্বশি তাতে সম্মত হলেন। কিন্তু পরে মিত্র ও বরুণ উর্বশিকে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় উর্বশি ওঁদের প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ওঁদের অভিশাপে উর্বশি মনুষ্যভোগ্যা হয়ে পুরুরবার স্ত্রী হন।

উমা

মহাদেবের স্ত্রী এবং হিমালয় ও মেনকার মেয়ে। তাঁর অপর নাম পার্বতী। পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন দক্ষের মেয়ে। দক্ষের মুখে স্বামিনিন্দা শুনে ক্ষোভে দেহ ত্যাগ করে হিমালয় রাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং কঠিন সাধনা করে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন।

উলূপি

ঐরাবত-কুলজাত কৌরব্য নাগের মেয়ে। যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অর্জুন বারো বৎসর বনবাসে থাকেন। বনবাসের সময় অর্জুন একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নামলে নাগরাজ-মেয়ে উলূপি কামাতুরা হয়ে এঁকে আকর্ষণ করে পাতালে নাগ-ভবনে নিয়ে যান ও অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদন করেন। উলূপি অর্জুনকে বলেনযে, অর্জুনের ব্রহ্মচর্যের নিয়ম কেবলমাত্র দ্রৌপদির জন্যে, অতএব উলূপির সঙ্গে মিলিত হলে তাঁর ধর্ম নষ্ট হবে না । সেখানে তাঁর বিয়ে হয়। উলূপির মনের কামনা সিদ্ধ হলে, তিনি অর্জুনকে বর দিলেন যে, তিনি জলে অজেয় হবেন এবং সমস্ত জলচর জীব তাঁর বশিভুত হবে। অর্জুনের ঔরসে উলূপির গর্ভে ইরাবান্

'শ্রুতি'। ঋগ্‌বেদে ১০,৫৮০ ঋক্ আছে; কিন্তু বর্তমানে ১৬৩ ঋক্ লোপ পেয়েছে। ঋগ্‌বেদ প্রথমত শাকল ঋষি কর্তৃক অধীত হয়েছিল; এরূপে বাস্কল, অশ্বলায়ন, শঙ্খায়ন ও মণ্ডুক নামক চারজন ঋষি ঋগ্‌বেদ পরে পরে অভ্যাস করলে এর পাঁচশাখার উদ্ভব হয়। যথা–শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খঅয়ন এবং মাণ্ডুক। অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ যতবারই নুতন ঋষির দ্বারা অভ্যস্ত ও চর্চিত হয়েছে, ততবারই এর বিভিন্ন নুতন শাখার উদ্ভব হয়েছে। এর কারণ, প্রতিবারই মূলের সঙ্গে প্রভেদও ঘটেছে অল্পবিস্তর। উপর্যুক্ত পাঁচ শাখা ব্যতীত, ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়ি কৌশিতকি, শৈশিরি, পৈঙ্গি প্রভৃতি বহুপ্রকার উপশাখা আছে। ঋগ্‌বেদে ব্রাহ্মণ নামে দু প্রধান বিভাগ আছে– ঐতরেয় ও কৌশিতকি বা শাঙ্খায়ন। ঐতরেয় আট পঞ্জিকায় এবং প্রতি পঞ্জিকা পাঁচ অধ্যায়ে, প্রতি অধ্যায় ন্যূনাদিক সাত কাণ্ডে (সর্বসমেত ২৮৫ কাণ্ড) বিভক্ত। ঋগ্‌বেদের অন্য অংশ ঐতরেয় আরণ্যক। ঐ অংশ আঠারো অধ্যায়ে ও পাঁচ আরণ্যকে বিভক্ত। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলি– ১. অগ্নি, ২. উন্দ্র, ৩. সূর্য, ৪. বরুণ, ৫. উষা, ৬. অশ্বিনিদ্বয়, ৭. পৃথিবী, ৮. মরুৎ, ৯. মরু, ১০. রুদ্র, ১১. যম ও ১২. সোম– প্রভৃতিদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। এ সকল স্তবস্তুতি ও মন্ত্রদ্বারা আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন।

ঋচিক

ভৃগু মুনির ছেলে। পাঠান্তরে, ঔর্ব ঋষির ছেলে বলেও কথিত। গাধির মেয়ে সত্যবতির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ স্ত্রীর গর্ভে ঋচিকের তিন ছেলে হয়– জমদগ্নি, শুনঃশেফ, শুনঃলেজ। (হরিবংশ)। ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করার জন্য অলৌকিক উপায়ে সমস্ত ধনুর্বেদ ঋচিক শিক্ষা করেন। নিজের বংশরক্ষা করার জন্য মহারাজ কুশিকের ছেলে গাধির-মেয়েকে ঋচিক বিয়ে করেন। গাধির কোন ছেলে না হওয়ায় এবং তাঁর স্ত্রী খুব দুঃখিত হওয়ায়, ঋচিক নিজের স্ত্রী ও শাশুড়ির ছেলে হবার জন্য ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র– দু প্রকার যজ্ঞের পায়স তৈরি করেন। গাধিরাজের স্ত্রী সুছেলে লাভের আশায় ব্রাহ্ম-পায়স খান এবং মেয়ে (ঋচিকের স্ত্রী) আহার করেন ক্ষাত্র-পায়স। অবশেষে ঋচিকের স্ত্রী পায়সের প্রভাব জ্ঞাত হয়ে, যাতে তাঁর ছেলে ক্ষত্রিয়ত্ব না পেয়ে পৌত্র পায়, তার জন্য স্বামির কাছে বর চান। এ পায়সের প্রভাবে ঋচিকের স্ত্রীর জমদগ্নি নামে এক ছেলে হয়, আর জমদগ্নির ঔরসে জন্মলাভ করেন পরশুরাম। পরশুরাম নিজের পিতামহর বরানুসারে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বি হয়ে সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত করেন। অপর দিকে গাধিরাজের স্ত্রী পায়সের প্রভাবে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার প্রসব করেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (মহাভারত– অনুশাসন)

ঋত্বিক

যজ্ঞকার্যে চারজন মুখ্য পুরোহিত নিযুক্ত হন ১. হোতা, ২. অধ্বর্যু, ৩. ব্রহ্মা ও ৪. উদগাতা। এদের প্রত্যেকের অধীনে তিনজন করে বারো জন ঋত্বিক নিযুক্ত থাকেন। এদের কেউ উচ্চৈঃস্বরে ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতার আবাহন বা প্রশংসাদি করতেন, কেউ যজ্ঞের সামগ্রি প্রস্তুত করতেন, কেউ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন, কেউ বা সামমন্ত্র গান করে দেবতার স্তুতি করতেন।

ঋষি

কবি ও মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি। পরমার্থ তত্ত্বে যিনি সম্যক দৃষ্টি রাখেন, ইনিই ঋষি। যিনি জ্ঞানমার্গে গমন করে সংসার অতিক্রম করেছেন, ইনিই ঋষি। পুরাণ মতে যা হতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি সম্যক রূপে নিরূপিত হয়– ইনিই ঋষি।

এরা ঈশ্বর অদিষ্ট; এঁদের কাছে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা সাত জন ঋষি, সপ্তর্ষি বা প্রজাপতি নামে খ্যাত। তাঁরা ব্রহ্মার মানসছেলে ও। শতপথব্রাহ্মণে এঁদের নাম এরূপ উল্লেখ আছে ১. গৌতম, ২. ভরদ্বাজ, ৩. বিশ্বামিত্র, ৪. জমদগ্নি, ৫. বশিষ্ঠ, ৬. কশ্যপ ও ৭. অত্রি। মহাভারতে এঁদের নাম ১. মরীচি, ২. অঙ্গিরা, ৩. পুলহ, ৪. ক্রতু, ৫. অত্রি, ৬. পুলস্ত্য ও ৭. বশিষ্ঠ। বায়ুপুরাণে ভৃগুর নাম যোগ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে আরো দুটি নাম যোগ করা হয়েছে ; ১. ভৃগু ও ২. দক্ষ। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে ১. গৌতম, ২. কণ্ব, ৩. বাল্মীকি, ৪. ব্যাস, ৫. মনু, ৬. বিভাণ্ডক প্রভৃতিকে ঋষি হিসাবে আখ্যাত করা হয়েছে। প্রথমোক্ত সপ্তর্ষি আকাশে সাতটি তারকারূপে অবস্থিত আছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় এ সপ্তর্ষিমণ্ডল Great Bear নামক নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত। ঋষি সাত প্রকার–শ্রুতর্ষি যেমন সুশ্রুত; কাণ্ডর্ষি যেমন জৈমিনি; পরমর্ষি যেমন পৈল, মহর্ষি যেমন ব্যাস; রাজর্ষি যেমন বিশ্বামিত্র ও পিতা; ব্রহ্মর্ষি যেমন বশিষ্ঠ; দেবর্ষি যেমন নারদ, অত্রি, মরিচি, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, ভরত, তুম্বুরু, কণাদাদি। প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম আছে। এ প্রসঙ্গে আরও বিশ প্রকার ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– বৈখানস, বালখিল্য, মরীচি, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট, আকাশনিলয়, অনবকাশিক, দন্তোলুখল, অশয্যা, পত্রাহার, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্র পট্টবাস, স্থণ্ডিলশায়ি, উর্ধ্ববাস, তপোনিষ্ঠ, পাঁচতপান্বিত, সযপ। মহাভারতেও বহু প্রকার ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা–ফলাহারি, মূলাহারি, ঘৃতপায়ি, সোমবায়ব্য প্রভৃতি।

ঋষ্যশৃঙ্গ

কশ্যপ-তনয় বিভাণ্ডক মুনির ছেলে ও দশরথের জামাতা। বিভাণ্ডকের ঔরসে দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম ভগের মেয়ে হরিণরূপিণি স্বর্ণমুখির গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম। একদিন বিভাণ্ডক মুনি দির্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে কোন হ্রদে স্নানরত ছিলেন। সে সময়ে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশিকে দেখে কামাবিষ্ট হন এবং জলমধ্যে রেতঃপাত করেন। এক তৃষিতা হরিণি সে রেতঃমিশ্রিত জলপান করাতে গর্ভিণি হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করে। এ হরিণি একজনশাপভ্রষ্টা দেবকন্যা হরিণির গর্ভজাত বলে এ মুনির মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিলো। তিনি কৌশিকী নদীর তীরে বাবার তপোবনে একেবারে নিঃসঙ্গভাবে প্রতিপালিত হন ও তপোবনে বাস করে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা ও বেদ অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন। তিনি ভোগসুখ ও নারী সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। রাজা দশরথের বন্ধু অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ একবার ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রতি অসৎ ব্যবহার করাতে ব্রাহ্মণরা তাঁকে ত্যাগ করেন ও ইন্দ্র তাঁর রাজ্যে জলবর্ষণে বিরত হন। ফলে প্রজাদের দুর্দশা উপস্থিত হয়। জনৈক মুনির পরামর্শে রাজা প্রায়শ্চিত্ত করে মুনিদের প্রসন্ন করেন ও ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়ন করে বৃষ্টিপাত ঘটাবার চেষ্টা করেন। মন্ত্রিদের পরামর্শে চিত্তোন্মাদক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বারাঙ্গনাদের এঁকে প্রলোভিত করার জন্য পাঠানো হয়। বাবা বিভাণ্ডকের অনুপস্তিতিকে বারাঙ্গনারা নানা উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত ও প্রলুব্ধ করে। পরে বারাঙ্গনাতের সঙ্গে তিনি অঙ্গদেশে প্রবেশ করা মাত্র রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় রাজা লোমপদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অর্ঘাদি দিয়ে যথারীতি সৎকার করেন ও পালিতমেয়ে শান্তার সঙ্গে বিয়ে দেন। এ মেয়ে দশরথের ঔরসজাত। এরপর ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশেই বাস করতে থাকেন। দশরথ ছেলেকামনায় যখন অশ্বমেধের যজ্ঞ করছিলেন, তখন মহর্ষি বলিষ্ঠ ও মন্ত্রি সুমন্ত্রের পরামর্শ অনুযায়ি ঋষ্যশৃঙ্গকে যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত পদে বরণ করেন এবং তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে দশরথের ছেলেকামনা সার্থক করেন।

ঋষভ

(১) ঋষভ হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের নিকট এক পর্বত বিশেষ। তৎকালের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এখানে বিশল্যকরণি, মৃতসঞ্জীবনি, সন্ধিনি, সুবর্ণকরণি ইত্যাদি ওষধি পাওয়া যেত।

(২) ঋষভ অগ্নিধ্রের ছেলে নাভির ঔরসে মেরুদেবির গর্ভে মহাত্মা ঋষভের জন্ম হয়। তিনি পরমহংস ব্রতের পথ প্রদর্শক। তাঁর এক শত ছেলে ছিলো। তাঁদের মধ্যে একাশি জন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন ও অবশিষ্ট ছেলে ভরত প্রমুখ নজন ভারতের নটি দ্বীপের অধীশ্বর হন।

একলব্য

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর ছেলে ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য। অদ্বিতীয়ধনুর্ধারি ও আদর্শ গুরুভক্ত একলব্য একবার দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে এলে নিচজাতি বলে দ্রোণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন দুঃখিত মনে একলব্য বনে গিয়ে দ্রোণের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করে এবং তাঁকেই গুরুরূপে কল্পনা করে যোগবরে দণুর্বিদ্যা শিক্ষালাভ করতে থাকেন। গুরুভক্তির প্রসাদে একলব্য ধনুর্বিদ্যার নিপুণতায় অর্জুন প্রমুখ দ্রোণের শিষ্যগণ অপেক্ষা অধিক অস্ত্রকুশলি হয়ে ওঠেন। একদিন কুরুপাণ্ডবগণ শিকারে গেলে, তাঁদের সারমেয় ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে এসে তাঁর কালোরঙ, মলিনবসন ও হরিণচর্মাব্রত জটাধারি রূপ দর্শনে চিৎকার করায় একলব্য একত্রে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করে সারমেয়রস্বর সংরোধ করেন। সে শরদ্বারা রুদ্ধমুখ কুকুরটি রাজকুমারদের কাছে গেলে, তাঁরা কুকুরের মুখে শর প্রয়োগের কৌশল দেখে বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে উপস্থিত হন ও তাঁকে দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে জানতে পেরে তাঁর কথা দ্রোণকে জানান। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বলেন, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে, আপনার অন্য কোন শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকেও অতিক্রম করেছে। এ কথা শ্রবণ করার পর দ্রোণ বললেন, তিনি নিষাদপুত্র একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দেন নি। পরে তিনি অর্জুনের সঙ্গে একলব্যের কাছে গমন করেন। একলব্য গুরু দ্রোণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ালেন। দ্রোণ বললেন, যথার্থই যদি তুমি আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হৃদয়ে জানালেন যে গুরুকে অদেয় তাঁর কিছুই নেই। তখন আচার্য দ্রোণ একলব্যের দক্ষিণ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যাচ্ঞা করেন। একলব্য প্রফুল্লমুখে অকাতরে উক্ত অঙ্গুলী ছেদন করে দ্রোণকে উপহার দেন। একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষাই এ প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিলো। অতঃপর একলব্য অন্য অঙ্গুলি দ্বারা শরবর্ষণ করে দেখান যে, তাঁর দক্ষতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। অর্জুন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এবং দ্রোণাচার্য আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অনার্য একলব্যের প্রতিভার বিনাশসাধন করেছিলেন।

ওঘবতি

তিনি নৃগরাজের পিতামহ ওঘবানের মেয়ে। এর সঙ্গে অগ্নিদেবের ঔরসে মাহিষ্মতী নগরির ইক্ষাকুবংশিয় রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভজাত ছেলে সুদর্শনের বিয়ে হয়। সুদর্শন স্ত্রীসহ কুরুক্ষেত্র বাস করতে থাকেন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমেই মৃত্যু জয় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি ওঘবতিকে বলেন যে, তিনি যেনো অতিথি

সৎকারে যত্ন নেন। এমন কি, প্রয়োজন হলে আত্মদান করতেও যেনো কুণ্ঠিত না হন। স্বামি গৃহে অনুপস্থিত থাকলেও যেনো অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়। কারণ, জগতে অতিথিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি। একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে ওঘবতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। ওঘবতি তাঁকে তাঁর প্রয়োজন সম্বন্ধে জানতে চাইলে, ব্রাহ্মণরূপি ধর্ম তাঁকেই প্রার্থনা করে বসেন। ওঘবতি তাঁকে অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে অসম্মত হলেন। তখন পতি-আজ্ঞা স্মরণ করে সলজ্জভাবে 'তাই হোক' বলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহাস্যে ওঘবতি অন্য গৃহে গমন করলেন। সুদর্শন ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে বারংবার তাঁকে ডাকতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের বাহুপাশে আবদ্ধ ওঘবতি নিজেকে উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে স্বামির আহ্বানে নিরুত্তর রইলেন। তখন ব্রাহ্মণ কুটিরের ভিতর থেকে বললেন, আমি অতিথি ব্রাহ্মণ, তোমার গৃহে এসেছিম তোমার স্ত্রী আমার প্রার্থনা পূরণ করছেন। এ অবস্থায় তোমার যা উচিত মনে হয়ম তুমি তাই করতে পার। অতিথি-সৎকার ব্রত পালনে বিমুখ হলে সুদর্শনকে বধ করার জন্য তাঁর পশ্চাতে লৌহমুদগরধারি মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছিল। অতিথির কথায় বিস্মিত সুদর্শন ঈর্ষা ও ক্রোধ ত্যাগ করে বললেন যে, আপনার অভীপ্সা পূর্ণ হোক, আমার প্রাণ, পত্নী ও সর্বস্ব আমি অতিথিকে দান করতে পারি। আমি সত্য বলছি এ সত্য দ্বারা দেবতারা আমাকে পালন অথবা দহন করুন। তখন ব্রাহ্মণবেশি ধর্ম কুটির থেকে বেরিয়ে এসে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি সুদর্শনকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। ছিদ্রানসন্ধিৎসু মৃত্যুকে সুদর্শন জয় করেছেন। ওঘবতি, সুদর্শন ও তাঁর নিজেকে নিজের ক্ষমাতায় রক্ষা করতে সমর্থা এবং তিনি যা বলবেন তাঁর অন্যথা হবে না। এ ব্রহ্মবাদিনী নিজ তপস্যার প্রভাবে অর্ধ-শরির দ্বারা ওঘবতি নদীরূপে লোকপাবন এবং অর্ধ-শরিরে সুদর্শনের অনুগমন করবেন। সুদর্শন তাঁর সঙ্গে সশরিরে শাশ্বত সনাতন লোক পাবেন। সুদর্শন মৃত্যুকে পরাভূত, বীর্যবলে পাঁচভূতকে অতিক্রম ও গার্হস্থ্য ধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র শ্বেতরঙ সহস্র ঘোড়াযোজিত রথে সুদর্শন ও ওঘবতিকে তুলে নিলেন।(মহাভারত)

ওম্

(বিষ্ণু) + উ (মহেশ্বর) + ম্ (ব্রহ্মা)। তা বেদের সনাতন বীজ। ঈশ্বরের প্রার্থনা, আশীর্বাদের বাক্য। তা এত পবিত্র যে, উচ্চারণের সময় কেউই যেনো না শুনতে পায়। কোন প্রার্থনার প্রারম্ভে, পূজা-অর্চনার প্রারম্ভে কিংবা কোন পুস্তকের প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঔর্ব

ভৃগুবংশিয় একজন ঋষি। পুরাকালে কৃতবীর্য নামে এক রাজা তাঁর ভৃগুবংশিয় পুরোহিতদের প্রচুর ধন দান করেন। মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর ক্ষত্রিয়দের অর্থাভাব হওয়ায় তাঁরা ভার্গবদের কাছে অর্থ-প্রার্থী হন। ভার্গবরা কেউ ভূগর্ভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহ্মণদের দান করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়দেরও দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদের গৃহ খনন করে ধন দেখতে পাওয়ায় সকলে রেগে গিয়ে ভার্গবদের বধ করলেন। ভার্গবনারীরা ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণি তাঁর উরুদেশের গর্ভ গোপন করলেন। ক্ষত্রিয়রা জানতে পেরে সে গর্ভ নষ্ট করতে এলেন। তখন সে ব্রাহ্মণির উরু ভেদ করে এক দীপ্তিমান ছেলে জন্মগ্রহণ করল। তাঁর তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন অনুগ্রহপ্রার্থী ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণি বললেন যে, তোমরা আমার উরুজাত ছেলে ঔর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়দের প্রার্থনায় ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। ঔর্বকে সর্বলোক বিনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগন তাঁকে ক্রোধ সংবরণ করতে বললেন। তাঁরা স্বর্গারোহণে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু আত্মহত্যায় স্বর্গলাভ সম্ভব নয় বিবেচনায়, স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয়দের হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানালেন। তখন পিতৃগণের অনুরোধে ঔর্ব সমুদ্রে তাঁর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করেন। সে ক্রোধ ঘোটকির মস্তকরূপে (বড়বা) অগ্নি উদ্‌গার করে সমুদ্রজল পান করে। (মহাভারত– আদি)

কচ

কচ বৃহস্পতির ছেলে। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য আহরণের জন্য যখন দেবাসুরের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন দেবতারা বৃহস্পতিকে ও অসুরেরা শুক্রাচার্যকে পৌরোহিতো বরণ করেন। দেবতাদের হাতে যুদ্ধে নিহত অসুরদের শুক্রাচার্য সঞ্জীবনি-বিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করতেন। এ বিদ্যা সম্যকভাবে অধিগত না থাকায় বৃহস্পতি মৃত দেব-সেনাদের জীবনদানে অক্ষম হলেন। দেবতারা তখন বৃহস্পতিছেলে কচকে শুক্রাচার্যের সমীপস্থ হয়ে, তাঁর প্রিয় মেয়ে দেবযানীকে সন্তুষ্ট করে এ মৃতসঞ্জীবনি-বিদ্যা অর্জন করতে বললেন। কচ সহস্র বৎসরের জন্য শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। গুরু ও গুরুকন্যার সেবারত কচ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেবযানী ক্রমে রূপবান কচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। সুদির্ঘ পাঁচশ বৎসর পরে, দানবরা কচের অভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে, গোচারণকালে তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে সারমেয়ের আহার্যে ব্যবহার করে। দেবযানির অনুনয়ে শুক্রাচার্য সঞ্জীবনীবিদ্যার প্রভাবে কচকে জীবিত

করেন; সারমেয়দের শরির ভেদ করে কচ ফিরে আসেন। এর পর দানবরা দ্বিতীয়বার কচকে হত্যা করে, এবং শুক্রাচার্য পুনর্বার তাঁকে জীবিত করেন। তৃতীয়বারে দানবরা কচকে ভস্ম করে সে ভস্মমিশ্রিত 'সুরা' শুক্রাচার্যকে জানান যে, কচকে পুনর্জীবিত করতে হলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য, কারণ তাঁর উদর বিদীর্ণ না হলে কচ পুনর্জীবিত হবে না। শুক্রাচার্যের এ উক্তির পর দেবযানি তাঁকে বললেন যে, তাঁদের উভয়ের মৃত্যুই তাঁর কাছে কষ্টদায়ক এবং তাঁদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তাঁরও মৃত্যু অনিবার্য। তখন শুক্রাচার্য কচকে সঞ্জীবনি-বিদ্যা দান করে বললেন যে, তুমি ছেলেরূপে আমার উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমাকে সঞ্জীবনিমন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করো। কচশুক্রের দেহ ভেদ করে নির্গত হয়ে নবলব্ধ সঞ্জীবনি-বিদ্যার প্রভাবে শুক্রাচার্যকে পুনর্জীবিত করেন। সহস্র বৎসর পর কচ স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জানালে দেবযানি তাঁকে প্রেম নিবেদন করে বিয়ে করতে চান। কচ বললেন যে, দেবযানি তাঁর গুরু-কন্যা, তাঁকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দেবযানি তথাপি কচকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করলেন। তখন কচ এ কথাই বললেন, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শুক্রাচার্যের সে দেহের মধ্যে আমিও বাস করেছি, ধর্মত তুমি আমার বোন, সে জন্য এ বিয়ে অসম্ভব। দেবযানী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন যে, কচের লব্ধ সঞ্জীবনিবিদ্যা ফলবতি হবে না। তাতে কচও দেবযানিকে অভিশাপ দিযে বললেন, তোমার অন্তরের কামনাও সিদ্ধ হবে না। কোন ব্রাহ্মণ ঋষিপুত্র তোমাকে বিয়ে করবেন না। তোমার অভিশাপে আমার পক্ষে এ বিদ্যা নিষ্ফল হলেও আমি যাকে এ বিদ্যা দান করবো, তার বিদ্যা ফলবতি হবে। এ বলে কচ দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

কর্কোটক

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে এক হাজার নাগ জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে কর্কোটক একটি প্রধান সর্প। একদা কর্কোটক দেবর্ষি নারদকে বঞ্চনা করে। এতে নারদ ক্রুদ্ধ হযে শাপ দেন যে, যে পর্যন্ত না রাজা নল এসে অন্যত্র নিয়ে যান, সে পর্যন্ত তাকে অরণ্যে বাস করতে হবে। তারপর সে শাপমুক্ত হবে। রাজা নল কলির কোপে পড়ে রাজত্ব হারান এবং নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে এ বনে এসে উপস্থিত হন। তখন এ বন অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। অগ্নির মধ্য হতে কর্কোটকের চিৎকার শুনতে পেয়ে নল তাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন। শাপমুক্ত হয়ে কর্কোটক নলের কাছে নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে নলকে দংশন করল। কর্কোটকের দংশনে নলের শরির একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। নল কর্কোটকের এ ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে

কর্কোটক বললো যে, আমি অকৃতজ্ঞ নই, দংশন করে আমি আপনার উপকারই করেছি। আপনার শরির বিবর্ণ হওয়াতে আপনার দেহস্থিত শত্রু কলি আপনাকে আর চিনতে পারবে না, বিশেষত আমার বিষের জ্বালায় আপনার শরিরস্থ কলি নির্জীব হয়ে থাকবে। কর্কোটক নলকে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে থাকতে অনুরোধ করে তাঁর কাছে অক্ষক্রীড়া শিখতে বললেন। কারণ, অক্ষক্রীড়া পারদর্শি হলে কলি দূরে পলায়ন করবে।

কর্দম

(১) কর্দম একজন প্রজাপতি। ব্রহ্মার ছেলে। তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর মেয়ে দেবহুতিকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে অতিখ্যাতিমান কপিলমুনি নামক ছেলে ও কলা, অরুন্ধতি প্রভৃতি নামক নটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতী নদীর তীরে তিনি দশ হাজার বৎসর শ্রীহরির তপস্যা করেন। তপস্যার ফলে হরে তাঁর কাছে আবির্ভূত হলে, তিনি হরিরর কাছে উপযুক্ত স্ত্রী প্রার্থনা করেন। হরি দেবহুতিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে বলেন। অতঃপর মনু তাঁর মেয়ে দেবহুতির সঙ্গে কর্দমের বিয়ে দেন। কর্দম দেবহুতিকে বিয়ে করে সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন। নটি মেয়ে জন্মাবার পর কর্দম সংসার ত্যাগ করে যোগাভ্যাসের জন্য অরণ্যাশ্রমে যাওয়া স্থির করেন। এতে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত হওয়াতে কর্তম বলেন যে, তিনি তাঁকে হরির মতো ছেলে দান করবেন। ফলে কপিলমুনির জন্ম হয়। কপিলের জন্মের পর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কর্দম সংসার ত্যাগ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

(২) কর্দম পুলকের ঔরসে ক্ষমার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে অঙ্গিবার মেয়ে সিনিবালিকে বিয়ে করেন। সিনিসবালি পরে সোম বা চাঁদকে দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামি কর্দমকে ত্যাগ করে চন্দ্রের ভজনা করেন। এ জন্য কর্দম অত্রিমেয়ে শ্রুতিকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে শঙ্খপাদ নামে এক ছেলে ও কাম্যা নামে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে প্রিয়ব্রত কাম্যাকে বিয়ে করেন (লিঙ্গপুরাণ, মার্কণ্ডয় পুরাণ ও হরিবংশ)

কদ্রু

কদ্রু একটি সর্পের নাম। তিনি দক্ষরাজের মেয়ে ও কশ্যপ ঋষির স্ত্রী। পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দু মেয়ে ছিল। তাঁরা দুজনেই মহর্ষি কশ্যপের ধর্মপত্নী। কশ্যপ তাঁদের বর দিতে চাইলে কদ্রু বলশালি সহস্র নাগছেলে ও বিনতা কদ্রুছেলে অপেক্ষা বলশালি ও তেজস্বি দু ছেলে পার্থনা করলেন। যথাকালে কশ্যপের বলে কদ্রু সহস্র ও বিনতা দুটি ডিম্ব প্রসব

করলেন। পাঁচশ বৎসর পরে কদ্রুর প্রত্যেক ডিম্ব হতে নাগছেলেরা নির্গত হল; কিন্তু বিনতার ডিম্ব থেকে কিছু না হওয়ায় তিনি একটি ডিম্ব অসময়ে ভেঙে দেখলেন যে, দেহের উর্ধভাগ সম্পূর্ণ ও নিম্নভাগ অসম্পূর্ণ এক সন্তান রয়েছে। সে সন্তান অস্পূর্ণ অঙ্গের জন্য বিনতাকে দায়ি করে বললো যে, এজন্য তোমাকে পাঁচ শত বৎসর কদ্রুর দাসি হয়ে থাকতে হবে। অন্য ডিম্বটি অসময়ে না ভাঙলে তার থেকে নির্গত সন্তান তোমার দাসিত্ব মোচন করবে–এ বলে সে সন্তান আকাশে উঠে অরুণ-রূপে সূর্যের সারথি হল। একদিনি উচ্চৈঃশ্রবার রঙ নিয়ে কদ্রু ও বিনতার মধ্যে তর্ক হয়। বিনতা বললেন, অশ্বের লেজ শ্বেত; কদ্রু বললেন, অশ্বের লেজ কালো। স্থির হল, পরদিন তাঁরা ঘোড়াটিকে ভালো করে দেখবেন এবং যার কথা মিথ্যা হবে, তিনি সপত্নীর দাসি হবেন। কদ্রু তাঁর সর্প ছেলেদের ডেকে উচ্চৈঃশ্রবার লেজলগ্ন হতে বললেন, যাতে অশ্বের লেজলোম কালোরঙ দেখা যায়। যেসকল সর্প মার কথায় অসম্মত হয়েছিল, কদ্রু তাঁদের জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হবার অভিশাপ দেন। পরদিন দূর হতে উভয়ে ঘোড়া দেখতে গেলেন। অশ্বের লেজ কালোরঙ দেখে বিনতা কদ্রুর দাসিত্ব গ্রহণ করলেন। এ সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ডিম্ব হতে গরুড়ের জন্ম হলো। কদ্রুর আদেশে গরুড় সর্পদের পিঠে বহন করতে বাধ্য হলে একদিন মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, কপট উপায়ে বিনতা কদ্রুর দাসি হতে বাধ্য হয়েছেন। তখন গরুড় সর্পদের কাছে মার মুক্তির উপায় জানতে চাইলে তারা বললো যে, যদি নিজের শক্তিবলে সে অমৃত আনতে পারে, তবে তার মা মুক্তি পাবে। গরুড় অমৃত আনয়নের জন্য যাত্রা করলেন। মার পরামর্শ অনুযায়ি পথের ভক্ষণ করলেন। তাতেও তৃপ্ত না হয়ে বাবা কশ্যপের পরামর্শ মতো গজ-কচ্ছপরূপি বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে আত্মকলহরত দু ভাইকে ভক্ষণ করে দেবলোকে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেবতাগণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে জয়ি হয়ে অমৃত অপহরণ করলেন। গরুড় নিজে অমৃত পানের লোভ সংবরণ করায়, বিষ্ণুর বরে তিনি অজর ও অমর এবং বিষ্ণুর রথধ্বজে অধিষ্ঠান করেন। ইন্দ্র গরুড়ের সঙ্গে সখ্যাস্থাপন করে অমৃত প্রার্থনা করেন। গরুড় বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি অমৃত নিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে তিনি অমৃত স্থাপন করবেন, ইন্দ্র সেখানে থেকে অমৃত অপহরণ করতে পারেন। ইন্দ্র বর দিতে চাইলে গরুড় এ বর প্রার্থনা করলেন যে, সর্পগণ যেনো তাঁর ভক্ষ্য হয়। তারপর সর্পদের কাছে এসে গরুড় জানালেন, তিনি অমৃত এনে কুশের উপর স্থাপন করছেন; সর্পগণ যেনো স্নানান্তে অমৃত ভক্ষণ করে এবং এখন থেকে যেনো তাদের কথা মতো তাঁর মার মুক্তি হয়। সর্পদের স্নানকালে ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করলেন। সর্পগণ অমৃত না পেয়ে কুশ লেহন করতে লাগলো। এর ফলে তাদের জিহ্বা দ্বিধা বিভক্ত হলো, আর বিনতার দাসিত্বও মোচন হলো। (শ্রীমদ্‌ভাগবত, মৎস্যপুরাণ)

কর্ণ

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। কুন্তির কুমারি অবস্থায় সূর্যের যৌন সংসর্গ দ্বারা কর্ণের জন্ম। কুমারি অবস্থায় জন্ম বলে কুন্তি কলঙ্কের ভয়ে একটি পাত্রের মধ্যে ছেলেকে রেখে ভাসিয়ে দেন। সূত বংশিয় অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা সে শিশুকে উদ্ধার করে পালন করেন। পরে পাণ্ডুর সাথে কুন্তির বিয়ে হয়। তাই কর্ণ পাণ্ডবদের ভাই। কর্ণের আদি নাম বসুষেণ। পরে তিনি নিজের অঙ্গ কেটে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করায় কর্ণ নামে খ্যাত হন। দুর্যোধণের একজন প্রধান পরামর্শ দাতা ছিলেন কর্ণ। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে কর্ণের ভূমিকা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যের পরামর্শে অর্জুনবধের জন্য ইন্দ্রেয় কাছ থেকে তিনি একাঘ্নি শক্তি প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র তাঁকে সে শক্তি দিয়ে বলেন যে, এ শক্তি অত্যন্ত বিপদকালে মাত্র একজনকে হত্যা করে পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে আসবে। কর্ণের এ শক্তি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে ঘটোৎকচ বধেই লোপ পায়। রাজ্যলোভেও তিনি কৌরব পক্ষ ত্যাগ করেন নি। এক দিকে তিনি যেমন ছিলেন ধর্মশীল, প্রতিশ্রুতি পালক; মহৎ ও দাতা, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন আত্মম্ভরি, ক্রুদ্ধ স্বভাব, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও পাপমতি।

কন্দর্প

কামদেবের অন্য নাম। তিনি প্রেম ও কামের দেবতা। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে নানা মত আছে– (১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে তিনি ধর্মের ছেলে। (২) হরিবংশ অনুসারে তিনি লক্ষ্মীর ছেলে। (৩) অন্য মতে তিনি ব্রহ্মার মানসছেলে। (৪) তিনি জল হতে উৎপন্ন ব'লে তাঁর নাম ইবজা। (৫) তিনি আত্মভূ, সে জন্য এঁকে অজ বলা হয়। পুরাণের মতে তাঁর স্ত্রীর নাম রতি। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে, মহাদেব গভীর তপস্যায় মগ্ন হন। অপর দিকে হিমালয়-গৃহে সতী পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যায় রত হন। দেবতাদের অনুরোধে কন্দর্প মহাদেবের মনে কামের ভাব উদ্রেকের জন্য বাণ নিক্ষেপ করে তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। এতে মহাদেব রেগে গিয়ে তাঁর তৃতীয় নেত্রের অগ্নিবর্ষণে কন্দর্পকে ভস্ম করেন। পরে দেবতার প্রার্থনায় মহাদেব বর দেন যে, কন্দর্প অশরিরী হয়েও পূর্বের মতো মানবদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। মতান্তরে লিখিত আছে, স্বামি-বিয়োগের পর স্ত্রী রতি মহাদেবের শরণপন্ন হলে, তিনি বর দেন যে, বিষ্ণু কালোরূপে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর ঔরসে কন্দর্পের পুনর্জন্ম হবে। সে কারণ, কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণির গর্ভে তিনি আবার জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রদ্যুম্ন নামে পরিচিত হন। স্বর্গের অপ্সরাদের

তিনি অধিপতি। তাঁর হাতে পুষ্পের তীরধনু থাকে। মানবের অন্তঃকরণে কামভাবের উদ্রেক করাই কন্দর্পের কাজ। এ জন্য তাঁর নাম মনোজ ও ভবজ। মহাদেব এঁকে ভস্ম করাতে তাঁর নাম হয় অনঙ্গ। সুন্দর রূপের জন্য তিনি অভিরূপ। ব্রহ্মাকে সন্দীপিত করেছিলেন বলে কন্দর্প। কন্দর্পের অস্ত্র তীরধনুকের নাম কুসুমায়ুধ। পুষ্পশোভিত ধনু বলে এর নাম পুষ্পবাণ বা পুষ্পশর। তাঁর পুষ্পরচিত পাঁচশরের নাম– সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। তিনি ত্রিলোকের মন মন্থন করেন বলে তাঁর নাম মন্মথ।

কণ্ব

তিনি একজন প্রাচীন ঋষি। পুরুবংশিয় অপ্রতিরথের ছেলে এবং কণ্ডু বা মেথাতিথির বাবা। তিনি কণ্ব গোত্রিয়গণের আদি পুরুষ, শুক্ল যজুর্বেদের স্মৃতিকার এবং শুক্ল যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা প্রণয়ন করেন। মালিনী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে ছিল। তিনি অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত পরিত্যক্তা মেয়ের পালকবাবা। বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকার বসন বায়ু দ্বারা অপহরণ করলে, তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ফলে, মেনকার একটি মেয়ে হয়। সদ্যোজাত মেয়েকে নদীতীরে নিক্ষেপ করে মেনকা ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। জনহীন স্থানে শকুন্তপক্ষী সে সদ্যোজাত মেয়েকে রক্ষা করতে থাকে। মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে গিয়ে, সে মেয়েকে দেখে, নিজের মেয়ের মতো লালন-পালন করতে থাকেন ও জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পাদন করেন। শকুন্তপক্ষী দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল বলে মুনি এ মেয়ের নাম রাখেন শকুন্তলা।

কবন্ধ

এক মহাকায় দণ্ডকারণ্যবাসি রাক্ষস। সে শ্রী নামক দানবের ছেলে; এবং তার নাম দনু। এ রাক্ষসের বর্ণনায় আছে যে, সে মুণ্ডগ্রীবাহীন কবন্ধ, তার উদরে মুখ এবং তাতে একটিমাত্র জ্বলন্ত চোখ অগ্নিশিখার মতো বর্তমান। তার যোজন প্রমাণ দির্ঘ হাতের সাহায্যে সে সর্বদা বিবিধ পশুপক্ষী হত্যা করে ভক্ষণ করে এবং রাক্ষসরূপে বনবাসি ঋষিদের ভীতি প্রদর্শন করে। একদিন স্থূলশিরা ঋষির সংগৃহীত ফলমূল অপহরণ করায় উক্ত ঋষির অভিশাপে সে এ কদাকার রূপে পরিণত হয়। এ রাক্ষস নাকি পূর্বে রূপবান ছিল। শাপ মোচনের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে, ঋষি একদিন তাকে বরেন যে, রামচন্দ্র যেদিন তার বাহু ছেদন করে বিজন বনে তাকে দগ্ধ করবেন, সেদিন সে পূর্বরূপে রূপান্তরিত হবে। সে তখন কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে দির্ঘায়ু হবার বরলাভে গর্বিত হয়ে

ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তার দু উরু ও মস্তক শরিরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন তার অনুনয়ে, জীবনধারণের উপায়স্বরূপ ইন্দ্র তার যোজন প্রমাণ দু বাহু এবং উদরে তীক্ষ্ণ দন্ত ও মুখ স্থাপন করেন এবং বলেন যে, রামলক্ষ্মণ তার বাহু ছেদন করলে তবে তার স্বর্গলাভ হবে। সীতার অন্বেষণকালে মতঙ্গাশ্রমের কাছে এক নিবিড় বনের মধ্যে কবন্ধ- দ্বারা রামলক্ষ্মণ আক্রান্ত হলে, তাঁরা খড়্গাঘাতে তার একমাত্র বল দু বাহু ছেদন করেন। ভূপতিত কবন্ধ তাঁদের পরিচয় পেয়ে তার শরির অগ্নিতে সৎকার করতে অনুরোধ করে। রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক অগ্নি-সৎকারের পর কবন্ধ তার পূর্বরূপ ফিরে পায় ও রাম-লক্ষ্মণকে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পরামর্শ দেয় ও সে স্থানে যাওয়ার উত্তম পথনির্দেশ দিয়ে হংসসংযোজিত রথে দিব্যবসনভূষণে শোভিত হয়ে পুণ্যলোকে প্রস্থান করে।

কমলা

(১) কমলা সমুদ্রন্থনে অপ্সরাদের উদ্ভব হবার পর চতুর্দিক আলোকিত করে বিদ্যুৎমালার মতো দেবি কমলা সমুদ্রগর্ভ হতে উত্থিত হন। ইন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে উৎকৃষ্ট আসনে বসান। পৃথিবী তাঁকে অভিসেকোপযোগি সর্বপ্রকার ওষধি দান করেন। অতঃপর ঋষিরা এঁকে অভিষেক করেন এবং দেবি কমলা গন্ধর্ব, সিদ্ধ, অসুর, যজ্ঞ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে নিজের অনুরূপ আশ্রয় না পেয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মুকুন্দকেই বরণ করেন। (শ্রীমৎভাগবত)

(২) কমলা দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

(৩)কমলা প্রহলাদের মা। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী। তাঁর অপর নাম কয়াধু।

কল্পতরু

কল্পান্তস্থায়ি তরু। সমুদ্রমন্থন হতে উত্থিত এ বৃক্ষ কল্পান্ত হলে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এ জন্য এর নাম কল্পতরু। অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ। কল্পতরুর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করলেই তাতে অভীষ্ট লাভ হয়।

কলাবতি

রাধিকার মা। তিনি কান্যকুব্জ দেশের রাজকন্যা। কথিত আছে যে, যজ্ঞকুণ্ড হতে উনি উৎপন্ন হন। এর সঙ্গে বৃষভানুরাজের বিয়ে হয়। রাধিকা তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কবিরাজ পণ্ডিত

তাঁর প্রকৃত নাম কি তা জানা যায়নি। তার প্রণীত রাঘপপাণ্ডবি গ্রন্থে প্রচলিত আছে। ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকা ভাগে গ্রন্থকর্তার নাম কবিরাজ পণ্ডিত বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু তা উপাধি কি নাম তা স্থির করা যাচ্ছে না। গ্রন্থকার জয়ন্তিপুরের অধিপতি কামদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অপর পরিচয় অজ্ঞাত রাঘবপাণ্ডবির মহাকাব্য আদ্যোপান্ত দ্ব্যার্থ শ্লোকে পরিপূর্ণ। এক অর্থে রামের চরিত্র এবং অপর অর্থে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচপাণ্ডবের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্য ত্রয়োদশ স্বর্গে বিভক্ত। কালিদাস প্রভৃতির রঘুবংশাদি অপেক্ষা এ মহাকাব্য কবিত্ব বিষয়ে অনেক অংশে ন্যূন।

কলি

যুগ প্রবর্তক দেবতা। তাঁর নামানুসারে বর্তমান যুগের নাম কলিযুগ হয়েছে। ৪,৩২,০০০ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবী এ দেবতার অধিকারে থাকবে। এ যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কলিরূপে আবির্ভূত হবেন। ক্রোধ নিজ বোন হিংসাকে বিয়ে করেন। তাঁদের কলি নামে এক ছেলে হয়। তিনি অতি কালোরঙ, তৈলাভিষিক্ত, বিকট দর্শন, লোলজিহ্বা, পূতিগন্ধাশয় পূর্ণ। কলি নিজের ভগ্নি দিরুক্তিকে বিয়ে করে ভয় নামে এক ছেলে এবং মৃত্যু নামে এক মেয়ের জন্ম দেন। কলির অত্যাচারে নিষদরাজ নল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দময়ন্তীসহ অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। কলির রাজত্ব বর্তমানে চলমান।

কল্মাষপাদ

ইক্ষাকুবংশিয় রাজা। সুদাস রাজার ছেলের বরে তাঁর অপর নাম সৌদাস। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে এ হরিণাসক্ত রাজা একদিন শিকার থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বশিষ্ট মুনির ছেলে শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও তিনি শক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে বলেন। বশিষ্ঠ-ছেলে রাজাকে পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে বলেন যে, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেয়াই রাজাদের সনাতন ধর্ম। এ কথা শুনে রাজা তাঁকে কষাঘাত করেন। তখন শক্তি রেগে গিয়ে রাজাকে নরমাংসভোজি রাক্ষস হবার অভিসম্পাত দেন। রাজা রাক্ষসে পরিণত হয়ে বনে গমন করেন এবং একদিন শক্তিকে দেখা মাত্রই বধ করে ভক্ষণ করেন। পরিশেষে বশিষ্ঠের শত পুত্রের সকলকেই তিনি ভক্ষণ করে ফেলেন। একদিন পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে তাঁকেও আহার করতে গেলে, বশিষ্ঠ কল্মাষপাদের গাত্রে মনস্ত্রপূত জলসিঞ্চন করে তাঁকে শাপমুক্ত করেন এবং ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন

করতে বলেন এবং সে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের অপমান করতেও নিষেধ করেন। কল্মাষপাদ তখন পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য বশিষ্ঠের নিকট একটি ছেলে সন্তান কামনা করেন। অতঃপর রাজা অযোধ্যাপুরিতে ফিরে আসেন। বশিষ্ঠের সঙ্গে সংগমের ফলে রাজমহিষি গর্ভবতি হন। কিন্তু বারো বৎসরেও যখন সন্তান ভুমিষ্ঠ হয় না, তখন মহিষি পাষাণখণ্ড দ্বারা নিজের উদর বিদীর্ণ করে এক ছেলে প্রসব করেন। এ পুত্রের নাম অশ্মক। বিষ্ণুপুরাণে এরূপ কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। যথা–রাজা সৌদাস শিকার করতে গিয়ে এক রাক্ষস বধ করেন। উক্ত রাক্ষসের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাক্ষসের ভাই নিজরূপ পরিবর্তনপূর্বক রাজা সৌদাসের পাচক হয়। একদিন বশিষ্ঠ রাজার প্রাসাদে অতিথি হলে, পাচকরূপি রাক্ষস মুনিকে নরমাংস রন্ধন করে আহার করতে দেয়। দিব্যজ্ঞানে তা জ্ঞাত হয়ে, বশিষ্ঠ রাজাকে রাক্ষস হবার অভিসম্পাত প্রদান করেন। বিনাদোষে এরূপে অভিশপ্ত হওয়ায় রাজাও বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত দেববার জন্য জলগ্রহণ করেন, কিন্তু রাণি মদয়ন্তি এসে রাজাকে এ অভিসম্পাত দানে নিষেধ করেন। তখন রাজা মন্ত্রপূত জল নিজের পায়ের ওপর নিক্ষেপ করেন। এ জলের স্পর্শে তাঁর পদদ্বয় কল্মষ (মলিন বা কালোরঙ) হয়ে যায়। সে থেকে তাঁর নাম হয় কল্মাষপাদ। বশিষ্ঠ পরে নিজের ভ্রম উপলব্ধি করে, তাঁর অভিসাপ বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী করেন। রাজা রাক্ষসভাবাপন্ন হয়ে প্রতিদিন বনে মনুষ্য ভক্ষণ ক'রে দিনাতিপাত করতে থাকেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ যখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ভক্ষণ করে ফেলেন। এ কারণে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী রাক্ষসরূপি রাজাকে শাপ দেন যে, যখনই সে স্ত্রীর সঙ্গে রতি কর্মে রত হবে, তখনই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি। বারো বৎসর পরে বশিষ্ঠের শাপ হতে মুক্ত হয়ে তিনি তার স্ত্রী মদয়ন্তির কাছে ফিরে যান বটে, কিন্তু পূর্ব-অভিশাপ স্মরণ করে স্ত্রীসহবাসে বিরত থাকেন। কিছুকাল পরে বশিষ্ঠ রাজা সৌদাসের অনুমতিক্রমে রাণির গর্ভসঞ্চার করেন। তিনি সাত বৎসর গর্ভধারণ করে থাকেন। যথাসময়ে সন্তান প্রসব না হওয়ায়, বশিষ্ঠ এক অশ্ম (পাথর) দিয়ে গর্ভে আঘাত করার ফলে এক পুত্রের জন্ম হয়। এ জন্যই এ পুত্রের নাম হয় অশ্মক।

কশ্যপ

তিনি খ্যাতিমান প্রজাপতি ঋষি। দেবীদত্য প্রভৃতির পিতা। শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা মতে তিনি হিরণ্যরঙ ব্রহ্মা হতে জন্মলাভ করেন। লিঙ্গপুরাণ মতে ব্রহ্মার মানসছেলে। অন্যান্য পুরাণ অনুসারে তিনি মরীচির তপোবলে সমুৎপন্ন ও ব্রহ্মার মানস ছেলে। শ্রীমদ্ভাগবত মতে তাঁর জন্ম মরীচির ঔরসে ও স্ত্রী কলার গর্ভে। তিনি দক্ষ প্রজাপতির তেরোটি মেয়েকে বিয়ে করেন। এ

মেয়েরাই সমস্ত লোকের মা; কারণ তাঁরাই এ জগৎ প্রসব করেছিলেন। জগৎপ্রসবিনী এ ত্রয়োদশ মেয়ের নাম– ১. অদিতি, ২. দিতি, ৩. দনু, ৪. কাষ্ঠা, ৫. অরিষ্ঠা, ৬. সুরসা, ৭. ইলা, ৮. মুনি, ৯. ক্রোধবশা, ১০. তাম্রা, ১১. সুরভি, ১২. সরমা ও ১৩. তিমি। এ ত্রয়োদশ দক্ষমেয়ে হতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তেরটি জাতির উদ্ভব হয়। ১. অদিতি হতে দেবগণ, ২. দিতি হতে দৈত্যগণ, ৩. দনু হতে দানবগণ, ৪. কাষ্ঠা হতে ঘোড়াাদি পশুগণ, ৫. অরিষ্ঠা হতে গন্ধর্বগণ, ৬. সুরসা হতে রাক্ষসকুল, ৭. ইলা হতে বৃক্ষ-উদ্ভিদসমূহ, ৮. মুন হতে অপ্সরাগণ, ৯. ক্রোধবশা হতে পিশাচকুল, ১০. তাম্রা হতে পক্ষীসমূহ, ১১. সুরভি হতে গো-মহিষাদি চতুষ্টদ জন্তু, ১২. সরমা হতে শ্বাপদসমূহ এবং ১৩. তিমি হতে জলজন্তু উদ্ভূত হয়। অবশ্য বিভিন্ন পুরাণে এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

রামায়ণ মতে তিনি ব্রহ্মাপুত্র মরীচির তনয়। এর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বামনরূপে এর ছেলেত্ব স্বীকার করেন। তিনি প্রজাপতি দক্ষের ৮টি মেয়ের পাণিগ্রহণ করেন। এদের নাম : ১. অদিতি, ২. দিতি, ৩. দনু, ৪. কালকা, ৫. তাম্রা, ৬. ক্রোধবশা, ৭. মনু ও ৮. অলকা। বিবাহের পর কশ্যপ স্ত্রীদের বলেন, এখন তোমরা আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি ছেলে প্রসব কর। অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা এতে সম্মত হলে তাঁরা যথাক্রমে কশ্যপকে কয়টি ছেলে দান করেন– আটবসু, বারো আদিত্য, এগারো রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার; ৩৩টি দেবতা; দৈত্য সকল; অশ্বগ্রীব; নরক ও কালক। যে চারপন স্ত্রী ছেলে প্রসবে সম্মত হলো না, তাঁরা এ সকল প্রাণির মা– ক্রোধি, ভাষা, পুতনা, ধৃতরাষ্ট্র, সুকি, মৃগি, হরিণমন্দা, হরি, ভদ্রমদা, মাতঙ্গি, শার্দ্দুলি, শ্বেতা, সরভি, সুরসা, কক্র, মনুষ্য, পবিত্র ফল সকল। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে নাগদের জন্ম হয়।

কংস

ভোজবংশিয় রাজা। তিনি মথুরার রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজছেলে ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মা। হরিবংশে কংসের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে– এক সময়ে উগ্রসেনের ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে দেখে সৌভপতি দ্রুমিল অত্যন্ত কামাতুর হয়ে পড়েন এবং স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে উগ্রসেনের মূর্তি ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করেন। কিন্তু পরে স্ত্রীর সন্দেহ হওয়ায় 'কস্য ত্বং' বলে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রকৃত পরিচয় পেয়ে দ্রুমিলকে তিনি তীব্র তিরস্কার করলে দ্রুমিল উত্তরে বলেন যে অনেক মানব-স্ত্রী ব্যাভিচার করেই দেব সদৃশ ছেলে উৎপাদন করেছেন, অতএব এতে কোন দোষ হতে পারে না। এরপর দ্রুমিল আরও বলেন যে, তুমি আমাকে 'কস্য ত্বং' বলে প্রশ্ন করেছিলে, সে কারণ তোমার 'কংস' নামে এক শ্রক্রবিজয়ী ছেলে হবে। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের দু

মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিয়ে করেন। জরাসন্ধের সহায়তায় উগ্রসেনকে সিংহানচ্যুত করে তিনি নিজে রাজা হন। এ সময় তাঁর বোন দেবকির সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে হয়। বিবাহে উপস্থিত থাকাকালে তিনি দৈববাণি শুনতে পান যে, দেবকির অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে বধ করবে। কংস এ দৈববাণি শুনে বসুদেব ও দেবকিকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। কারাগারে এঁদের পর পর যে সাতটি সন্তান হয়, তাদের সকলকেই কংস হত্যা করেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমি তিথিতে মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ নামে অষ্টম পুত্রের জন্ম হয়। বংশ লোপের ভীতিতে বসুদেব তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে গোকুলে গোপরাজ নন্দের ঘরে রেখে আসেন। সে রাত্রেই নন্দের স্ত্রী যশোধার গর্ভে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে; সে মেয়েই স্বয়ং যোগমায়া। যোগমায়ার মায়াতে সে রাত্রে গোকুলের সকলেই অচেতন অবস্থায় ছিল। সেজন্য পরিবর্তনে কোন বাঁধা বা অসুবিধা ছিল না। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার ঘরে রেখে, তাঁর সদ্যোজাত মেয়েকে নিয়ে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করেন। কংস তখন প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করে এ মেয়েকে হত্যা করতে আদেশ দেন, কিন্তু এ মেয়ে নিক্ষিপ্ত অবস্থা হতে আকাশে উত্থিত হবার সময় ভবিষ্যদ্‌বাণি করে যান যে, কংসের হত্যাকারি গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর বসুদেব ও দেবকি কারামুক্ত হন। কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করে হত্যা করার জন্য কংস চতুর্দিকে চর পাঠান, কিন্তু সকল চরই কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়। এরপর কংস ধনু-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কৌশলে কৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন। এ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে কংসের মল্লযোদ্ধারা কৃষ্ণ দ্বারা নিহত হয়। এতে কংস অত্যন্ত রেগে গিয়ে দু ভাই কৃষ্ণ ও বলরামকে নির্বাসিত করার আদেশ দেন। এতদ্‌ব্যতীত নন্দকে বন্দি এবং উগ্রসেন ও বসুদেবকে হত্যা করার আদেশও দেন। এ আদেশে শ্রবণমাত্র কৃষ্ণ কংসকে আক্রমণ করেন এবং সিংহাসন হতে নিক্ষেপ করে নিহত করেন। কংসের আট ভাই বাঁধা দিতে এলে বলরাম দ্বারা নিহত হন। (শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ)

কংসবতি

তিনি কংসের ভহিনী ও উগ্রসেনের মেয়ে। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভাইর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

কপিল

খ্যাতিমান ঋষি। তিনি সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা। কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তিনি পাঁচবিংশতি তত্ত্বাত্মক সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা এবং

সাংখ্যদর্শনে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন। এ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবের কথা স্পষ্ট ভাবে সাংখ্যদর্শনে লেখা আছে। তাঁর মতে জগৎ সত্তা অস্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি অনাদি, প্রকৃতির ন্যায় পুরুষও (আত্মা) অনাদি। আত্মা সৃষ্টি করে না, সে দ্রষ্টা মাত্র। মানুষের কর্ম অনুসারে আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন কর্মক্ষয় হয়, তখন আত্মা আর দেহান্তরে প্রবেশ করে না। এ দর্শনের মতে বস্তু মাত্রই সৎ। সৎ হতেই যে সৎ-এর উৎপত্তি, তাই এ দর্শনে প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি মাকে সাংখ্যতত্ত্ব, পুরুষ প্রকৃতির প্রভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, কলা, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। একাগ্রাচত্তে তপস্যার জন্য কপিল পৃথিবীর নিম্নভাগ পাতালে আশ্রম স্থাপন করেন। একবার সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, ইন্দ্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করে পাতালে তপোনিমগ্ন কপিলের আশ্রমে রেখে যান সগরের ষাট হাজার সন্তান যজ্ঞাশ্ব খোঁজে পাতালে এসে মুনির নিকট ঘোড়াকে দেখে; তাঁকেই ঘোড়া অপহরণকারি মনে করে আক্রমণ করে। মুনি রেগে গিয়ে তাঁর ষাট সহস্র সন্তানকে ভস্ম করেন। অতঃপর সগর রাজার পৌত্র অংশুমান পাতালে গমন করত মুনিকে সন্তুষ্ট করে অশ আনয়ন করেন। সে সময়ে কপিল অংশুমানকে বলেন যে, জাহ্নবির জলস্পর্শে সগর-সন্তানেরা উদ্ধার হবে। পরে সগরবংশের ভগীরথ স্বর্গ হতে গঙ্গাকে আনয়ন করে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেন।

কপিলা

দক্ষ প্রজাপতির ষাট জন মেয়ের অন্যতমা। মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি মেয়ে ও অতিবাহু, হাহা, হুহু, গো ও গন্ধর্ব প্রভৃতি বহুজনের মা।

কমলযোনি

অতীতকালের শেষে ত্রিজগত তমোময় ও বিরাট সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে দেবতা, ঋষি স্থাবর, জঙ্গম, কিছুই ছিলো না। একমাত্র নারায়ণ শেষ শয়নে নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ ও সহস্র বাহু ছিল। এ অবস্থায় কিছুকাল অবস্থান করার পর, তাঁর নাভি হতে শত যোজন বিস্তীর্ণ এক পদ্ম উৎপন্ন হয় এবং এ কমল-মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। এজন্য ব্রহ্মার অপর নাম কমলযোনি।

ককুৎস্থ

সূর্যবংশিয় নরপতি। ভাগবতের মতে তিনি শশাদ রাজ্যের ছেলে এবং ইক্ষাকুর নাতি, তাঁর অপর নাম পুরঞ্জয়। একদিন অসুরদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হলে বিষ্ণুর আদেশে পুরঞ্জয় অসুরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সে যুদ্ধে বৃষরূপি ইন্দ্রের ককুদ্ অর্থাৎ স্কন্ধশিখায়দণ্ডায়মান হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন বলে ককুৎস্থ নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

কার্তিকেয়

মহাদেব ও পার্বতীর ছেলে। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দানবরা সর্বদা জয়ি হয় দেখে, ইন্দ্র একজন উপযুক্ত সেনাপতির অনুসন্ধান করতে থাকেন। একদিন মানস পর্বতে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে ইন্দ্র দেখেন যে, কেশি দানব প্রজাপতির মেয়ে দেবসেনাকে অপহরণ করতে চেষ্টা করছে। ইন্দ্র উক্ত দানবের হাত হতে তাঁকে রক্ষা করে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা তাঁকে দেখে বলেন যে, এক মহা-বিক্রমশালি পুরুষ এ মেয়ের পতি হবেন, আর ইনিই হবেন দেবসেনাপতি। দক্ষমেয়ে স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। একদিন অগ্নি সপ্তর্ষিদের পত্নীগণকে দেখে কামাতুর হয়ে পড়েন। স্বাহা মহর্ষি অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণপূর্বক অগ্নির কাছে এসে সহবাস করেন এবং অগ্নির শুক্র নিয়ে গরুড় পক্ষিণি হয়ে এক কাঞ্চন কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। এতেও তৃপ্ত না হয়ে তিনি সপ্তর্ষিদের প্রত্যেকের স্ত্রীর রূপ ধারণ করে পূর্বের মতো অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। কেবলমাত্র বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে স্বাহা তাঁর রূপ ধারণ করতে অক্ষম হন। এভাবে স্বাহা ষষ্ঠবার কাঞ্চন কুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করেন। সে সম্মিলিত শুক্র থেকে স্কন্দ, অর্থাৎ কার্তিকেয়র জন্ম হয়। তাঁর ছটি মস্তক, একটি গ্রীবা এবং একটি উদর হয়। কার্তিকেয়র জন্মের সপ্তর্ষিরা তাঁদের স্ত্রীদের ত্যাগ করেন। তাঁরা ভাবলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরাই স্কন্দের মা; কিন্তু স্বাহা বারংবার বললেন যে, স্কন্দই তাঁর ছেলে। মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু সপ্তর্ষিরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। স্কন্দের বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে দেবতারা এঁকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকে বললেন, কারণ তাঁর অমিত বল তাঁদের অসহ্য। কন্তি ইন্দ্র এ কার্যে সাহসি হলেন না। তখন দেবতারা এঁকে মারবার জন্য লোক-মাদের (শিবের অনুচরি–মাতৃকা) প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা গিয়ে বালককে নিজেদের ছেলেজ্ঞান করে তাঁদের স্তন্যপান করালেন। পরে স্কন্দকে পরাজিত করার জন্য ইন্দ্র সদলবলে অগ্রসর হলেন, কিন্তু অগ্নিছেলে স্কন্দ মুখ-নির্গত অগ্নিশিখায় দেবসৈন্যদের দগ্ধ করে ফেললেন। তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলে,

কার্তিকেয়র দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হয়ে বিশাখ নামে (কার্তিকেয়র অপর নাম) এক কাঞ্চনরঙ যুবার আবির্ভাব হ'ল। তখন দেবরাজ ভীত হয়ে কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে বরণ করলেন। রুদ্রকে অগ্নি বলা হয়, সেজন্য কার্তিকেয় মহাদেবের ছেলে। মহাদেব অগ্নির শরিরে প্রবেশ করে এ ছেলে উৎপাদন করেছিলেন। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হবার পর ইন্দ্র তাঁর হাতে সকল দেবসেনাকে সমর্পণ করেন। তারপর দেবাসুরের যুদ্ধে কার্তিক সেনাপতি রূপে যুদ্ধে অগ্রসর হন। প্রায় সমস্ত দানবই তাঁর শরাঘাতে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধশেষে সমস্ত দানবকে নিহত করে তিনি দেবতাদের রক্ষা করেন। (মহাভারত)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কার্তিকেয়র জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কার্তিকেয় মহাদেবের তেজে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বতীর সঙ্গে বিহারকালে মহাদেবের তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী এ তেজ ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভয়ে এ তেজ শরবনে ত্যাগ করেন। শরবনে এ বীর্য একটি সুন্দর বালকের সৃষ্টি করে। কৃত্তিকারা এ বালককে দেখে স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করেন। পার্বতীদেবতাদের কাছ থেকে এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে কার্তিকেয়কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

কার্তবীর্য

তিনি কৃতবীর্যরাজের ছেলে। তিনি নর্মদা-তীরবর্তী হৈহয়রাজ্যের রাজা। তাঁর আর একটি নাম অর্জুন। মাহিষ্মতি নগরি হৈহয়রাজ্যের রাজধানি ছিল। বাবা কৃতবীর্যের নামানুসারে তাঁর নাম হয় কার্তবীর্য এবং কাতবীর্যার্জুন নামেই তিনি সম;ধিক পরিচিত। দত্তাত্রেয় মুনির বরে কার্তবীর্য সহস্র বাহু লাভ করেন। একবার দিগ্বিজয় কালে রাবণ রাজধানিতে উপস্থিত হয়ে নর্মদাতীরে শিবপূজায় রত হন। অদূরে জলক্রীড়ারত কার্তবীর্যার্জুন সহস্র বাহু দিয়ে নর্মদার জল রুদ্ধ করায় রাবণের পূজার ব্যাঘাত হয়। তখন ক্রুদ্ধ রাবণ কার্তবীর্যকে আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু তাঁর হাতে পরাজিত ও বন্দি হন। রাবণের পিতামহ স্বর্গস্থ পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্তবীর্য রাবণকে মুক্তি প্রদানপূর্বক তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন।

একবার হরিণাকালে ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত কার্তবীর্য জমদগ্নি ঋষির আশ্রমে উপস্থিত কপিলা নামে কামধেনুর প্রভাবে কার্তবীর্যের সমস্ত সেনাদের প্রচুর আহার্য বস্তু দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন। কার্তবীর্য জমদগ্নির কাছে এ কামধেনু প্রার্থনা করলে, ঋষি এ গাভি দান করতে অসম্মত হন। তখন রাজা বলপূর্বক সে কামধেনু অপহরণ করতে গেলে কপিলা দৈবশক্তিপ্রভাবে প্রভূত সেনা ও অস্ত্র সৃষ্টি করে সসৈন্য কার্তবীর্যকে পরাস্ত করে। পরাজিত কার্তবীর্য রাজধানিতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে আবার কার্তবীর্যের আক্রমণে জমদগ্নি নিহত হন। কপিলাও

যুদ্ধক্ষেত্র হতে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করে। উক্ত সময় জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন। পরশুরাম গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বাবার মৃত্যুর কারণ শুনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, কার্তবীর্যকে তিনি নিহত করবেন। দত্তাত্রেয়র বরে সহস্র বাহুর অধিকারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরশুরামের কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়। এর পর পরশুরাম একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।

কামগীতা

ভিষ্মের উদ্দেশ্যে তর্পণের পর যুধিষ্ঠির যখন মনস্তাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তখন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ কথিত যে সব উপদেশ বাণি শুনিয়েছিলেন তাই কামগীতা নামে অভিহিত। (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব)

কাম

কামদেব প্রেমের দেবতা। রতি কামদেবের স্ত্রী। কামের নাক সুচারু, উরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত। কেশ নীল ও কুঞ্চিত, সুবিশাল বক্ষ, চক্ষু পদতল, নখ আরক্তরঙ, গায়ে বকুলের সৌরভ। মকর তাঁর বাহন, তিনি পুষ্পময়, পুষ্পকার ও কুসুম কার্মুকে শোভিত। তিনি অতিশয় যৌনাকর্ষিত। সীমাহীন যৌন আবেদন তাঁর। তাঁর স্ত্রীর নামে যৌনকর্মের নাম হয়েছে রতিকর্ম।

কামদেবের নামের বিবরণ : ১. ব্রহ্মা ও অন্যান্য মুণির চিত্ত মথিত করেছিলেন বলে তাঁর নাম মন্মথ, ২. জগতের সব লোককে মত্ত করেন বলে তিনি মদন, ৩. মহাদেবের দর্প চূর্ণ করেছিলেন বলে তিনি কন্দর্প, ৪. মহাদেব দ্বারা ভষ্মে পরিণত হওয়ার জন্য তাঁর নাম হয় অনঙ্গ। ৫. তিনি অতিরূপ অর্থাৎ সুন্দর। ৬. তাঁর নাম কলকেলি কারণ তিনি উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক, শৃঙ্গার যোনি, ৭. তাঁর তীর ও ধনুক হাতে নাম কুসুমায়ুধ ও পুষ্পশর। ৮. তাঁর পতাকা হাতে নাম মকরকেতু। ৯. হাতে পুষ্প আছে বলে তাঁর নাম পুষ্পকেতন। সতী দেহ ত্যাগ করে হিমালয়ের মেয়ে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করেন। এ সময় মহাদেব হিমালয়ে তপস্যারত ছিলেন। ইন্দ্র কামদেবকে সেখানে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা ভাঙতে বললেন। বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট মহাদেবের ওপর পুষ্পশর নিক্ষেপ করতেই ক্রুদ্ধ মহাদেবের কপালের তৃতীয় চোখের আগুনে কামদেব ভস্মিভূত হন। পরে মহাদেব অনুতপ্ত হয়ে কামদেবকে কৃষ্ণের ছেলেরূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন।

কামদেব ভীতি রামকে রক্ষার জন্য মেঘনাদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন দেবতারা। মহাদেবের আনুকূল্য লাভের জন্য দেবতাদের অনুরোধে সতী কামদেবের সহায়তায় মহাদেবের ধ্যান ভাঙানোর উদ্যোগ নেন। কামদেব তাঁর পূর্বের ঘটনা মনে করে আতঙ্কিত।

পূর্বের ঘটনাটি এরূপ : প্রজাপতি দক্ষ মেয়ে সতীর সাথে শিবের বিয়ে দেন। কিন্তু শিবের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট দক্ষ শিবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সতী এতে আপত্তি করলে দক্ষ শিবের নিন্দা করেন। পতিনিন্দা শুনে সতী ক্ষোভে দেহত্যাগ করেন। তাতে শিব এসে দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করে দেন। স্ত্রী সতীর দেহ ত্যাগের পর বিরহে মহাদেব পৃথিবীর দায়িত্বভার ত্যাগ করে ধ্যানে বসেন। ইন্দ্র সে ধ্যান ভেঙ্গে দেবার জন্য কামদেবকে নির্দেশ দেন। অশুভক্ষণে কামদেব তপমগ্ন মহাদেবের প্রতি পুষ্পধনু নিক্ষেপ করলে মহাদেব রেগে গিয়ে উঠলেন এবং মহাদেবের কপালের তৃতীয় নয়নের আগুন কামদেবকে গ্রাস করলো। আগুনের জ্বালায় কাতর কামদেব ইন্দ্র, চাঁদ, পবন, সূর্য সবাইকে ডাকলেন। কিন্তু কেউ কাছে আসতে ভরসা পেলেন না। কামদেব পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। এ পূর্বকথা স্মরণ করে কামদেব এখন মহাদেবের কাছে যেতে ভয় করছেন। দুর্গার কাছে সে কথা ব্যক্ত করে কামদেব নিজের ভয়ের কারণ দেখালেন।

কামধেনু

যে গাবি ইচ্ছা পূরণ করে। এ গাভির কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা সুরভির গর্ভে রোহিণির জন্ম হয়। শূরসেন হতে রোহিণির ক্ষেত্রে কামধেনুর উৎপত্তি। বশিষ্ঠের 'সবলা' কামধেনু ছিলো। রাজা বিশ্বামিত্র একে গ্রহণ করাবার চেষ্টা করে অবশেষে পরাজিত হন।

কালনেমি

তিনি রাবণের মামা। শক্তিশেলে হতচেতন লক্ষ্মণকে পুনর্জীবন দান করার জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বত থেকে ঔষধ আনতে গেলে, রাবণ কালনেমিকে পথিমধ্যে হনুমানকে হত্যার জন্য পাঠান এবং তাঁর পুরস্কার স্বরূপ মামাকে অর্ধেক লঙ্কারাজ্য দান করবেন বলে অঙ্গিকার করেন। হনুমানকে নিহত করার আগেই কালনেমি লঙ্কার কোন অংশগ্রহণ করবেন তা মনে মনে স্থির করেন। ঔষধির জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে গেলে, কালনেমির দেহ তীরবেগে ঘুরতে ঘুরতে রাবণের সিংহাসনের ওপর পতিত হয়।

কালপুরুষ

তিনি ব্রহ্মার পৌত্র ও সূর্যের ছেলে। যমের অন্য নাম। একদিন তিনি তাপস বেশে রামের নিকট উপস্থিত হন এবং নিভৃতস্থানে নিজমূর্তি ধারণ করে রামকে বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমনের জন্য ব্রহ্মার অনুরোধ জানান। নিভৃতে কথা বলার সময়

তিনি রামকে এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, তাঁদের আলাপের সময় সম্মুখে যে উপস্থিত হবে, তাকেই রাম বর্জন করবেন। উক্ত সময় লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন; এমন সময় দুর্বাসা রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণ রামকে দুর্বাসার আগমন সংবাদ দেন। কালপুরুষের সঙ্গে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করতে বাধ্য হন। লক্ষ্মণ সরযূ নদীর তীরে যোগাবলম্বনপূর্বক দির্ঘদিন স্থির হয়ে থাকেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সাধনায় মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়ে, লক্ষ্মণকে সশরিরে স্বর্গে নিয়ে যান।

কালি

দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা। শক্তি-উপাসরা কালিকে আদ্যাশক্তি বলে উপসনা করেন। তাঁর চারটি হাত আছে। দু দক্ষিণ হাতে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস, আর দু বাম হাতে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, দেহ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। দির্ঘদন্তী, রক্তচক্ষু, বিস্তৃত মুখ ও স্থুল কর্ণ। তাঁর বাহন কবন্ধ (মস্তক বিহীন মৃতদেহ)।

দেবাসুরের যুদ্ধে, বিশেষত শুম্ভনিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধে, দেবতারা পরাজিত হয়ে স্বর্গ হতে বিতাড়িত হন ও দেবি আদ্যাশক্তি ভগবতির স্তব করতে থাকেন। তখন দেবির শরিরকোষ হতে অপর এক দেবি আবিভূত হন। সে দেবি কৌষিকি নামে খ্যাত। দেবি কৌষিকি শরির হতে নিষ্ক্রান্ত হলে, ভগবতি, দেবি কালোরঙ ধারণ করেন এবং সে থেকে তিনি কালিকা বা কালি নামে পরিচিতা। এরপরে দেবি পুনরায় মনোহর রূপ ধারণ করেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের দু সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড এ সুন্দর মূর্তির বিষয় শম্ভাসুরকে জানান। তখন শম্ভাসুর দেবিকে তার নিজের সম্মুখে আনয়নের জন্য সুগ্রীব নামে এক দূতকে প্রেরণ করেন। দূত দেবির সম্মুখে এসে শম্ভ বা নিশম্ভের স্ত্রীর হবার জন্য তাঁকে আহ্বান করেন। দূতের উত্তরে দেবি বলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করবে, তিনি তাঁকে পতিত্বে বরণ করবেন। দূতমুখে এ গর্বিতবাক্য শ্রবণ করে শুম্ভ প্রথমে ধূম্রলোচন নামে এক সেনাপতিকে পাঠালেন দেবিকে শোকর্ষন করে তাঁর সম্মুখে আনতে। তাঁর সম্মুখে এলে দেবি সানুচর ধূম্রলোচনকে ভস্মিভূত করে ফেলেন। শুম্ভ এতে আরও রেগে গিয়ে চণ্ড ও মুণ্ডকে দেবির বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। হিমালয়ের শিখরে সিংহবাহিনী দেবিকে আক্রমণ করলে, তাঁর ললাট থেকে নরমুণ্ডমাল্যভূষিতা, করালবদনা, কালোরঙা এক দেবি বেরিয়ে আসেন। তাঁর জিহ্বা লেলিহান, মাংস শুষ্ক, নয়নদ্বয় রক্তরঙ। এ মহাভষঙ্করী দেবিমূর্তিকে চণ্ড ও মুণ্ড চেলা-চামুণ্ডাসহ আক্রমণ করে। দেবি অসি ও খড়্গাঘাতে তাদের নিহত করেন। চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত করেছিলেন বলে এ দেবির নাম হয় চামুণ্ডা। অতঃপর দেবি চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন মস্তক কৌষিকি দেবিকে উপহার দিয়ে, তাঁকে শুম্ভ

ও নিশুম্ভকে বধ করতে বলেন। দেবি কালি (পার্বতী) ও চণ্ডিকা (কৌষিকি) শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এ ভীষণ দেবাসুরের যুদ্ধে দেবিদ্বয়কে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর, কার্তিকেয় ও বিষ্ণুর মরির হতে পৃথক পৃথক শক্তিগণ আবির্ভূত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এ যুদ্ধে দেবিরা সমস্ত অসুরকে নিধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্নর

(১) কুৎসিত নর। কিন্নর দু প্রকারের এক প্রকারের শরির মানুষের মতো এবং মুখ অশ্বের তুল্য আর এক প্রকারের শরির অশ্বের ন্যায় আর মুখ মানুষের তুল্য। এদের অন্য নাম কিম্পুরুষ। দেবযোনি বিশেষ। এদের রাজা কুবের। এরা স্বর্গের গায়ক। ব্রহ্মার ছায়া হতে এরা উৎপন্ন হয়েছে। কৈলাসে এরা বিচরণ করে। (শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ)

(২) কশ্যপ ও অবিষ্ট হতে এদের জন্ম। চিত্ররথ এদের শাসনকর্তা। হিমালয়ে এদের বাসস্থান ছিল। (মৎস্যপুরাণ)

(৩) এরা অশ্বমুখের সন্তান এবং অনেক 'গণে' বিভক্ত। এদের অবয়ব অর্ধ-মনুষ্যাকৃতি এবং অর্ধ-ঘোড়াকৃতি। সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য এরা প্রসিদ্ধ। (বায়ুপুরাণ)

কিচক

মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও প্রধান সেনাপতি। বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণা কিচকের বোন। অজ্ঞাতবাসকালে ছদ্মবেশি পাণ্ডবেরা দ্রৌপদিসহ বিরাটভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্রৌপদি সৈরিন্ধ্রি নামে পরিচিতা হন। তিনি পরিচারিকার কাজ এবং ভিম বল্লব নামে পাচকের কাজ নেন। সৈরিন্ধ্রির রূপে মুগ্ধ, কামাবিষ্ট কিচক তাঁকে বিয়ে করতে চাইলে তিনি ঘৃণায় কিচককে প্রত্যাখ্যান করেন। কিচকের অনুনয়ে সুদেষ্ণা একদিন মদ আনার ছল করে দ্রৌপদিকে কিচকের ঘরে পাঠান। তখন কিচক দ্রৌপদির গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করায় তিনি কিচককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং দ্রুত বিরাটরাজসভায় চলে আসেন। পেছনে কিচক এসে সর্বসমক্ষে দ্রৌপদির চুল ধরে তাঁকে লাথি মারেন। সভাস্থ ছদ্মবেশি পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশের ভয়ে কিচককে কিছু বললেন না। রাতে দ্রৌপদি গোপনে ভিমের নিকট গিয়ে এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁকে উত্তেজিত করেন। ভিমের পরামর্শ মতো দ্রৌপদি কিচককে সন্ধ্যাকালে নৃত্যশালায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করেন। রাতে কিচক নৃত্যশালায় উপস্থিত হলে দ্রৌপদির প্রতীক্ষারত ভিমের হাতে নিহত হন। কিচককে হত্যা করে ভিম তাঁর হাত, পা, মাথা সমস্ত দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে তাঁকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন।

কুন্তি

তাঁর অপর নাম পৃথা। তিনি যদুবংশের শূরসেন রাজার মেয়ে বসুদেবের বোন। শূরসেন রাজার সাথে কুন্তি ভোজরাজার পরম বন্ধুত্ব ছিল। কুন্তি ভোজরাজা নিঃসন্তান ছিলেন বলে শূরসের তাঁকে পৃথা নামের এ মেয়ে কৃত্রিম মেয়ে রূপে প্রদান করেন। পৃথা কুন্তি ভোজ দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে কুন্তি নামে পরিচিত হন।

একদিন দুর্বাসা ঋষি কুন্তি ভোজরাজার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং এক বৎসরকাল সেখানে অবস্থান করেছিলেন। তখন কুন্তি ঋষির পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ঋষি তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে তাকে এ রূপ মন্ত্রদান করেন যে তিনি ঐ মন্ত্র পাঠ করে যে দেবতাকে স্মরণ করবেন সে দেবতাই তাঁর নিকট উপস্থিত হবেন।

কুন্তি মন্ত্রপরীক্ষার জন্য প্রথমত সূর্যদেবকে স্মরণ করেন। সূর্য এসে উপস্থিত হলেন। সূর্যের ঔরসে কুন্তির গর্ভে কর্ণ নামক এক ছেলে জন্মে। ঐ সদ্যোজাত শিশুকে মঞ্জুষায় রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

পরে কুন্তি স্বয়ংবরা হয়ে পাণ্ডুরাজকে বরমাল্য দান করে পতিত্বে বরণ করেন। মাদ্রি নামে পাণ্ডুর আর এক স্ত্রী ছিল। কুন্তি ও মাদ্রির সাথে পাণ্ডুবন ভ্রমণে বের হলে এক ব্রাহ্মণের অভিসাপে পাণ্ডুরাজ স্ত্রীসংসর্গে বঞ্চিত হয়ে কুন্তিকে ছেলে উৎপাদন করতে অনুমতি দেন। স্বামির আদেশে কুন্তি ঋষিদত্ত মন্ত্রবলে ধর্মরাজ, পবন ও ইন্দ্রকে একে একে যৌন সম্ভোগ করেন। তাঁদের ঔরসে যথাক্রমে কুন্তির গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভিম ও অর্জুনের জন্ম হয়। কুন্তি সপত্নী মাদ্রিকেও ঋষিদত্ত মন্ত্র প্রদান করেন। তিনিও মন্ত্রবলে অশ্বিনীকুমারের যৌনসংগমে নকুল ও সহদেব নামক দু যমজ ছেলে লাভ করেন।

কালক্রমে বনমধ্যে পাণ্ডুর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী মাদ্রিকে মৃত স্বামির সাথে চিতায় দাহ করা হয়। পরে কুন্তি পাণ্ডবগণকে নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

কুবলাশ্ব

(১) তিনি ইক্ষাকুবংশিয় রাজা বৃহদশ্বের ছেলে। বৃহদশ্ব বনগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁকে নিরত করে বলেন যে, তাঁর আশ্রমের কাছে মরুপ্রদেশে উজ্জ্বালক নামে এক বালুসমুদ্রের মধ্যে মধুকৈটভের ছেলে ধুন্ধু বাস করে। বালুমধ্যে নিদ্রিত দানব বৎসরান্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে সপ্তাহকাল ভূমিকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্যন্ত ধূলি ওড়ে, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হয়। এ দানবকে হত্যা করলে রাজার অক্ষয়কীর্তি লাভ হবে। বৃহদশ্ব তাঁর ছেলেকে এ

কার্যের জন্য নির্দেশ দিয়ে বনগমন করেন। ধুন্ধু তপস্যার ফলে ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, যম, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়। সে বালুকার মধ্যে লুকিয়ে থেকে আশ্রমে এসে উপদ্রব করত। উতঙ্কের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পূর্বে বিষ্ণু তাঁকে বার দিয়েছিলেন যে, তাঁর যোগবল অবলম্বনপূর্বক কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বধ করেন। পরে ধুন্ধুর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে, উতঙ্কের অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ করেন এবং কুবলাশ্ব একুশ হাজার ছেলে ও সেনা নিয়ে ধুন্ধু-বধে যাত্রা করেন। সপ্তাহকাল বালুকা-সমুদ্রের চতুর্দিক খনন করার পর নিদ্রিত দানবকে দেখা যায়। সে উঠে মুখনিসৃত অগ্নিতে কুবলাশ্বের ছেলেদের দগ্ধ করে। কুবলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে ধুন্ধুর মুখাগ্নি নির্বাপিত করে ধুন্ধুমার নামে খ্যাতিমান হন। (মহাভারত– বনপর্ব)

(২) কুবলাশ্ব শত্রুজিৎ রাজার ছেলে; প্রকৃত নাম ঋতধ্বজ। কুবলয় নামে অশ্বে আরোহণ করে ভ্রমণ করতেন বলে তাঁর এ নাম হয়। দানব পাতালকেতুকে বধ করে তিনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর মেয়ে মদালসাকে পাতাল হতে এনে বিয়ে করেন। দানব পাতালকেতুর ভাই তালকেতু ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য তপস্বিবেশে রাজধানির নিকট এসে বাস করতে থাকে। একদিন সে চাতুরি করে প্রাসাদে রটনা করে যে, কুবলাশ্ব শিকার করতে গিয়ে মারা গেছেন। এ সংবাদ শ্রবণান্তে মদালসা শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কুবলাশ্ব কিছুদিন পরে ফিরে এসে মদালসার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এদিকে মদালসা পাতালে এ নাগ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে কুবলাশ্ব পাতালে উপস্থিত হয়ে বিরহিণি মদালসার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

কুবের

তিনি যক্ষপতি। কিন্নরগণেরও রাজা কুবের। কুবের সমস্ত ধনের প্রদাতা ও অধ্যক্ষ। তাঁর দেহের গঠন কুৎসিত। তাই তাঁর নাম হয় কুবের। তাঁর তিন পা ও আটটি দাঁত। কুবের মহাবনে গিয়ে দু হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট হতে বরলাভ করেন যে, তিনি অমর ও উত্তর দিকের দিকপাল এবং ধনাধিপতি হবেন। দেবতাদের সমান মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা তাঁকে একটি পুষ্পক রথ দান করেন, কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর আবাসস্থল নির্দেশ না করায় নিজের বাবাকে স্থান নির্দেশ করতে বলেন। কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই রাবণ লঙ্কাপুরি অধিকার করতে চাইলে কুবের পিতৃ উপদেশে লঙ্কা থেকে কৈলাসে প্রস্থান করলেন। সেখানে তাঁর বাসস্থান স্থির হয়। রাবণ শক্তিশালি হয়ে অত্যাচার শুরু করলে কুবের দূতমুখে রাবণকে দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধর্মাচরণ করতে বলে পাঠান। রাবণ তাতে

রেগে গিয়ে কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে জয়চিহ্নস্বরূপ তাঁর পুষ্পক রথ অপহরণ করেন।

কুমার

(১) কুমার দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র অন্য নাম। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দেবতাদের স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা তখন ব্রহ্মার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা বলেন যে, মহাদেবের ঔরসে কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করলে তিনি তারকাসুরকে বধ করতে সমর্থ হবেন। অতএব যাতে মহাদেবের সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি হয়, সেজন্য ব্রহ্মা দেবতাদের সচেষ্ট হতে বলেন। তখন দেবতারা কৌশলে হরগৌরীকে মিলনকার্যের সংঘটনে মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে মনদ ভস্ম হন। এ বিবাহের ফলেই কার্তিকেয়র জন্ম হয়। অতঃপর কার্তিক দেবসেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে নিহত করেন। ফলে, দেবতারা স্বর্গরাজ্যের পুনরাধিকার লাভ করেন। (কার্তিকেয় দেখুন)

(২) ব্রহ্মার চার মানসছেলে। তাঁরা প্রজা সৃষ্টি অস্বীকার করে চিরদিন কুমার ছিলেন। এঁদের নাম : ১. সনৎকুমার, ২. সনন্দ, ৩. সনক ও ৪. সনাতন। পরে পঞ্চম ছেলে বিভুও এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

কুম্ভি বা কুম্ভযোনি

কুম্ভ মহর্ষি অগস্ত্যের অন্য নাম। অপ্সরা উর্বশিকে দর্শনপূর্বক বরুণ কুম্ভ-মধ্যে রেতঃপাত করেন। পরে সে কুম্ভে মিত্রও রেতঃপাত করেন। এ রেতঃ হতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অগস্ত্য কুম্ভি বা কুম্ভযোনি নামে অভিহিত হন।

কুম্ভকর্ণ

রাবণের ছোট ভাই। বিশ্বশ্রবা মুণিও নিকষার ছেলে। ভাইয়ের সাথে কুম্ভকর্ণও গোকর্ণ আশ্রমে উগ্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অমরত্ব বর চান। ব্রহ্মা প্রথমে সম্মত হননি, দেবতারাও আপত্তি করেন। এদিকে কুম্ভকর্ণের কঠোর তপস্যায় পৃথিবী এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো যে, মনে হলো পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর স্ত্রী সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের কানে স্থান নিতে বলেন, আবার বরপ্রার্থনার সময় সরস্বতী চালিত কর্ণ থেকে উত্তর এলো– অনন্ত জীবনের পরিবর্তে অনন্ত নিদ্রা। তথাস্তু বলে ব্রহ্মা অদৃশ্য হবার পর চৈতন্য লাভ করে কুম্ভকর্ণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে বহু অনুনয় করে ছ-মাস পর একবার নিদ্রাভঙ্গের বর পেলেন। কিন্তু শর্ত আরোপিত হয় যে, অকালে নিদ্রাভঙ্গ

হলে তাঁর মৃত্যু হবে। রাবণ কুম্ভকর্ণের ঘুমের জন্য দু যোজন দির্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত এক বিচিত্র ভবন তৈরি করে দেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীর শূন্য হয়ে পড়লে রাবণ বহু অনুচর পাঠিয়ে ও সহস্র হাতি দিয়ে মাড়িয়ে অকালে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গান। এর পরিণামে কুম্ভকর্ণ অকালে মারা যান।

কুরু

সেনা দর্শনে ভীত উত্তর পলায়নোদ্যত হলে তাঁকে আশ্বস্ত করে তাঁকেই সারথি করে বৃহন্নলা স্বয়ং যুদ্ধ করে বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন।

কুরুক্ষেত্র

কুরুপাণ্ডবের রণভূমি। এ স্থান থানেশ্বরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র চিরকালই 'ধর্মক্ষেত্র' হিসাবে খ্যাত। 'জাবাল উপনিষদ' ও 'শতপথ ব্রাহ্মণে' তা-দেবতাদের যজ্ঞস্থান বলে উল্লিখিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সমন্ত পঞ্চক। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে এ স্থানে পিতৃতর্পন করেছিলেন। দুর্যোধনাদির পূর্বপুরুষ খ্যাতিমান কুরুরাজ এ স্থানে হল চালন করে এ বরলাভ করেন যে, যে ব্যক্তি এ স্থলে তপস্যা করবে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে, সে স্বর্গে গমন করবে। তদবধি এ স্থানের নাম হয় কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পুরাকালে রাজর্ষি কুরু এ স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র একদিন এর কারণ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে কুরু বলেন, এ ক্ষেত্রে যে মারা যাবে সে পাপবিশুক্ত হয়ে পুণ্যলোকে গমন করবে। তখন একদিন দেবতারা ইন্দ্রকে বলেন যে, তিনি রাজর্ষি কুরুকে বর দিয়ে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করুন। কারণ, মানুষ যদি কুরুক্ষেত্রে মারা গেলেই স্বর্গে যেতে পারে, তবে দেবতারা আর যজ্ঞভাগ পাবেন না। ইন্দ্র তখন কুরুর কাছে গিয়ে তাঁকে আর পরিশ্রম করতে নিষেধ করে এ কথাই বলেন যে, যে লোক এখানে উপবাস করে প্রাণত্যাগ করবে বা যুদ্ধে নিহত হবে, সে লোকেই স্বর্গগমন করবে। কুরু তখন তাতেই সম্মত হন। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র নামে খ্যাতিমান; কারণ এ-স্থলে কুরু সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেন।

কৃষ্ণ

বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। মথুরার রাজা উগ্রসেনের ছেলে কংস অতি দুর্দান্ত ছিলেন। বড় হয়ে তিনি বাবা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত করে নিজেই রাজা হন। কংস বৃষ্ণিবংশিয় বসুদেবের সঙ্গে নিজের বোন দেবকির বিয়ে দেন। বিয়েকালে দৈববাণি হয় যে, দেবকির অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে নিহত করবে। এ

দৈববাণিতে ভীত হয়ে কংস দেবকি ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। কারাগারে দেবকি ও বসুদেবের ছটি সন্তান হয়, কিন্তু সব কয়টিকেই কংস হত্যা করে। সপ্তম সন্তান যখন গর্ভে, তখন জানা যায় যে, এ সন্তান সুলক্ষণযুক্ত। বিষ্ণু এঁকে সুদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী রোহিণির গর্ভে প্রেরণ করেন। জন্মের পর এ সন্তানের নাম হল বলরাম। কংস অবশ্য সংবাদ পান যে, সপ্তম সন্তানের বেলায় দেবকির গর্ভপাত হয়েছে। দেবকির অষ্টমবার গর্ভধারণকালে কংস কারাগারে আরো কঠোর রক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করেন। জন্মরাত্রে বসুদেবের সম্মুখে ভগবান এসে বলেন যে, আজ দেবকির গর্ভে যে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, তা গোপালক নন্দের স্ত্রী যশোদাকে দিয়ে, যশোদার সদ্যোজাত মেয়ে দেবকিকে এনে দেবে। মধ্যরাত্রে মহামায়ার মায়াতে মথুরার সকলেই অচৈতন্য ছিলেন। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমি তিথিতে কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বসুদেব কৌশলে কারাগার হতে অষ্টম সন্তান কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শেষনাগ পথপ্রদর্শক হিসাবে সাহায্য করে এবং যমুনার জলও শুষ্ক হয়ে যায়। বসুদেব অনায়াসে যমুনা অতিক্রম করে যশোদার অজ্ঞাতসারে সন্তান পরিবর্তন করে, কারাগারে দেবকিকে যশোদার মেয়েকে এনে দেন। কংস এ মেয়ের জন্মের সংবাদ পেয়ে মেয়েকে পাথরের উপর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শিশুকন্যা এ বলে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায় যে, "আমি যোগমায়া, তোমাকে যে সন্তান হত্যা করবে সে জন্মগ্রহণ করে জীবিত আছে এবং শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।"

বসুদেব বলরামকে নন্দালয়ে প্রেরণ করে, একত্রে উভয় ভাইয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছেলেদের বিপদাশঙ্কায় বসুদেব নন্দাকে মথুরা ত্যাগ করে গোকুল গমনের নির্দেশ দেন। নন্দ কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে গোকুলে প্রস্থান করেন।

কংস তাঁর ভবিষ্যৎ হত্যাকারির অনুসন্ধান করা অসম্ভব দেখে মথুরার সমস্ত শিশুদের হত্যা করার আদেশ দেন। পুতনা রাক্ষসির সাহায্যে কংস অসংখ্য শিশুকে নিহত করেন। পুতনার বিষাক্ত স্তন পান করলেই শিশুরা মৃত্যুমুখে পতিত হতো; কিন্তু কৃষ্ণ এ পুতনার স্তন এমন কঠোরভাবে পান করেন যে, যন্ত্রণায় পুতনা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কংস এবার বুঝতে পারেন যে, কৃষ্ণই তাঁর প্রধান শত্রু; সেজন্য নানা উপায়ে কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করতে থাকেন। কংস-নিয়োজিত বক, অঘ, অরিষ্ট প্রভৃতি দানবরা কৃষ্ণের হাতে বিনষ্ট হয়। এ সময়ে কৃষ্ণ কালিয়নাগকে দমন করে কালিন্দির জল বিষমুক্ত করেন। কৃষ্ণের পরামর্শে গোপগণ ইন্দ্রের পূজা ত্যাগ করে, তাদের গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্ধনগিরির পূজা করায় ইন্দ্র রেগে গিয়ে গোবর্ধনপর্বত নিমজ্জিত করার জন্য

দেশে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবনের সৃষ্টি করেন। তখন কৃষ্ণ আঙ্গুলের উপর সাত দিন ধরে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ইন্দ্রকে পরাভূত করে গোপগণের গোধ ও দেশরক্ষা করেন।

অবশেষে কংস-বলরামকে নিমন্ত্রণ করার জন্য অক্রূরকে পাঠান। অক্রূর কৃষ্ণকে কংসের নিমন্ত্রণ ও গুপ্ত অভিসন্ধির কথা জানান। কৃষ্ণ ও বলরাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মথুরায় চলে যান।

মথুরায় দু ভাই ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে কংস দুজন মল্লযোদ্ধাকে এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললেন। তাদের গোপন অভিসন্ধি যে, তারা কৃষ্ণ-বলরামকে পরাজিত করে হত্যা করবে। কংস গোপনে একটি হস্তিকে নিযুক্ত করেন এ দূরভিসন্ধি নিয়ে যে, যেনো প্রয়োজন হলে হস্তিটি এঁদের উভয়কেই পদদলিত করতে পারে। মল্লযোদ্ধারা কৃষ্ণ-বলরাম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হয় এবং হস্তিটিও তাঁদের হাতে নিহত হয়। তারপর কংসের রক্ষীদের হত্যা করে কৃষ্ণ কংসকে নিহত করেন ও কারারুদ্ধ উগ্রসেনকে মুক্ত করে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর কৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় বাবা-মার সঙ্গে বাস করতে থাকেন। তদনন্তর সান্দীপনি নামে এক বেদজ্ঞের কাছে কৃষ্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি পাঁচজন নামে সমুদ্রচর দৈত্যকে বধ করে পাঞ্চজন্য শঙ্ক লাভ করেন।

দ্বারকায় বিদর্ভরাজ ভিষ্মক-মেয়ে রুক্মিণি কৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে চরমুখে কৃষ্ণের নিকট সে সংবাদ পাঠান। কৃষ্ণ রুক্মিণিকে বিবাহের প্রস্তাব করলে বিদর্ভরাজ ভিষ্মক তাঁর ছেলে রুক্মির অমতে এ বিবাহে অসম্মত হন। কৃষ্ণ-বলরাম স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হয়ে তৎকালিন প্রথানুযায়ি রুক্মিণিকে অপহরণ করেন। রুক্মিণি রাজা শিশুপালের বাগদত্তা ছিলেন। শিশুপাল ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হয়ে স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। রুক্মিণির গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন প্রমুখ দশ জন ছেলে ও চারুমতি নামে এক মেয়ে হয়। রুক্মিণি ভিন্ন কৃষ্ণের জাম্ববতি, সুশিলা, সত্যভামা ও লক্ষ্মণা নামে চারটি প্রধানা স্ত্রী এবং ষোল হাজার অপ্রধানা স্ত্রী ছিলেন।

একবার সত্যভামার সঙ্গে স্বর্গে ভ্রমণকালে সমুদ্রমন্থনোত্থিত পারিজাত বৃক্ষ কৃষ্ণ নিয়ে আসেন। এ বৃক্ষের অধিকারিণী ছিলেন ইন্দ্রের স্ত্রী শচিদেবি স্ত্রীর সামগ্রি উদ্ধারের জন্য ইন্দ্র কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হন। কৃষ্ণের এ কাহিনি হরিবংশ ও ভাগবতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুলছেলে। কুন্তি কৃষ্ণের পিতৃস্বসা। দ্রৌপদির স্বয়ংবরসভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এ স্বয়ংবর-সভাতেই পাণ্ডবদের সঙ্গে

কৃষ্ণের প্রথম আলাপ-পরিচয় ও সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পরিচয়ের সূত্র থেকেই পাণ্ডবরা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। পাণ্ডবরা ন্যায়ত দ্রৌপদিকে লাভ করেছেন, এ অভিমত ব্যক্ত করে কৃষ্ণ সমবেত রাজাদের পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিবৃত্ত করেন। কৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই বনবাসকালে অর্জুন তাঁর বোন সুভদ্রাকে অপহরণ করে বিয়ে করেন। সুভদ্রার বিবাহোপলক্ষে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল বাস করেন। এ সময় অগ্নির অগ্নিমান্দ্য দূর করার জন্য তাঁরই প্রার্থনায় কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের বাধা সত্ত্বেও খাণ্ডববন দাহন করেন। অগ্নি এ কাজের জন্য কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকি নামে গদা দান করেন।

মগধরাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের মহাপরাক্রান্ত শত্রু ছিলেন। তাঁর ভয়ে কৃষ্ণকে মথুরা ত্যাগ করে রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলিতে আশ্রয় নিতে হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পূর্বে কৃষ্ণ, ভিম ও অর্জুন ছদ্মবেশে মগধে যান ও সেখানে কৃষ্ণের পরামর্শানুযায়ি ভিম মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে ভিষ্ম কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করায় কৃষ্ণের পিতৃস্বসার ছেলে চেদিরাজ শিশুপাল ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃষ্ণের নিন্দা করেন। পূর্বে কৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ মার্জনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এ বার তিনি চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরচ্ছেদ করেন। পাণ্ডব-কৌরবদের অক্ষক্রীড়া সভায় কৃষ্ণ অনুপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি শাল্বরাজের সৌভনগর বিনষ্ট করতে ব্যস্ত ছিলেন। দ্যূতক্রীড়া সভায় বস্ত্র অপহরণকালে দ্রৌপদি লজ্জা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও হরিকে ডাকেন; তখন স্বয়ং ধর্ম নানা বর্ণের বস্ত্রের রূপধারণ করে তাঁকে আবৃত করেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরুপাণ্ডব উভয়পক্ষই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আসেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। প্রথমে দুর্যোধন কৃষ্ণের শিয়রে একটি উৎকৃষ্ট আসনে এসে বসেন ও পরে অর্জুন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে যুক্ত করে অপেক্ষা করতে থাকেন। কৃষ্ণ জাগ্রাত হয়ে প্রথমে অর্জুন ও পরে দুর্যোধনকে দেখেন এবং উভয় কর্তৃক নিজ নিজ পক্ষে যোগদান করতে অনুরুদ্ধ হন। কৃষ্ণ তখন বললেন যে, যদুও দুর্যোধন আগে এসেছেন, তবু অর্জুনকেই তিনি আগে দেখেছেন। অতএব উভয়পক্ষকেই তিনি সাহায্য করবেন। এক দিকে কৃষ্ণের দশকোটি দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা ও অপর দিকে তিনি স্বয়ং নিরস্ত্র ও যুদ্ধবিমুখ– এ দু পক্ষের মধ্যে নির্বাচনের জন্য বয়ঃকনিষ্ঠ বলে আগে অর্জুনকেই বেছে নিতে বললেন তিনি। অর্জুন কৃষ্ণকেই বরণ করলেন ও দুর্যোধন নারায়ণী সেনা নিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডবদের অনুরোধে কৃষ্ণ একবার শান্তির দৌত্য করেন,

কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই 'ভাগবদ্‌গীতা'। এ যুদ্ধে তিনি বন্ধুভাবে পরামর্শ দিয়ে পাণ্ডবদের জয়ে সাহায্য করেন। দ্রোণ-বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের পরামর্শ ও অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পরামর্শ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভিষ্মের পরাক্রম দেখে তিনি স্বয়ং সুদর্শনচক্র হাতে ভিষ্মকে বধ করতে অগ্রসর হন। ভিষ্ম সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন এবং অর্জুন সানুনয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। ভগদত্তের বৈষ্ণবাস্ত্র নিবারণ করে তিনি অর্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। জয়দ্রথ, দ্রোণ ও কর্ণবধ কৃষ্ণের সাহায্য ভিন্ন সম্পন্ন হতো না। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির নিক্ষেপে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষিৎকে নিহত করলে, কৃষ্ণ তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করে গান্ধারি কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন যে, এ জ্ঞাতিক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ হয়েও যখন কৃষ্ণ তা নিবারণ করেন নি, তখন এ যুদ্ধের ছত্রিশ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংস হবে ও কৃষ্ণের অপঘাত মৃত্যু ঘটবে।

যুদ্ধে জয়লাভের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রথ্যাবর্তন করেন। পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে তিনি পুনরায় হস্তিনাপরে আসেন ও যজ্ঞান্তে আবার দ্বারকায় ফিরে যান।

একবার বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদমুনি দ্বারকায় গেলে যাদবগণ কুবুদ্ধিবশত কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করে ঋষিদের কাছে নিয়ে নিয়ে বলেন যে তিনি বভ্রুর স্ত্রী, তাঁর কি সন্তান হবে। মুনিরা প্রতারণা ধরতে পেরে রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন যে শাম্ব এক লৌহমুষল প্রসব করবে, যদ্দারা যদুবংশ ধ্বংস হবে। পরদিন শাম্ব মুষল প্রসব করেন এবং যাদবগণ সে মুষল চূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবশ্রেষ্ঠগণ কঠোরভাবে নগরে সুরাপান নিষিদ্ধ করেন। ক্রমে চতুর্দিকে নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখে কৃষ্ণ সকলকে সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে গিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য পূজা করতে বলেন ও মাত্র একদিনের জন্য সুরাপানের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। সেখানে প্রচুর সুরাপানে উন্মত্ত যাদবগণ পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে উত্তেজিত সাত্যকি কৃতবর্মার শিরচ্ছেদ করায় সকলে পানপাত্রের আঘাতে সাত্যকি ও কৃষ্ণপুত্র প্রদুম্নকে কৃষ্ণের সম্মুখেই হত্যা করেন। তখন কৃষ্ণ একমুষ্টি তৃণ হাতে নিতেই সে তৃণ লৌহমুষলে পরিবর্তিত হলো এবং তদ্দারা বহু যাদবকে হত্যা করলেন। সেখানকার সমস্ত তৃণই মুষলে রূপান্তরিত হওয়ায় তদ্দারা যাদবগণ

পরস্পরকে হত্যা করে যদুবংশ ধ্বংস করেন। কৃষ্ণ বলরাম বনবাসি হবার সঙ্কল্প করে সারথি দারুককে অর্জুনের কাছে সংবাদ জানিয়ে পাঠান। ইতিমধ্যে বলরাম দেহত্যাগ করেন এবং দূর থেকে ভূমিতে উপবিষ্ট কৃষ্ণকে হরিণভ্রমে এক ব্যাধ পাদমূলে শরবিদ্ধ করায় কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। হস্তিনাপুরে সংবাদ পেয়ে অর্জুন দ্বরকায় এসে কৃষ্ণ প্রভৃতির সৎকার করেন ও যাদব-রমণিদের নিয়ে হস্তিনাপুরে আসেন। দ্বরকা সমুদ্রগর্ভে লীন হয়। পথিমধ্যে অনেক যাদব রমণি দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয় এবং কৃষ্ণবিহীন অর্জুন তার প্রতিকারে অসমর্থ হন। মহাভারতে কৃষ্ণের স্থান অতি উচ্চে। তিনি বিষ্ণুর অবতার। তিনি যদুবংশের রাজা না হয়েও সর্বেসর্বা চালক ছিলেন। নানা প্রক্ষিপ্ত ও অলৌকিক ঘটনায় কৃষ্ণচরিত্র জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কৃষ্ণ বলেছেন যে, যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। তাঁর ধর্মরাজ্য স্থাপনের অন্তরায় ছিলেন শক্তিশালি রাজা জরাসন্ধ ও শিশুপাল। এঁদের দুজনকে নিহত করে কৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে কৌরবদের বিনাশের জন্য পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথি হন এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বররূপে কল্পিত হয়েছেন। তিনি পরমাত্মা ও রাধা তাঁর হলাদিনী-শক্তি। ভক্ত হচ্ছেন জীবাত্মা। বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ, মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধা কৃষ্ণ, গীতার দার্শনিক কৃষ্ণ, বৈষ্ণবদের প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ ও পৌরাণিক কৃষ্ণ মিলে এক অবতারের সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষ্ণা

দ্রৌপদির অন্য নাম। রাজা দ্রুপদ দ্রোণ কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় দ্রোণকে বধ করার জন্য তিনি একটা যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞ হতে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক ছেলে এবং কৃষ্ণা নামে এক মেয়ে জন্মে; এ মেয়েই দ্রৌপদি। (দ্রৌপদি দেখুন; ভাগবত ও মহাভারত)

কেশিনি

(১) সগররাজার অন্যতমা স্ত্রী। তিনি বিদভরাজের মেয়ে। তাঁর গর্ভে অসমঞ্জের জন্ম হয়।

(২) কেশিনি নলরাজার স্ত্রী দময়ন্তির পরিচারিকা। এর সাহায্যে দির্ঘ বনবাসের পর নলের সঙ্গে দময়ন্তির মিলন হয়। (মহাভারত–বন)

(৩) কেশিনি কশ্যপের অন্যতমা মেয়ে। দক্ষের অন্যদমা মেয়ে ও কশ্যপে স্ত্রী কপিলার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়।

(৪) কেশিনি বিশ্বশ্রবা মুনির অন্যতম স্ত্রী। কেশিনির গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহনস করেন। (ভাগবত)

কৈকেয়ি

কৈকেয় রাজকন্যা। অযোধ্যার রাজা দশরথের মধ্যমা স্ত্রী ও ভরতমাতা। দেবাসুরের যুদ্ধে আহত হয়ে কৈকেয়ির সেবায় শিঘ্র আরোগ্য লাভ করে রাজা দশরথ তাঁকে একই সময়ে দুটি বরদানে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু কোন অভাব না থাকায় কৈকেয়ি পরে বর গ্রহণ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ দুটি বর ব্যতীত অন্য বর চাইবার জন্য দশরথের সমস্ত কাকুতি মিনতি ব্যর্থ হলো। কৈকেয়ি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে রইলেন– এ বর তাঁর চাই-ই, অন্যথা তিনি আত্মহত্যা করবেন। রাম বিমাতার মুখে এ কথা শুনা মাত্রই পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনগমন করলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁর অনুগামি হলেন। ভরত তখন মামা বাড়ি। দশরথের ছেলেশোকে মৃত্যু হলো। ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত হতেই পটপরিবর্তন হলো। তিনি স্থির করলেন, রামকে ফিরিয়ে আনবেন এবং মা কৈকেয়িকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। কৈকেয়ি তখন বুঝতে পারলেন, তিনি কত বড় অন্যায় করেছেন। তিনিও ভরতের সঙ্গে রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন।

কৈটভ

প্রলয়-সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্তনাগের দেহের ওপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়। বিষ্ণুর কর্ণমল হতে দু অসুর নির্গত হয়ে কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল অবস্থায় বাস করতে থাকে। ব্রহ্মা এদের দুজনের মধ্যে বায়ু চালনা করে জীবনের সঞ্চার করেন। এদের একজনের শরির কোমল বলে নাম হয় মধু ও অপরের শরিরের গঠন কঠিন বলে নাম হয় কৈটভ। এ দু দানব বলদীপ্ত হয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। ব্রহ্মা সন্ত্রস্ত হয়ে পদ্মনাল কম্পিত করে বিষ্ণুকে জাগরিত করেন। বিষ্ণু দু দানবকে স্বাগত জানিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সহস্রবৎসর যুদ্ধ করেও তারা ক্লান্ত হয় না; তখন তারা বিষ্ণুর ওপর প্রীত হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলে। বিষ্ণু বলেন, লোকহিতার্থে আমি এ বর চাই যে, তোমরা আমার বধ্য হও। এ বাক্য শ্রবণান্তে মধু ও কৈটভ বলে যে, তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ করে এবং এ বর দান করো, আমরা যেনো তোমার ছেলেরূপে জন্মগ্রহণ করি। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলে স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও অনাবৃত স্থান না পেয়ে, আপন অনাবৃত জানুর উপর মধু ও কৈটভের মস্তক সুদর্শনচক্রে ছিন্ন করেন। এ দু দৈত্যের শরির-নিঃসৃত মেদ সাগরজল আবৃত করে পৃথিবীর সৃষ্টি করে। সে জন্য পৃথিবীর নাম হয় মেদিনী।

কৈলাস

পর্বত। মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। মানস সরোবরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হিমালয়ের চূড়া।

কৌশিক

(১) কৌশিক একজন তপস্বি ব্রাহ্মণ। তিনি একদিন বৃক্ষের তলদেশে উপবেশনপূর্বক শাস্ত্রপাঠে রত থাকাকালিন এক বলাকা (স্ত্রী-বক) তাঁর মস্তকোপরী পুরীষ ত্যাগ করে। তিনি তখন রেগে গিয়ে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করা মাত্র উক্ত বলাকা ভস্মিভূত হয়। কৌশিক নিজের কৃতকর্মের জন্য অতিশয় দুঃখিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় ভিক্ষার জন্য এক গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়। কর্মব্যস্ত গৃহিণী তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বরেন। কিন্তু সে সময় গৃহ-প্রত্যাগত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত স্বামিকে দেখে সাধ্বী স্ত্রী ভিক্ষাদান না করেই স্বামির সেবায় রত হন। অতঃপর ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে স্মরণ করে উক্ত নারী লজ্জিত হয়ে ভিক্ষা দিতে যান। কৌশিক ভিক্ষাদানে এ বিলম্ব দেখে অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন। তখন গৃহিণী বলেন যে, স্বামিই আমার পরম দেবতা, সেজন্য তাঁকেই আমি সর্বাগ্রে সেবা করেছি। উত্তরে কৌশিক বলেন যে, তুমি স্বামিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে ব্রাহ্মণকে অপমান করলে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যে পৃথিবী দগ্ধ করতে সক্ষম তা কি তুমি জান? তখন গৃহিণী তাঁকে বললেন যে, পতিসেবাই তাঁর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই তিনি এ ধর্মের ফলে বলাকার মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরেছেন, কৌশিক ধর্মজ্ঞ বটে, কিন্তু তিনি যথার্থরূপে ধর্মের মর্ম জানতে পারেন নি। মানুষের ক্রোধই তার পরম শত্রু– যিনি অক্রোধ ও মোহহীন– দেবতারা তাঁকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ মনে করেন। এরপর গৃহিণী কৌশিককে মিথিলাবাসি ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে ধর্মশিক্ষা করতে নির্দেশ দেন। তখন কৌশিক ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ ও বাবা-মার সেবার ফল সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হন। তারপর গৃহে ফিরে গিয়ে কৌশিক পিতামার সেবায় নিযুক্ত হন। (মহাভারত– বনপর্ব)

(২) কৌশিক জনৈক ব্রাহ্মণ-তপস্বি। গ্রামের কাছে নদীর নিকট বাস করতেন। সদা সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে তিনি সত্যাবাদি নামে খ্যাতিমান হন। একদা দস্যুর ভয়ে কতিপয় ব্যক্তি তাঁর তপোবনে আশ্রয় নেয়। তাদের সন্ধানে দস্যুরা কৌশিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কয়েকজন লোককে এদিকে আসতে দেখেছেন কিনা? কৌশিক তখন প্রতিজ্ঞানুসারে বরেন যে, সে লোকেরা এ বনে আশ্রয় নিয়েছে। তখন দস্যুদল সে ব্যক্তিদের খুঁজে তাঁদের হত্যা করে। ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব না জানার জন্য কৌশিক নরকে গিয়েছিলেন। (মহাভারত)

(৩) মহারাজ কুশের বংশধর বলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কৌশিক বলা হয়।

ক্রোধ

তিনি লোভের পুত্র। তিনি নিজের বোন হিংসাকে বিয়ে করেন। তাঁর পুত্রের নাম কলি ও মেয়ের নাম দিরুক্তি। (ভাগবত)

খাণ্ডবদাহ

পাণ্ডবগণ যমুনাতীরস্থ খাণ্ডবপ্রস্থে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে ইন্দ্রপস্থ নগর স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। একদিন কার্জুন যমুনায় জলবিহারের পরে যমুনাতীরস্থ খাণ্ডববনের সন্নিকটে পানভোজনে রত ছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশে অগ্নি তাঁদের কাছে এসে খাণ্ডববন দগ্ধ করার জন্য তাঁদের সাহায্যাভিলাষী হলেন। শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে বারো বৎসর ঘৃতপান করায় তাঁর অগ্নিমান্দ্য হয়। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন যে, খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণিদের মেদ ভক্ষণ করলে তাঁর অজীর্ণ রোগ দূর হবে। খাণ্ডববন ইন্দ্রের প্রিয় ছিল। অগ্নি এর আগে সাতবার এ বন দগ্ধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সহস্র সহস্র হস্তি শুণ্ড ও নাগ মস্তক সাহায্যে জলসেচন করার ফলে তিনি ব্যর্থ হন। কৃষ্ণার্জুন অগ্নির সাহায্য করতে সম্মত হন, কিন্তু তাঁরা নিরস্ত্র বলে অগ্নি বরুণের নিকট থেকে অর্জুনকে গাণ্ডিব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে কৌমোদকি গদা ও সুদর্শন চক্র দান করেন। সশস্ত্র কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাণ্ডববন দহন করতে সাহায্য করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেন। পনের দিন ধরে অগ্নি এ খাণ্ডববন দগ্ধ করেন। সেখানকার সমস্ত জীবের মধ্যে ময় নামক দানব, তক্ষক নাগের ছেলে অশ্বসেন ও চারটি মাত্র শার্ঙ্গক পক্ষী রক্ষা পায়। (মহাভারত)

গন্ধর্ব

স্বর্গীয় গায়ক। তাঁরা খুবই রূপবান। স্বর্গে এঁদের চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই। তাঁরা ঔষধি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁরা দেবতাদের বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁরা সোমরসের রক্ষাকর্তা ও প্রস্তুতকারক। সোমরস সকল প্রকার রোগ মুক্ত করতে সক্ষম। তাই তাঁদের স্বর্গীয় বৈদ্য বলা হতো। তাঁরা সূর্যের ঘোড়াচালনা করতেন এবং অগ্নি ও বরুণের দাস ছিলেন। গায়ক ও বাদক হিসেবেও তাঁরা দেবতাদের সব উৎসবে যোগ দিতেন। তাঁরা ছিলেন খুবই সঙ্গীত প্রিয়। অপ্সরারা তাঁদের স্ত্রী বা সঙ্গিনী রূপে বাস করতেন। কখনও কখনও সুন্দরি নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বরা পৃথিবীতে আসতেন। তাঁদের নাম থেকেই গান্ধর্ব বিয়ের প্রথা মর্তলোকে প্রচলিত হয়। নারী ও পুরুষের অবাধ যৌণাচারের ফলে যে বিয়ে হয়, তাই

গান্ধর্ব বিয়ে। ১. হাহা, ২. হুহু, ৩. চিত্ররথ, ৪. হংস, ৫. বিশ্ববায়ু, ৬. সোমায়ু, ৭. তুম্বুরু, ৮. নন্দি প্রভৃতি খ্যাতিমান গন্ধর্ব।

গঙ্গা

(১) পুরাকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক রাজা ছিলেন। বিদর্ভরাজমেয়ে কেশিনি ছিলেন তাঁর জৌষ্ঠা রানি এবং কশ্যপের মেয়ে ও গরুড়ের বোন সুমতি ছিলেন কনিষ্ঠা রানি। ছেলেলাভের উদ্দেশ্যে তিনি হিমালয়ে সস্ত্রীক শতবর্ষ তপস্যা করে মহর্ষি ভৃগুর নিকট হতে বর লাভ করেন যে, এক স্ত্রীর বংশধর এক ছেলে হবে এবং অন্যের হবে কীর্তিমান ষাট হাজার ছেলে। কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক পুত্রের জন্ম দেন এবং সুমতি-প্রসূত একটি তুম্বাকার পিণ্ড হতে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হয়। ছেলেরা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, সগররাজা অশ্বমেধযজ্ঞ করতে উদ্যত হন। যজ্ঞাশ্ব বহির্গত হলে ইন্দ্র রাক্ষসরূপ ধারণ করে ঘোড়াটি অপহরণ করেন। সগরের আদেশে তাঁর ষাট হাজার ছেলে সর্বত্র অনুসন্ধান করেও যখন অশ্বের কোন সন্ধান পেলেন না, তখন তারা ধরিত্রিকে খনন করতে লাগলেন। তাতেও অশ্বের সন্ধান না পাওয়ায় বিফল মনোরথ হয়ে তারা সগরের কাছে প্রত্যাবর্তন করল। সগর রেগে গিয়ে পুনর্বার পৃথিবী খনন করতে বললেন। তখন সগর-ছেলেগণ বহু কষ্টে পৃথিবী খনন করে পাতালে কপিলরূপি বাসুদেবের আশ্রমে গিয়ে ঘোড়াটি দেখতে পেয়ে তাঁকে ঘোড়াপহারক মনে করে শাস্তি দিতে গেল। তাতে কপিল সক্রোধ হুংকার দিতে ষাট হাজা সগর-সন্তান ভস্মিভূত হয়ে যায়। ছেলেদের প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব দেখে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে ঘোড়া ও তাঁর ছেলেদের অনুসন্ধানে পাঠান। কপিলমুনির আশ্রমে তিনি কাকাদের ভস্মস্তূপ ও যজ্ঞাশ্বের সন্ধান পান। তিনি কাকাদের ধ্বংসের বিবরণ জ্ঞাত হন এবং আরো জ্ঞাত হন যে, স্বর্গ হতে গঙ্গাবতরণকালে গঙ্গার জল এ ভস্মের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তাঁরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্বর্গে যাবেন। অতঃপর অংশুমান অযোধ্যায় ঘোড়া এনে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। সগররাজা গঙ্গা আনয়নের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন, কিন্তু ত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্বের পরও তিনি উক্ত কর্মে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন না। তাঁর পৌত্র অংশুমান ও অংশুমানের ছেলে দিলীপও এ কার্যে অকৃতকার্য হন। দিলীপের ছেলে ভগীরথ নানা প্রকার কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে স্বর্গ হতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নের অনুমতি পান; কিন্তু গঙ্গার অবতরণকালে তাঁকে ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর পৃথিবীতে কারও ছিল না। ভগীরথ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে, মস্তকোপরি গঙ্গার স্রোত ধারণে তাঁকে সম্মত করান। ব্রহ্মার আদেশে গঙ্গা ভীষণ

বেগে শিবের মস্তকে পতিত হয়ে তাঁকে পাতালে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হন। এতে মহাদেব রেগে গিয়ে তাঁর জটা জালের মধ্যে গঙ্গাকে বিদ্ধ করেন। ভগীরথ তখন পুনরায় তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করল, মহাদেব জটা থেকে মুক্ত করে বিন্দু সরোবরে ত্যাগ করেন। গঙ্গা তখন পশ্চিমে হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, পূর্বে সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু ও ভাগীরথের পশ্চাতে এক স্রোত– এ সাতটি স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকেন। গঙ্গার গতিপথে জহ্নু মুনির আশ্রম ও যজ্ঞের উপকরণাদি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ জহ্নু তাঁর সমস্ত জল পান করে ফেলেন। তখন দেবতারা পুনর্বার তপস্যা প্রভবে জহ্নু মুনিকে সন্তুষ্ট করায় তিনি কর্ণদ্বারা গঙ্গাকে মুক্ত করেন। সে থেকে গঙ্গা সমুদ্র অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সমুদ্রে পতিত হওয়ার পর ভগীরথকে অনুগমন করে পাতালে প্রবেশের পর সগরের ষাট হাজপর সন্তানের ভস্মরাশি প্লাবিত করে গঙ্গা তাঁদের মুক্তি আনয়ন করেন। ব্রহ্মার বরে গঙ্গা ভগীরথের জ্যেষ্ঠা দুহিতা ও তাঁর নাম ভাগীরথী হয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এ তিন পথে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম ত্রিপথগা।

(২) গঙ্গা দেবর্ষি নারদ নানা রাগ-রাগিণীযুক্ত সঙ্গীতে অভিজ্ঞ; কিন্তু তাঁর ত্রুটির জন্য সঙ্গীতের তাল ভঙ্গ হয়ে যায়। নারদ নিজের অনভিজ্ঞা বুঝতে পারেন না। তাই নারদের গর্ব খর্ব করার জন্য রাগ-রাগিণীরা বিকলাঙ্গ নর-নারীর আকারে পথে পড়ে থাকে। নারদ এ পথে গমনকালে তাদের এ বিকলাঙ্গতার কারণ জিজ্ঞাসা করে নিজের অনভিজ্ঞতা ও ত্রুটির কথাই জানতে পারেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কি উপায়ে তোমাদের বিকলাঙ্গতা দূর হবে? উত্তরে তারা দেবর্ষিকে জানায় যে, মহাদেব স্বয়ং এসে সঙ্গীত শোনালে তারা আবার তাদের পূর্ব-দেহ ফিরে পাবে। তখন নারদ মহাদেবের নিকট এ কথা জ্ঞাপন করেন। মহাদেব এতে সম্মত হন, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাঁর সঙ্গীতের জন্য প্রকৃত শ্রোতা চাই। তা না হলে তিনি সঙ্গীতচর্চা করবেন না। নারদ অবগত হরেন যে, তিনি প্রকৃত শ্রোতা হবার উপযুক্ত নন। তখন মহাদেবকে প্রকৃত শ্রোতার নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নাম করেন। তপস্যার পুণ্যবলে নারদ মহাদেবের সঙ্গীত শোনবার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে নিয়ে আসেন। মহাদেবের সঙ্গীত কিছুকাল শ্রবণ করার পর রাগ-রাগিণীরা সুস্থতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মা মহাদেব দ্বারা গীত সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে অসমর্থ হন। বিষ্ণু তাঁর সঙ্গীতের মর্ম কিছুটা গ্রহন করতে পেরেছিলেন, সে কারণ তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা সঙ্গীতে একাগ্র হতে পারেন নি, সে জন্য তিনি তাঁর কমণ্ডলুতে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করলেন। সে দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। তার পরে ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে গঙ্গা কেমন করে মর্ত্যে নেমে এলেন।

(৩) পর্বতরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী সুমেরু-দুহিতা মেনকার দু মেয়ে উমা ও গঙ্গা। কোন বিশেষ কারণে দেবতারা হিমালয়ের নিকট হতে গঙ্গাকে ভিক্ষা করে নেন। এ গঙ্গায় তা ধারণ করতে নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু গঙ্গা তা ধারণ করতে অসমর্থ হওয়ায় হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে শরবনে মহাদেব তা নিক্ষেপ করেন। দেবতা ও ঋষিরা এ রেতঃরক্ষার জন্য ছটি কৃত্তিকাকে প্রেরণ করেন। কৃত্তিকারা এ রেতঃ পান করে গর্ভধারণ করে গর্ভস্থ ভ্রূণকে পোষণ করতে থাকেন ও তাঁরা ছটি ছেলে প্রসব করেন। ছ-ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এক হয়ে যায়। এ ছেলে কৃত্তিকাগণ দ্বারা পালিত হন ও তাঁর নাম হয় কার্তিকেয়। নিজের গর্ভ নিক্ষেপের পর গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান গ্রহণ করেন। সগর বংশিয় ভগীরথ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করেন।

(৪) গঙ্গা কুরুরাজ শান্তনুর স্ত্রী ও দেবব্রত ভিষ্মের মা। একবার মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মহাতেজা বসুগণের পক্ষে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে উঠলে তাঁরা গঙ্গার কাছে তাঁদের জন্ম ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এ প্রার্থনা পূরণ করার জন্য গঙ্গা অপূর্ব নারীমূর্তিতে রাজা শান্তনুকে আকৃষ্ট করে তাঁর অনুনয়ে এক শর্তাধীনে শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেন। শর্ত এ ছিল যে, রাজা শান্তনু গঙ্গার কোন কার্যে বাধা দিলে সে মুহূর্তেই গঙ্গা তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করবেন। এ শর্তে গঙ্গা শান্তনুর স্ত্রী হয়ে সাত পুত্রের মা হন এবং জন্মমাত্রই প্রত্যেকটিকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু অষ্টম ছেলে প্রসব হতেই শান্তনু এ পুত্রের প্রাণবধে বাধা দেন। রাজার এ নিয়মভঙ্গের অপরাধে গঙ্গা বিদায় নিলেন ও বিদায়কালে তাঁর আত্মপরিচয় ও কর্মের হেতু জানিয়ে রাজআজ্ঞায় নবজাত শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং ছত্রিশ বৎসর পরে রাজোচিত শিক্ষা দিয়ে ছেলেকে শান্তনুর হাতে অর্পণ করেন। গঙ্গার এ ছেলে দেবব্রত ভিষ্ম নামে জগতে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন। (মহাভারত– আদি)

(৫) একবার গঙ্গা সোমবংশিয় রাজা জহ্নুকে পতিরূপে বরণ করার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু জহ্নুর এতে মত ছিলো না। সে কারণ, গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞস্থল জলে প্লাবিত করে। রাজা জহ্নু এতে রেগে গিয়ে গঙ্গাকে গলাধঃকরণ করে ফেলেন। তখন মহর্ষিরা গঙ্গাকে তাঁর মেয়েরূপে স্থির করে দেয়ায় তিনি গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সে থেকে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবি। (হরিবংশ)

(৬) গঙ্গার জন্ম বিষ্ণুর দেহ থেকে হয়। তিনি বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণুর তিন স্ত্রীর নাম যথাক্রমে– লক্ষ্মী, সরস্বতি ও গঙ্গা। এক সময়ে বিষ্ণু গঙ্গার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এতে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে ক্ষামা করলেও সরস্বতি তা সহ্য করতে অক্ষম হন। ফলে গঙ্গা ও সরস্বতির মধ্যে বিরোধ ও কলহের সৃষ্টি হয়। সরস্বতি

গঙ্গাকে শাপ দেন যে, 'তুমি নদীরূপে পরিণত হও'। গঙ্গাও সরস্বতিকে অনুরূপ শাপ দেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

(৭) একবার গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাভিলাষিণী হন। শ্রীকৃষ্ণও গঙ্গার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রাধা এতে রেগে গিয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন ও গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করতে উদ্যত হন। গঙ্গা তা জ্ঞাত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেন। এতে সমস্তা পৃথিবী জলশূন্য হবার উপক্রম হয়। তখন দেবগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তখন গঙ্গাকে তাঁর নখাগ্র হতে নিষ্ক্রান্ত করে দেন। সে থেকে গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদি। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ গঙ্গাকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

গঙ্গাধর

গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন বলে শিবের অন্য নাম গঙ্গাধর। পিতৃপুরুষের মুক্তির জন্য ভগীরথ স্বর্গ হতে ব্রহ্মার কৃপায় গঙ্গাকে আনবার অনুমতি পেলেন। কিন্তু গঙ্গাকে ধারণ করার ক্ষমতা এক মহাদেব ছাড়া আর কারও ছিলো না। তাই ভগীরথের কঠোর তপস্যায় মহাদেব তাঁর মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করেন।

গদ

তিনি যদুবংশিয় বীর। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভাই। যদুবংশ ধ্বংসের সময় তিনি নিহত হন।

গণেশ

(১) দেবতা বিশেষ। শিব ও পার্বতীর ছেলে। গণেশ সিদ্ধিদাতা। সকল কর্মের প্রারম্ভে গণেশের পূজা করা হয়। তাঁর খর্বাকৃতি দেহ, ত্রিনয়ন, চার হাত এবং হাতির মতো মাথা। এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, তৃতীয় হাতে গদা ও চতুর্থ হাতে মুষিক বৃষরূপধারি ধর্মের অবতার; মহাবল ও পূজা-সিদ্ধির অনুকূল। গণেশ মঙ্গল ও সিদ্ধির পিতা। তাই তিনি সকল দেবতার আগে পূজিত হন। দক্ষযজ্ঞে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের মেয়ে পার্বতীরূপে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় পার্বতী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুণ্যকব্রত অনুষ্ঠান করেন। এক বৎসর পুণ্যকব্রত করার পর বিষ্ণু প্রীত হয়ে পার্বতীকে ছেলেলাভের বর দেন। যথাসময়ে বিষ্ণুর বরে পার্বতীর এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। দেবতারা স্বর্গ.

মর্ত, পাতাল ইত্যাদি সকল স্থান হতে নবজাতক শিশুকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবতদার সঙ্গে শনিও আসেন। শনির স্ত্রী শনিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি যার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, তারই বিনাশ হবে। এসেই শাপ স্মরণ করে শনি এ নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অধোমুখে ছিলেন, কিন্তু পার্বতী শনিকে তাঁর পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বারংবার অনুরোধ করেন। উত্তরে শনি বলেন যে, আমি চিত্ররথের মেয়েকে বিয়ে করি। একদিন আমার স্ত্রী ঋতুস্নান করে আমার সঙ্গম প্রার্থনা করে, কিন্তু তখন আমি এমনই ধ্যানমগ্ন ছিলাম যে, স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করি নি। ফলে ঋতু বিফলে যাওয়ায় আমার স্ত্রী আমাকে শাপ দেন যে, আমি যার দিকে দৃষ্টিপাত করবো তৎক্ষণাৎ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সমস্ত বিবরণ শুনেও পার্বতী শনিকে তাঁর নবজাতকের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে বলেন। শনি শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র শিশুর মুণ্ড দেহচ্যুত হয়। এ সংবাদ বিষ্ণুর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসেন। প্রথমে পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তি দেখে সুদর্শনচক্রের সাহায্যে তার মাথা কেটে নিয়ে আসেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। গণেশ যাতে সকলের কাছে অনাদৃত না হন, সেজন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে, প্রথমে গণেশের পূজা না হলে তাঁরা কেউই কোন পূজা গ্রহণ করবেন না। তাই প্রত্যেক দেবকার্যে ও পিতৃকার্যেও প্রথমে গণেশ পূজিত হন।

(২) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে শিবের প্রতি কশ্যপের অভিশাপের ফলে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ হয়। একবার সূর্য মালি ও সুমালি নামে দু শিবভক্তকে বধ করতে উদ্যত হলে শিব সূর্যকে ত্রিশূলাঘাত করেন। এ আঘাতের ফলে সূর্য চেতনাহীন হন। এর ফলে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়। সূর্যের পিতা মহর্ষি কশ্যপ ছেলেকে হতচেতন অবস্থায় দেখে শিবকে অভিশাপ দেন যে, তাঁর পুত্রের মস্তক ছিন্ন হবে। এ অভিশাপের ফলে গণেশ নিজের মুণ্ড হারান ও ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তির মস্তক তাঁর মস্তকোপরি স্থাপন করে দেয়া হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গণেশের একটি দাঁত সম্বন্ধে এরূপ বৃত্তন্ত আছে– পরশুরাম ত্রিসপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কৈলাসে আসেন। তখন শিব ও পার্বতি অন্তঃপুরে নিদ্রিত ছিলেন। গণেশ দ্বাররক্ষক হয়ে পরশুরামকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেন। বাধা দেয়ায় গণেশ ও পরশুরামের মধ্যে ভিষণ যুদ্ধ হয়। পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উৎপাটিত হয়। তাই গণেশকে একদন্ত বলা হয়।

(৩) স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে এরূপ উপাখ্যান আছে যে, সিন্দূর নামে এক দৈত্য পার্বতির গর্ভে অষ্টম মাসে প্রবেশ করে গণেশের মস্তক কর্তন করে। এতে বালকের জীবননাশ হয় না। জন্মগ্রহণ করার পর নারদ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, গণেশ এ বিবরণ জানান। তখন নারদ তাঁকে নিজেই নিজের মস্তক সংগ্রহ করতে বলেন। বালক তখন আপন তেজে গজাসুরের মাথা কেটে নিজের দেহে যোগ করেন। সে হতে গণেশের নাম হয় গজানন।

(৪) গণেশ-জন্মের আর একটি উপাখ্যান এ যে, পার্বতির দিব্য গাত্র-মল থেকে গণেশের জন্ম হয়। মহাদেব পার্বতিকে প্রীত করার জন্য একটি গজমস্তক তাঁর মস্তকহীন দেহে সংশ্লিষ্ট করেন। মহাদেবের করুণায় তিনি সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন এবং মা পার্বতিকে প্রদক্ষিণ করে পাদবন্দনা দ্বারা আপন মহিমা ও পরম জ্ঞান-ভক্তি প্রকাশ করেন। পার্বতী ও মহাদেবের বরে তিনি গণের অধিপতি, বিঘ্ন-বিনাশক ও সর্বসিদ্ধিদাতা রূপে গণ্য হন।

গণেশ সর্বদা তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। তুলসি এঁকে পতিরূপে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু গণেশ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বিকল-চিত্তের জন্য দানব-পত্নী হবেন বলে অভিশাপে বিয়ে-বিরত গণেশকে পুষ্টি নামক এক মেয়েকে বিয়ে করতে হয়।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থের লিপিকারের অভাবে চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে গণেশের শরণাপন্ন হতে বলেন। গণেশ মহাভারতের লেখক হতে সম্মত হন কএক শর্তে। শর্তটি হচ্ছে– তিনি যখন মহাভারত লিখতে আরম্ভ করবেন, তখন লেখার আর কোন বিরতি ঘটতে দেয়া হবে না। ব্যাসদেবও গণেশকে এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নেন যে, কোন শ্লোকলেখার পূর্বে তার সম্পূর্ণ অর্থ গণেশকে ভাল করে বুঝে তবে লিখতে হবে। এতে ব্যাসদেবের সুবিধাই হয়। তিনি দুরূহ শ্লোক সৃষ্টি করে গণেশের লেখায় মাঝে মাঝে দেরি করিয়ে দিতেন এবং সে অবসরে নতুন নতুন শ্লোক তৈরি করে ফেলতেন। এ ভাবে সমগ্র মহাভারত লিখিত হয়।

গয়

(১) গয় সুগ্রীবের বানর অনুচর। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি অসংখ্য বানর সেনার সঙ্গে সীতার খোঁজে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। (রামায়ণ)

(২) গয় একজন ধার্মিক রাজা। তিনি রাজা অমূর্তরয়ের ছেলে। তিনি শতবর্ষ পর্যন্ত কেবল আহুতি-অবশিষ্ট খেয়ে অগ্নির উপাসনা করতেন। এতে অগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে গয়কে বর দিতে চান। গয় বর প্রার্থনা করেন, তিনি যেনো বেদ অধ্যয়ন করার অধিকার পান। অগ্নি তাঁকে এ বর দান ক'রে প্রস্থান করেন।

অগ্নির বরে গয় পৃথিবীর ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। দিন দিন ধর্মনিষ্ট হতে থাকেন। এরপর তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গয়ের যজ্ঞফলে যে একটি বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তা অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ।

(৩) গয় খ্যাতিমান বিষ্ণুভক্ত অসুর। এর নামানুসারেই গয়াতীর্থের নামকরণ হয়েছে। বিষ্ণুর নিকট হতে বরলাভের জন্য অসুর গয় কঠোর তপস্যায় রত হয়। এর কঠোর তপস্যায় দেবতারা ভীত হয়ে পড়েন, পাছে তাঁদের নিজ নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এর একটা বিধান প্রার্থনা করেন। ঠিক হয় যে, গয়কে একটি বর দান করে, তপস্যা হতে বিরত করানো। গয় রাজ্য ও ঐশ্বর্য না চেয়ে বললে, আমার শরির যেনো ব্রাহ্মণ, তীর্থশিলা, দেবতা, মন্ত্র, যোগী প্রভৃতি সমস্ত পবিত্র পদার্থ থেকেও পবিত্র হয়। বরলাভ করে এর দেহ দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগি, কর্মি ও ধর্মীদের চেয়েও পবিত্রতম হয়। এর পবিত্র দেহ দর্শন মাত্র সকলে বৈকুণ্ঠে গমন করতে থাকে, ফলে দেশ জনশূন্য হয়ে যায়। যমপুরিতে যাবার লোকের অভাব ঘটে। যম এ বিবরণ বিষ্ণুকে জ্ঞাপন করলে, দেবতারা গয়াসুরকে নিশ্চল করার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন। একদিন দেবতারা গয়াসুরের কাছে গিয়ে তার শরির ভিক্ষা করেন। গয়াসুর সম্মত হওয়ায় এক প্রকাণ্ড শিলা তার উপর স্থাপন করে দেবতারা সে শিলার উপর অবস্থান করেন। এতেও গয়াসুর নিশ্চল না হওয়ায় বিষ্ণুর তার বক্ষোপরি স্থাপিত শিলায় আসীন হন। তখন গয়াসুর সমূহ ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে নিশ্চল অবস্থায় দেবতাদের বলে যে, তার সঙ্গে এ কৌশলের কোন আবশ্যক ছিল না; কারণ, সে কখনো দেবগণের অবাধ্য হয় নি। দেবতারা গয়াসুরের বিনয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রদানে সম্মত হন। তখন গয়াসুর এ বর প্রার্থনা করে যে, যে পর্যন্ত চাঁদ, সূর্য বা পৃথিবী থাকবে, সে পর্যন্ত দেবতারা তার বুকের উপর স্থাপিত থাকবেন। এ রূপে গয়া অতি খ্যাতিমান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

গরুড়

মহর্ষি কশ্যপ স্ত্রীদের বর দিতে ইচ্ছুক হলে কদ্রু ছেলেরূপে বলশালি সহস্র নাগ প্রার্থনা করলেন। আর বিনতা কদ্রুর পুত্রের চেয়ে বলবান ও তেজস্বি দু ছেলে প্রার্থনা করলেন। যথাকালে কদ্রু এক সহস্র ও বিনতা দুটি ডিম প্রসব করলেন। বিনতার ডিম থেকে কিছুই বের হলো না। তখন বিনতা একটি ডিম ভেঙ্গে দেখলেন। তাঁর সন্তানের উর্ধ্বভাগ পরিণত, কিন্তু নিম্নভাগত অপরিণত অবস্থায় রয়েছে। সে ছেলে রেগে গিয়ে মাকে শাপ দিলেন। যেহেতু মার লোভের বশে

তাঁর দেহ অসম্পূর্ণ হল, সে জন্য তাঁর মাকে পাঁচশত বৎসর বিমাতা কদ্রুর দাসি হয়ে থাকতে হবে। অন্য ডিমটি অসময়ে না ভাঙ্গলে তা থেকে আর এক ছেলে বের হয়ে মার দাসিত্ব মোচন করবেন। বিনতার অপর ডিম ভেদ করে বিশাল দেহ গরুড় নির্গত হলেন। মার নিকট তাঁর দাসিত্বের ইতিহাস জানতে পেরে তিনি নাগদের নিকট তাঁর মার দাসিত্ব থেকে মুক্তির উপায় জানতে চাইলে নাগেরা বললেন যে, তিনি যদি আপন বীর্যবলে অমৃত আনতে সক্ষম হন, তবেই তাঁর মার মুক্তিলাভ সম্ভব হবে। গরুড় তখন নানা দুঃসাহসিক কাজ করে নানা বিপদের মধ্য দিয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ জয় করে দেবলোক থেকে অমৃত এনে মাকে মুক্ত করেন।

গান্ধারি

গান্ধার দেশের রাজা সুবলের মেয়ে, ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী ও দুর্যোধনাদির মা। গান্ধারদেশের মেয়ে বলে তাঁর নাম গান্ধারি। গান্ধার-রাজ সুবল গান্ধারিকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করতে ইচ্ছা করে যথাসময়ে বিয়ে দেন। গান্ধারি সুন্দরি ও শিক্ষিতা হলেও, মাতাপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি না করে, জন্মান্ধ স্বামির হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। জন্মান্ধ স্বামিকে অতিক্রম করবেন না, এ প্রতিজ্ঞা করে গান্ধারি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সর্বদা নিজের চোখ বেঁধে রাখতেন। ব্যাসদেব বর দিয়েছিলেন যে, গান্ধারির শত ছেলে হবে। যথাকালে গান্ধারি গর্ভবতি হলেন, কিন্তু দু বৎসরের পরেও তাঁর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। এদিকে কুন্তির সূর্যতূল্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে শুনে দুঃখিত হয়ে, ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে গান্ধারি নিজের গর্ভপাত করেন। ফলে, তাঁর গর্ভ হতে একটি লৌহ-কঠিন মাংসপিণ্ড নির্গত হলো। গান্ধারি তা অচিরাৎ বিনষ্ট করতেন, কিন্তু ব্যাসদেবের পরামর্শে তিনি সে মাংসপিণ্ড শীতল জলে সিক্ত ক'রে একশত ভ্রূণে বিভক্ত করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘৃতপূর্ণ কলসিতে রাখা স্থির করেন। এর একবৎসর পরে দুর্যোধন এবং এক বৎসর এক মাসের মধ্যে দুঃশাসন, দুঃসহ প্রভৃতি শত ছেলে ও দুঃশলা নামে একটি মেয়ের জন্ম হয়। কপট-দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও দ্রৌপদিকে সভামধ্যে অপমানিত করার পর গান্ধারি একাধিকবার দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ছেলেস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সে অনুরোধের কোন ফল হয় না। নিজ পুত্রের অন্যায় আচরণের জন্য গান্ধারি কোনদিন দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে ক্ষমা করতে পারেন নি। একমাত্র দুর্যোধন হতেই যে কৌরবকুল ধ্বংস হবে, তা তিনি পূর্বেই জ্ঞাত হন এবং সে জন্যই ছেলেকে ত্যাগ করার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেন। পণ-মুক্ত পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান করে সন্ধিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন গান্ধারি। বার বৎসর

বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবগণ যখন তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করেন, তখন গান্ধারি রাজসভায় এসে দুর্যোধনকে সন্ধির উপদেশ দিয়ে তিরস্কার করে বলেন যে, ধর্মহীন ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির চেষ্টা পরিণামে মৃত্যু আনয়ন করে। কিন্তু দুর্যোধন মাতৃবাক্য অবজ্ঞা করে সভা ত্যাগ করেন। গান্ধারির হিতবাক্য বৃথাই যায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন যখন মা গান্ধারির কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে আসেন, তখন তিনি শুধু এ কথাই বলেন যে, 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ।' অর্থাৎ যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়। আঠারো দিন যুদ্ধের প্রত্যেকদিন এ কথা তিনি দুর্যোধনকে শুনিয়ে এসেছেন। আঠারো দিন যুদ্ধের পর এগারো অক্ষৌহিণী কৌরব সেনা ধ্বংস হলে, এবং গদাযুদ্ধে ভগ্নজানু দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রাণ ত্যাগ করলে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। কৃষ্ণ গান্ধারিকে বলেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গান্ধারির মহাবাক্য 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ' সপ্রমাণ হয়েছে; সুতরাং গান্ধারি যেনো শোক হতে নিবৃত্ত হন। কৃষ্ণের বাক্যে গান্ধারি কিয়ৎকাল প্রকৃতিস্থ থেকে, পরে কৃষ্ণের সম্মুখেই আপন পরিধেয় বস্ত্রে মুখ আবৃত করে ছেলেশোকে বিলাপ করতে থাকেন। শতছেলেহারা গান্ধারি ধৃতরাষ্ট্র ও পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে রণভূমিতে আসেন ও দিব্যচক্ষে রণভূমির ধ্বংসলীলা দেখে পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন বেদব্যাস এসে তাঁকে শান্ত করেন এবং ভিম তাঁর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। অবশেষে গান্ধারি সক্রোধে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাভিলাষী হন। কম্পিত কলেবরে যুধিষ্ঠির এসে কৃতাঞ্জলিপুটে গান্ধারির অভিশাপ নিতে প্রস্তুত হন এবং বলেন যে, ইনিই তাঁর ছেলেহপ্তা, তাঁতে শাপ দিলে তিনি তা মাথা পেতে নেবেন। এ বলে যুধিষ্টির গান্ধারির পাদস্পর্শ করতে অবনত হলে, গান্ধারি তাঁর চক্ষুর আবরণবস্ত্রের অন্তরাল হতে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখতে পান। ফলে, যুধিষ্ঠিরের নখগুলি কুৎসিত হয়ে যায়। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এ যুদ্ধ নিবারণ না করায়, কৃষ্ণকে গান্ধারি এ বলে অভিশাপ দেন যে, পতিসেবা ফলে অর্জিত পুণ্যের বলে আমি তোমাকে অভিসম্পাত করছি যে, আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে তুমিও ছেলে, বন্ধু ও স্বজন হারিয়ে বনমধ্যে নিকৃষ্টভাবে নিহত হবে এবং যাদবনারীগণও কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় নারীদের মতো ক্রন্দন করবে। গান্ধারির এ অভিসম্পাত যথাকালে কার্যকরি হয়েছিলো।

পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের পর পনের বৎসরকাল ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারি পাণ্ডবদের আশ্রয়ে বাস করেন। পাণ্ডবগণ সর্বপ্রকারেই তাঁদের সম্মান করতেন। কেবল ভিম গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করতেন ও তাঁর অপ্রিয় কার্য করতেন। অবশেষে গান্ধারি ও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে গঙ্গাতীরে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে আসেন। কুন্তি, বিদুর কৌরব রমণিগণও তাঁদের সঙ্গে

আসেন। এখানে আশ্রম নির্মাণ করে গান্ধারি সকলের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। ব্যাসদেব একদিন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে গান্ধারির অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের শোক লাঘবের জন্য তিনি তাঁর অলৌকিক তপস্যা বলে কুরুক্ষেত্রের সমূহ যোদ্ধাদের একদিনের জন্য পুনর্জীবিত করে সকলকে দেখান। বনবাসকালে গান্ধারি কেবলমাত্র জল পান করে তপস্যা করতেন। অবশেষে বাণপ্রস্থের তৃতীয় বৎসর তাঁরা অরণ্যে প্রবেশ করে বাস করতে থাকেন। একদিন অকস্মাৎ সেখানে দাবানল প্রজ্বলিত হয় এবং সে দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তি সমভিব্যাহারে পূর্বাস্য হয়ে উপবেশনপূর্বক গান্ধারি প্রাণ বিসর্জন করেন।

গালব

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য। অধ্যয়ন ও গুরুর পরিচর্যা সমাপনান্তে শিষ্য গালবকে বিশ্বামিত্র গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। তখন গালব গুরুদক্ষিণা দিতে চান এবং বার বার গুরুদক্ষিণা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করায় বিশ্বামিত্র রেগে গিয়ে বলেন যে, তিনি আটশত এমন ঘোড়া গুরুদক্ষিণা চান, যাদের কান্তি চন্দ্রের মতো শুভ্র এবং একটি কর্ণ শ্যামরঙ। এতে গালব চিন্তিত হয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন। তখন গালবের বন্ধু গরুড় এসে তাঁকে সাহায্য করতে চান। অবশেষে রাজা যযাতির কাছে গিয়ে গরুড় গালবের গুরুদক্ষিণার জন্য ঘোড়া প্রার্থনা করেন। আগের মতো তিনি এখন আর ধনবান নন বলে যযাতি এতগুলি ঘোড়া গালবকে দান করতে অসমর্থ হন; কিন্তু অন্য রাজা গালবের এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন। রাজা যযাতি গালবের হাতে তাঁর মেয়ে মাধবিকে দান করে বলেন যে, এ মেয়েকে নিয়ে রাজাদের হাতে সমর্পণ করলে মেয়ের শুল্কস্বরূপ তাঁরা আটশ ঘোড়া নিশ্চয় তাঁকে দান করবেন ও তিনিও দৌহিত্র লাভ করবেন। তখন গালব মাধবিকে নিয়ে অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে যান। সন্তানার্থী রাজা হর্যশ্ব বলেন যে, শুল্কস্বরূপ দানের মতো তাঁর মাত্র দু শ ঘোড়া আছে, এবং তিনি এ মেয়ের গর্ভে একটি ছেলে উৎপাদন করতে চান। তখন মাধবি গালবকে বলেন যে, "এক মুনি আমাকে বর দিয়েছেন, তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার কুমারি হবে। অতএব আপনি দু শ ঘোড়া গ্রহণ করে আমাকে তাঁর হাতে দান করুন। এর পরে আরো তিন জন রাজার কাছে আমাকে দান করলে আপনার আট শ ঘোড়া পূর্ণ হবে এবং আমারও চার ছেলে লাভ হবে।" এ কথা শুনে গারব হর্যশ্বের হাতে মাধবিকে দান করে দু শ ঘোড়া গ্রহণ করেন। যথাকালে হর্যশ্ব বসুমনা নামে একটি ছেলেলাভ করেন। তখন রাজার কাছে এসে গালব প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবিকে প্রত্যর্পণ করতে বলেন। হর্যশ্ব মাধবিকে প্রত্যর্পণ করলে মাধবিও পুনারায় কুমারি হন। তারপর গালব মাধবিকে একে একে

কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে নিয়ে যান। তাঁরাও প্রত্যেকে দু শ ঘোড়া দিয়ে মাধবির গর্ভে ছেলে উৎপাদন করেন। তাঁদের ছেলেদের নাম হয় প্রত্যর্দন ও শিবি।

এরপর গরুড় গালবকে বলেন যে, মহর্ষি ঋচিক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এরূপ সহস্র ঘোড়া শুল্ক দিয়ে তাঁর মেয়ে সত্যবতিকে বিয়ে করেছিলেন। এর মধ্যে থেকে হর্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর প্রত্যেকে দুশত করে ঘোড়াক্রয় করেন। অবশিষ্ট চার শ ঘোড়া পথে চুরি হয়। সে কারণ, অবশিষ্ট চার শ ঘোড়া আর পাওয়া যাবে না; এ ছ-শ ঘোড়াই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও। অতঃপর বিশ্বামিত্রের কাছে গমন করে গালব এ ছ-শ ঘোড়া দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করতে বলেন এবং অবশিষ্ট দু শ অশ্বের পরিবর্তে মাধবিকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনজন রাজর্ষি মাধবির গর্ভে তিনটি ধর্মছেলে উৎপাদন করুন। বিশ্বামিত্র মাধবিকে গ্রহণ করেন এবং যথাকালে অষ্টক নামে মাধবির অপর একটি ছেলে হয়। পরে বিশ্বামিত্র এ ছেলেকে ধর্ম, অর্থ ও ঘোড়াগুলি দান করে এবং শিষ্য গালবের হাতে মাধবিকে গরুড়ের পরামর্শ নিয়ে মাধবিকে তাঁর বাবা যযাতির হাতে প্রত্যর্পণ করে বনে তপস্যা করতে প্রস্থান করেন। যযাতি মাধবির জন্য স্বয়ংবর সভার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু মাধবি প্রত্যাখ্যান করে তপোবনে ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন করে ধর্মসঞ্চয় করতে থাকেন। (মহাভারত)

গাণ্ডিব

অর্জুনের ধনুক। কথিত আছে, ব্রহ্মা-নির্মিত এ ধনুক প্রথমে পেয়েছিলেন চন্দ্র, পরে চন্দ্র হতে বরুণ এর কর্তৃত্ব পান। এরপর খাণ্ডববন দাহের সময় অগ্নির প্রার্থনায় বরুণ এ ধনুক অর্জুনকে দান করেন। গণ্ডারের মেরুদণ্ড দিয়ে প্রস্তুত বলে এর নাম গাণ্ডীব। এ ধনুর অধিকারি বলে অর্জুনকে গাণ্ডীবী বলা হয। এ ধনুর সাহায্যেই অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদি কেউ তাঁকে গাণ্ডীব ত্যাগ করে অন্যকে দান করতে বলেন, তবে তিনি তাঁর শিরচ্ছেদ করবেন। কুরুক্ষেত্রের সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধে কর্ণের হাতে নিপীড়িত হয়ে এবং অর্জুনকে তাঁর প্রতিকারে অসমর্থ দেখে, যুধিষ্ঠির রেগে গিয়ে অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেন যে, এ গাণ্ডীব কেশব বা অন্য কোন উপযুক্ত রাজার হাতে অর্পণ কর। তাতে অর্জুন রেগে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের শিরচ্ছেদের জন্য খড়্গ গ্রহণ করলে কৃষ্ণ বলেন যে, অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন করে কিঞ্চিৎ অপমান করেন, তাহলেই যুধিষ্ঠির জীবিত অবস্থাতেই মৃত হবেন ও অর্জুনের সত্য রক্ষিত হবে। অর্জুন এ ভাবে সত্যরক্ষা করেন ও ভাইকে অপমান করার

শোকে আবার আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে বলেন যে, অর্জুন যদি নিজমুখে নিজের গুণকীর্তন করেন, তাহলেই তা আত্মহত্যার সমান হবে। অর্জুন তাই করেন ও পরে যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে উভয় ভাইর পুনর্মিলন হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন যখন যাবদবনারীদের ইন্দ্রপ্রস্তে নিয়ে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে আভীর দস্যুদল তাঁদের অনেককে অপহরণ করে। গাণ্ডীব হাতে অর্জুন তাঁদের গতিরোধ করতে অসমর্থ হন। তখন কোন দিব্যাস্ত্রই তাঁর স্মরণে আসে নি। তখন বেদব্যাস তাঁকে বলেন যে, তাঁর কাজ শেষ হয়েছে; তাই প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই দিব্যাস্ত্রগুলি স্বস্থানে প্রস্থান করেছে। মহাপ্রস্থানকালেও অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণের মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু অগ্নি স্বয়ং এসে পথরোধ করে গাণ্ডীব বরুণকে প্রত্যর্পণ করতে বলেন। তখন অর্জুন গাণ্ডীব ও দু অক্ষয় তূণ জলে নিক্ষেপ করেন।

গীতা

মহাভারতের ভিষ্মপর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। এ যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে ও তাঁদের বধ করতে হবে ভেবে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অর্জুনের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য যে উপদেশ দেন, তাকেই শ্রীমদ্ভগবদগীতা বলা হয়। তার প্রধান রক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোতা অর্জুন। তাতে সাত শত শ্লোক আছে। এজন্য তার অপর নাম 'সপ্তশতী'।

গুণকেশী

গুণকেশী ইন্দ্র-সারথি রূপবতি মেয়ে। সুধর্মার মা। ভোগবতি নগরির অধিপতি আর্যক নাগের পৌত্র ও চিকুর নাগের ছেলে সুমুখের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মেয়ের যোগ্য স্বামির সন্ধানে নারদের সঙ্গে নানা লোক ভ্রমণান্তে মাতলি অনন্তনাগ বাসুকির পুরিতে ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের পৌত্র ও চিকুর নাগের ছেলে সুমুখকে গুণকেশীর স্বামি বলে মনোনীত করেন; কিন্তু গরুড় কিছুকাল পূর্বে তাঁর বাবা চিকুরকে নিহত করেন ও একমাস পরে সুমুখকে ভক্ষণ করবেন বলে স্থির করেন। পিতামহ আর্যকের নিকট এ সংবাদ পেয়ে মাতলি সুমুখকে নিয়ে গরুড়কে নিবৃত্ত করার জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। সেখানে বিষ্ণুও ছিলেন। তিনি অমৃত পান করিয়ে সুমুখকে অমর করার পরামর্শ দেন, কিন্তু ইন্দ্র অমৃত পান না করিয়েই তাঁকে দির্ঘায়ু লাভের বরদান করেন। গরুড় এ সংবাদে রেগে গিয়ে ইন্দ্রের নিকট অভিযোগ করেন যে, ইন্দ্র বর দিয়ে নাগভোজনে বাধা দিলেন কেনো? এতে ইন্দ্র বলেন যে, তিনি বাঁধা দেন নি, বিষ্ণুই সুমুখেকে অভয়দান

করেছেন। তখন গরুড় বিষ্ণুর নিটক ক্রোধ, আস্ফালন ও গর্ব প্রকাশ করায় বিষ্ণু তাঁকে বলেন যে, যদি তুমি আমার বাম বাহুর ভার সহ্য করতে সমর্থ হও, তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এ বলে গরুড়ের স্কন্ধে বাম বাহু রাখা মাত্রই গরুড় অচৈতন্য গয়ে পড়েন এবং তাঁর দর্প চূর্ণ হয়। জ্ঞানলাভ করে গরুড় তখন বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গরুড়ের বক্ষে সুমুখকে নিক্ষেপ করতেন এবং তদবধি সুমুখ দির্ঘায়ু হয়ে রূপগুণবতি স্ত্রীকে নিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকেন। (মহাভারত)

গোকুল

মথুরার পূর্ব ও দক্ষিণ কোণে অবস্থিত যমুনার বামতীরবর্তী পুণ্যস্থান। নন্দ এ স্থানে বাস করতেন। কৃষ্ণ ও বলরাম এখানে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। পূতনাবধ, শকটভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কাজ এখানেই সংঘটিত হয়। কৃষ্ণলীলাক্ষেত্র বলে গোকুল বৈষ্ণবদের পুণ্যতীর্থ।

গোবর্ধন

তিনি একজন কবি। গোবর্ধন জয়দেবের পূর্বকালবর্তী। কারণ জয়েদেব স্বকৃত গীত গোবিন্দের প্রারম্ভে গোবর্ধনের প্রশংসা করেছেন। আর্য সপ্তশি নামে আর্যাচ্ছন্দে সাত শত শ্লোকাত্মক কাব্য গোবর্ধন প্রণীত বলে প্রসিদ্ধ আছে। তাঁর রচনা সরল ও মধুর।

গৌতমি

জনৈকা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণি। তাঁর পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে অর্জুনকে নামে জনৈক ব্যাধ সে সর্পকে পাশবদ্ধ করে গৌতমির সম্মুখে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন গৌতমি সর্প-বিনাশে অসম্মতা হন। কারণ, সর্পের মৃত্যুতে তাঁর পুত্রের জীবন লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই, সে নিয়তির বশেই মৃত হয়েছে। আর যাঁরা তাঁর মতো ধর্মনিষ্ঠ, তাঁদের শোক হয় না। তাছাড়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্রোধ করা পাপ, কারণ তাতে কেবল যাতনাই বর্ধিত হয়। ব্যাধের বার বার অনুরোধেও গৌতমি সম্মত হন না। তখন সর্প মনুষ্য-ভাষায় ব্যাধকে বলে যে, সে পরাধীন, মৃত্যু দ্বারা প্রেরিত হয়েই সে বালককে দংশন করেছে, পাপ হরে মৃত্যুই সে পাপের জন্য দায়ি হবে। এমন সময় মৃত্যু এসে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, আমি কালের অধীন হয়েই সর্পকে প্রেরণ করেছি, সুতরাং আমি নির্দোষ। তখন কাল স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ব্যক্ত করেন যে এ বালকের মৃত্যুর জন্য তাঁর কর্মফলই দায়ি, আর কেউ নয়। গৌতমিও তখন একই কথা বলেন যে,

কর্মবশেই এ বালকের মৃত্যু হয়েছে এবং কর্মফল বশেই তিনি ছেলেহীনা হয়েছেন, সুতরাং ব্যাধের উচিত সর্পকে মুক্তি দেয়া। তখন কাল ও মৃত্যু প্রস্থান করেন। ব্যাধ সর্পকে মুক্তি দেয় এবং গৌতমিও শোকশূণ্য হন।
(মহাভারতশান্তি)

গৌরি

(১) ব্রহ্মা নিজের শরির হতে গৌরিকে সৃষ্টি করে রুদ্রকে দান করেন। রুদ্র তপস্যার জন্য জলে নিমগ্ন হলে ব্রহ্মা গৌরিকে নিজের দেহে বিলীন করেন এবং পরে গৌরিকে দক্ষের হাতে প্রদান করেন। এদিকে রুদ্র দির্ঘকাল তপস্যা করে জল থেকে উত্থিত হয়ে পৃথিবীর সুশোভন অবস্থা ও মানুষের পরিপূর্ণতা দেখে রেগে গিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। ফলে, তাঁর কর্ণ হতে ভূত, প্রেত, বেতাল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে দজ্ঞযজ্ঞ নষ্ট করে এবং দেবতাদের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে। তখন বিষ্ণু নিজেই রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন ব্রহ্মা উভয়ের মধ্যস্ত হয়ে বিবাদের মীমাংসা করে দেন এবং গৌরিকে রুদ্রের হাতে প্রদান করতে দক্ষকে আদেশ দেন। ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে রুদ্রের বাসস্থান নির্দেশ করেন। এদিকে রুদ্রের দ্বারা দক্ষযজ্ঞ ও সুধা বিনষ্ট হওয়ায় গৌরি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হন। এর ফলে তাঁর দেহ ভস্মিভূত হয়। তখন গৌরি হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করে উমা নামে পরিচিতা হন এবং মহাদেবকেই পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার কাছে উপস্থিত হয়ে খাদ্যভিক্ষা করেন। উমা বৃদ্ধকে স্নান করে আহার গ্রহণ করতে বলেন। গঙ্গায় স্নান করতে গেলে এক মকর বৃদ্ধকে আক্রমণ করে। তখন বৃদ্ধ উমার কাছে সাহায্য প্রার্থন করলে উমা অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, স্বয়ং মহাদেব তাঁর হস্তধারণ করেছেন। বাবা হিমালয় এ বিবরণ জ্ঞাত হয়ে উমাকে মাহাদেবের হাতে সমর্পণ করেন।
(বরাহপুরাণ)

(২) পার্বতির অন্য নাম গৌরি। হিরণ্যাক্ষের ছেলে অন্ধক মন্দর পাহাড়ে ভ্রমণকালে মহাদেবের স্ত্রী গৌরিকে দেখে মোহিত হন। তাঁকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে প্রহলাদ অন্ধককে ঐ কার্যে অগ্রসর হতে বিশেষরূপে নিষেধ করেন, কিনউত অন্ধক সে কথায় কর্ণপাত করেন না। ফলে, গৌরি শতরূপা হয়ে অন্ধককে নির্যাতন করেন। (বামনপুরাণ)

(৩) তিনি সূর্যবংশিয় রাজা প্রসেনজিতের স্ত্রী। খ্যাতিমান রাজা মান্ধাতার বাবা যুবনাশ্চ তাঁর ছেলে।

ঘটোৎকচ

ভিম ও রাক্ষসি হিড়িম্বার ছেলে। রাক্ষসিরা গর্ভবতি হয়েই সন্তান প্রসব করেন। তাই ঘটোৎকচ জন্মের পরেই যৌবন লাভ করেন। তিনি সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ হন।

চ্যবন

মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার পূর্বেকার পাণিপ্রার্থী পুলোমা নামধারি এক রাক্ষস ভৃগুপত্নীকে অপহরণ করতে চেষ্টা করেন। গর্ভস্ত ছেলে মাকে বিপদগ্রস্তা দেখে গর্ভ হতে বের হলে তাঁর তেজে রাক্ষস ভস্মীভূত হয়ে যায়। মাতৃগর্ভচ্যুত হওয়ার জন্য তাঁর মান হয় চ্যবন। (মহাভারত– আদি)

নর্মদার নিকট বৈদূর্য পর্বতে চ্যবন দির্ঘকাল তপস্যা করে জরাগ্রস্ত হন ও তাঁর দেহ বল্মীকে ও লতায় আবৃত হয়। একদিন রাজা শর্যাতি তাঁর চার সহস্র স্ত্রী ও সুন্দরি মেয়ে সুকন্যাকে নিয়ে সেখানে বিহার করতে আসেন। সুকন্যার রূপ দেখে চ্যবন তাঁকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকেন, কিন্তু সুকন্যা শুনতে পান না। কিন্তু বল্মিক-স্তূপমধ্রে খদ্যোতবৎ দীপ্যমান দু চক্ষু দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশে সুকন্যা কণ্টক দিয়ে তা বিদ্ধ করেন। তাতে চ্যবন অত্যন্ত রেগে গিয়ে রাজার সেনাদের মলমূত্রত্যাগ রুদ্ধ করেন। শর্যাতি তাঁর কারণ ক্রমে জ্ঞাত হয়ে মেয়ের জন্য চ্যবনের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। তখন চ্যবন বলেন যে, দর্প ও অজ্ঞতাবশে সুকন্যা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। এ মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলে তিনি তাঁকে ক্ষামা করতে পারেন। তখন শর্যাতি তাঁকে মেয়ে সম্প্রদান করতে বাধ্য হন। একদিন স্নানান্তে নগ্ন সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে দেব-চিকিৎসক অশ্বিনিকুমারদ্বয় তাঁকে প্রার্থনা করেন। সুকন্যা তাঁর স্বামির প্রতি অনুরক্ত বলে জানান। অশ্বিনিকুমারদ্বয় তখন বলেন যে জরাগ্রস্ত চ্যবনকে তাঁরা পুনযৌবন দান করবেন। তারপর সুকন্যাকে তাঁদের তিন জনের মধ্যে একজনকে বরণ করতে হবে। সুকন্যা এ কথা চ্যবনকে জানালে তিনি তাতে সম্মত হন। তখন অশ্বিনিকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করেন এবং পরমুহূর্তেই দিব্যরূপ ও সমান বেশ নিয়ে চ্যবন উত্থিত হন। তিনজনে তুল্য রূপধারি হলেও সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ করেন। চ্যবন সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বিনিকুমারদ্বয়কে যজ্ঞে সোমপায়ি করবেন বলেন। চ্যবনের অনুরোধে শর্যাতি যজ্ঞের আয়োজন করেন। অশ্বিনিদ্বয়কে সোমপাত্র দেবার উদ্যোগ করায় ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করে বলেন যে, অশ্বিনিকুমারদ্বয়ের সোমপানে অধিকার নাই, কারণ তাঁরা দেবতাদের চিকিৎসক ও কর্মচারি মাত্র। ইন্দ্রের নিষেধ অবজ্ঞা করায় ইন্দ্র চ্যবনকে বজ্রাঘাতের উদ্যোগ করেন; তখন চ্যবন ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করে মন্ত্র পড়ে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মদ

নামে এক ভষিণ শক্তিশালি দেবতা উৎপন্ন করেন। সে ইন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে তিনি চ্যবনকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন ও অশ্বিনিকুমারদ্বয়কে সোমপানের অধিকারি বলে স্বীকার করে নেন। তারপর ইন্দ্রের বাহুদ্বয় মুক্ত করে মদকে সুরাপান, স্ত্রী, দ্যূত ও হরিণিয় ভাগ করে স্থাপন করেন ও শর্যাতির যজ্ঞ সমাপ্ত করে চ্যবন স্ত্রীর সঙ্গে বনগসন করেন। চ্যবনের পুত্রের নাম প্রমতি। (মহাভারত– বনপর্ব)

মহর্ষি চ্যবন একদা ব্রতধারি হয়ে বারো বৎসর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে জলের মধ্যে বাস করেন। জলচর প্রাণিরা তাঁর কাছে নির্ভয়ে আগমন করত। একদা তিনি মৎস্যসহ ধীবরদের জালে ধৃত হন ও মরণাপন্ন মৎস্যদের দেখে দুঃখিত হন। তখন তিনি ধীবরদের বলেন যে, তিনি মৎষ্যদের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করবেন বা বিক্রীত হবেন। ধীবরগণের মুখে এবং বিধ সংবাদ পেয়ে রাজা নহুষ তাঁর কাছে এসে তাঁর কোন প্রিয় কার্য করতে চান। তখন চ্যবন নহুষকে এ ক্লান্ত ধীবরদের সৎস্যের মূল্য দিতে বলেন। নহুষ সহস্র মুদ্রা দিতে চাইলে চ্যবন বলেন যে, তাঁর মূল্য সহস্র মুদ্রা নয়, নহুষ যেনো বিবেচনা করে উপযুক্ত মূল্য দান করেন। নহুষ সহস্র মুদ্রা হতে ক্রমে তাঁর সমগ্র রাজ্যই দিতে চান, কিন্তু চ্যবন তাতে সম্মত হন না। তখন গো-গর্ভজাত এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে নহুষ গাভী দ্বারা চ্যবনকে ক্রয় করেন; কারণ, পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ও গোধন তুল্য অন্য কোন ধন নেই। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সে গাভী গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে চ্যবন সে গাভী নিয়ে ধীবরদের ও নহুষকে আশীর্বাদ করে স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করেন। (মহাভারত– অনুশাসন)

চ্যবন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বংশ ব্রাহ্মণবংশ হলেও ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশ থেকে তাঁর বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে। সে জন্য কুশিকবংশ দগ্ধ করবেন বরে মনস্থ করে তিনি কুশিকের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করে রাজ্যের ধেনু ও ধনাদি দিতে চাইলেন। চ্যবন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এক ব্রতের অনুষ্ঠান করতে চাইলেন এবং কুশিককে সস্ত্রীক তাঁর পরিচর্যা করতে বললেন। চ্যবন নানারূপ উপদ্রব করে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করলেও তাঁরা অকুণ্ঠিত চিত্তে সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করে প্রসন্ন মনে তাঁর সেবা করে যান। এরূপে চ্যবন কুশিকের কোন ত্রুটি ধরতে সক্ষম না হয়ে, অশ্বের পরিবর্তে রাজা ও মহিষির দ্বারা তাঁর রথ চানাতে থাকেন। কশাঘাতে জর্জরিত হলেও তাঁরা নীরবে তা সহ্য করেন। অবশেষে চ্যবন রথ হতে নেমে তাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করে সুস্থ করে পরদিবস গঙ্গাতীরে তাঁর আশ্রমে উভয়কে উপস্থিত হতে বলে অন্তর্হিত হন।

পরদিন গঙ্গাতীরে তাঁর আশ্রমে গিয়ে কুশিক ও তাঁর মহিষি দেখেন, সেখানে গন্ধর্বপুরির মতো সুন্দর প্রাসাদ কানন ইত্যাদি বর্তমান। কিছুক্ষণ পরে সে সব অদৃশ্য হয়ে যায় এবং রাজা ও রাণি ব্রাহ্শনের তপস্যার বল জ্ঞাত হয়ে ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা করতে থাকেন। চ্যবন তখন তাঁদের বলেন যে, তিনি তাঁদের সংযমে প্রীত হয়েছেন এবং তাঁদের বর দিতে ইচ্ছুক। রাজা বলেন যে, চ্যবনের সংস্পর্শে এসে তাঁরা যে দগ্ধ হন নি, এ- তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। চ্যবনের এ অদ্ভুত কার্যের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, ব্রহ্মার কাছে তিনি জ্ঞাত হন যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ফলে কুলসংকর হবে এবং কুশিকের এক তেজস্বি ছেলে জন্মাবে। সে জন্য কুশিকবংশ দগ্ধ করার ইচ্ছায় চ্যবন তাঁদের নানা প্রকার উৎপীড়ন করেছেন। কিন্তু অভিশাপ দেবার মতো কোন ত্রুটি দেখতে না পেয়ে চ্যবন তাঁদের প্রীতির জন্য এ স্বর্গোদ্যান সৃষ্টি করে তাঁদের ক্ষণকালের জন্য স্বর্গসুখ দান করেছিলেন। কুশিক যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষ করেন, তাও ঋষির অজ্ঞাত নয়। তবে ব্রাহ্মণত্ব অত্যন্ত দুর্লভ, আর অপশ্চর্যা ও ঋষিত্ব অপেক্ষাকৃত আরও দুর্লভ। তবুও চ্যবন বলেন যে, রাজার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন এবং ভৃগুবংশে ঔর্ব নামে এক ঋষি জন্মাবেন; তাঁর ছেলে ঋচীক সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত করে নিজ ছেলে জমদগ্নিকে তা দান করবেন। জমদগ্নির সঙ্গে কুশিকের ছেলে গাধির মেয়ের বিয়ে হবে এবং তাঁদের ছেলে পরশুরাম ক্ষত্রাচারি হবেন। গাধির ছেলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। (মহাভারত– অনুশাসন)

চতুর্মুখ

ব্রহ্মার অন্য নাম। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দু দৈত্য ব্রহ্মার বরে অমর হয়। তাঁদের পরস্পরের হস্ত ব্যতীত অন্য কারো হাতে তাঁদের মৃত্যু হবে না, এ ছিলো ব্রহ্মার বর। তারা তখন দেবতা ও ঋষিদের উপর নানারূপ অত্যাচার করতে থাকলে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে বিপন্ন হয়ে উপস্থিত হন। তখন ব্রহ্মার বিশ্বকর্মাকে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য তিল তিল করে সংগ্রহ করে এক রূপবতি নারী সৃষ্টি করতে বলেন। এ নারীরই নাম হয় তিলোত্তমা। এ তিলোত্তমাকে নিয়ে দু ভাইর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ায় তারা পরস্পরের হাতে নিহত হয়। এরূপে ব্রহ্মা চতুর্মুখ হন। ইন্দ্র তিলোত্তমাকে দেখবার জন্য সহস্রলোচন হন। শিব স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হন। তাই তাঁর নাম হয় স্থাণু। (মহাভারত– আদি)

চতুর্বেদ

ঋক্ সাম, যজু ও অথর্ব– এ চার বেদ।

চণ্ডি

(১) দেবি দুর্গার মূর্তি। এ মূর্তিতে দেবি মহিষাসুর বধ করেন।

(২) মার্কণ্ডেয় পরাণান্তর্গত দেবি-মাহাত্ম্য কথা। আসলে চণ্ডী মার্কণ্ডেয় তার শ্লোকসংখ্যা সাত শত। এতে দেবি ভগবতির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ভগবতি অসুর শুম্ভের সেনাবাহিনী ও প্রধান সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে 'চণ্ডী' নামে অভিহিতা হন।

(৩) উদ্দালক মুনির স্ত্রী। তিনি সর্বদাই স্বামির কথা অমান্য করতেন। একবার উদ্দালক আশ্রমে আগত কৌণ্ডিণ্য ঋষির সামনে স্বামি উদ্দালকের আদেশ অমান্য করায় কৌণ্ডিণ্য রেগে গিয়ে এঁকে শাপ দিয়ে পাষাণে পরিণত করেন। শাপগ্রস্তা চণ্ডীর সকাতর অনুরোধে মুনিবর বললেন যে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ারক্ষার জন্য অর্জুন যখন আসবেন তাঁর স্পর্শে চণ্ডী মুক্তিলাভ করবেন। অর্জুন দ্বারা চণ্ডী শাপমুক্ত হন। (মহাভারত)

চন্দ্র

(১) ব্রহ্মার মানসছেলে অত্রি মুনির পুত্র। জন্মের পরেই চন্দ্র ত্রিচক্র রথে আরোহণ করে পৃথিবী পরিক্রমা ও আলোকদান করতে আরম্ভ করেন। দক্ষের ভরণি, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তরফাল্গুনি, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণি প্রভৃতি নামক সাতাশটি মেয়েকেই ইতি বিয়ে করেন। এঁদের মধ্যে রোহিণিই চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা হওয়ায় অন্য মেয়েরা দক্ষের কাছে পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জামাতার মতো পরিবর্তনে অসমর্থ হয়ে দক্ষ অভিশাপ দেন যে, চন্দ্র চুত্রকন্যাহীন ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হবেন। এতে তাঁর স্ত্রীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে বাবাকে শাপ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। মেয়েদের প্রার্থনায় তিনি শাপ পরিবর্তন করে বলেন যে, যক্ষ্মারোগে চাঁদ মাসের মধ্যে এক পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন ও অন্য পক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেন। এ দু পক্ষই কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। (কালিকাপুরাণ)

(২) সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃত, পারিজাত, লক্ষ্মী, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে চন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি দেবতাদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হন। অমৃতপানকালে দেবতাদের মধ্যে রাহু নামে এক অসুর গোপনে অমৃতপান করতে উদ্যত হন। চন্দ্র তাঁকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তা বিষ্ণুকে বলে দেন। কণ্ঠের নিম্নে অমৃত গলাধঃকরণের পূর্বেই বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করেন। সে হতেই রাহুর সঙ্গে চন্দ্রের শত্রুতা এবং মস্তকরূপি রাহু সুযোগ পেলেই চন্দ্রকে গ্রাস করেন, কিন্তু ছিন্ন কণ্ঠ দিয়ে চন্দ্র পুনরায় নির্গত হন। একেই লোকে চন্দ্রগ্রহণ বলে থাকে।

(৩) একদা রাজসূয় যজ্ঞ করে চন্দ্র অতি অহঙ্কারি ও কামাসক্ত হন। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করার ফলে তিনি দেবতাদের বিরাগভাজন হন। এর ফলে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হয়। বহু দৈত্য, দানব ও দেব-শত্রুরা চন্দ্রের পক্ষে যোগদান করেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন। ফলে, দু পক্ষে ভিষণ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মহাদেব এবং শুক্রাচার্যও বৃহস্পতির পক্ষ নেন। বৃহস্পতির ছেলে কচ শ্রক্রাচার্যের প্রিয় শিষ্য; এ জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির বিপদে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন। অবশেষে ব্রহ্মা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মহাদেব ও শুক্রাচার্যকে নিবৃত্ত করেন এবং তারাকে চন্দ্রের নিকট হতে গ্রহণ করে বৃহস্পতির নিকট প্রত্যার্পণ করেন। তারা তখন অন্তঃসত্বা ছিলেন। বৃহস্পতির আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ এ গর্ভ শরস্তম্ভের ত্যাগ করেন এবং একটি পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ কার ছেলে? তারা উত্তরে বলেন যে, চন্দ্রের। তখন চন্দ্র এ ছেলেকে গ্রহণ করে তাঁর নাম রাখেন বুধ। আকাশে এ বুধ চন্দ্রের বিপরীত দিকে উদিত হয়। বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র যক্ষারোগগ্রস্ত হন ও রোগমুক্ত হবার জন্য বাবা অত্রির শরণাপন্ন হন। অত্রির অনুগ্রহে তিনি শাপমুক্ষ ও পুনরায় দীপ্তিসম্পন্ন হন।

চন্দ্রবতি

দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভাই সুনাভের মেয়ে। যদুবংশের গদ এঁকে বিয়ে করেন।

চন্দ্রবংশ

চন্দ্র তেকে উদ্ভূত বংশের নাম। এ বংশ যাদব ও পৌরব নামে দু ভাগে বিভক্ত। প্রথম বংশ পুরু থেকে উদ্ভূত। কৃষ্ণ যদুবংশোদ্ভূত এবং কুরুপাণ্ডব পুরুবংশোদ্ভূত।

চন্দ্রলেখা

বাণরাজের মন্ত্রি কুম্মাণ্ডের মেয়ে, উষার একজন সখি। এরই চেষ্টায় রূপসি উষা অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হন। (উষা দেখুন)

চন্দ্রশেখর

বেতাল দেখুন।

চন্দ্রহাস

একজন রাজা। বাল্যকালেই তাঁর পিতা-মাতর মৃত্যু হয়। একটি ধাত্রি এঁকে নিয়ে বনে পলায়ন করে; কিন্তু পরিশেষে এ ধাত্রিরও মৃত্যু হয়। এ রাজ্যের মন্ত্রি

নিজেই রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করেন। রাজছেলেকে দেশে কেউই চিনতেন না। একদিন এ রাজপুত্র যখন মন্ত্রির গৃহের সম্মুখে ভ্রমণরত ছিলেন,তখন একজন দৈবজ্ঞ মন্ত্রিকে বলেন যে, এ বালক সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবে। এ কথা শুনে মন্ত্রির মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি এঁকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করেন। ঘাতকরা চন্দ্রহাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে তাঁর সৌন্দর্য ও কাতর বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে ঘাতকরা তাঁকে অব্যাহতি দেয়। এরপর চন্দ্রহাস এক সম্ভ্রান্ত লোকের আশ্রয়ে বাস করে বড় হয়ে ওঠেন। এক সময়ে মন্ত্রি এঁকে এখানে দেখেই রাজপুত্র বলে চিনতে পেরে নিজের পুত্রের কাছে এঁকে বিনাশ করার জন্য এক গুপ্ত চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। মন্ত্রি-ভবনের উদ্যানে মন্ত্রির মেয়ে বিষয়া এঁকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হন। রাজকুমারের নিদ্রিত অবস্থায় বিষয়া বাবার পূর্ব-পত্রের বিষয় পরিবর্তন করে নূতন পত্র রচনা করে দেন। উক্ত পত্রে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব লিখিত ছিল। মন্ত্রিপুত্র এ পরিবর্তিত চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গেই বোনের বিয়ে দেন। অতঃপর মন্ত্রির গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এ ঘটনা জ্ঞাত হলে পর একটি দেবালয়ে ঘাতক নিযুক্ত করে পূজার অছিলায় চন্দ্রহাসকে উক্ত স্থানে প্রেরণ করেন। রাজপুত্র দেবালয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্রই ঘাতক তাকে হত্যা করবে এরূপে নির্ধারিত ছিল। দৈবক্রমে চন্দ্রহাসকে রেখে মন্ত্রিপুত্র নিজেই দেবালয়ে গমন করেন এবং ঘাতক কর্তৃক নিহত হন। তারপর কালক্রমে চন্দ্রহাস একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। (মহাভারত)

চরক

চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণেতা একজন ঋষি। তিনি মহর্ষি অগ্নিবেশ দ্বারা প্রণীত 'চরক সংহিতার' প্রতিসংস্কার করেন।

যখন ভগবান বিষ্ণু মৎস্যাবতার হন, সে সময় অনন্তদেব অথর্ববেদের অন্ত র্গত আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ভূমণ্ডলবাসি প্রাণিগণকে ব্যাধি ক্লিষ্ট দেখে ব্যথিত হন এবং মানবের দূরবস্থা দূর করার জন্য ষড়ঙ্গবেত্তা মুনপুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি চররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে চরক নামে খ্যাতিমান হন।

মুণি চরক কোন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন তা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে তিনি বৈয়াকরণ মহর্ষি পাণিনির আবির্ভাবের আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ি-ব্যাকরণে– "কটচরকাল্লুক" এরূপ একটি সূত্র লিখেছেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'চরকসংহিতা' মহর্ষি চরক দ্বারা প্রতিসংস্কৃত। এতে দৃঢ়বল নামক একজন প্রাচীন চিকিৎসক 'সিদ্বিস্থান' নামক একটি অধ্যায় যোজনা করেছেন চরক-সংহিতার ১. সূত্রস্থান, ২. নিদানস্থান, ৩. বিমানস্থান, ৪.

শারিরস্থান, ৫. ইন্দ্রিয়স্থান, ৬. চিকিৎসিত স্থান ও ৭. সিদ্ধিস্থান নামক কয়টি প্রকরণ বিদ্যমান আছে। এ গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রাচীন।

চারুমতি

রুক্মিনীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের মেয়ে।

চিত্রগুপ্ত

যমের কর্মচারি। ব্রহ্মার অঙ্গ হতে তাঁর জন্ম। ব্রহ্মার যখন জগৎ সৃষ্টি করে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর অঙ্গ হতে নানা বর্ণে চিত্রিত এক পুরুষ মস্যাধার ও লেখনীসহ উদ্ভূত হন। জন্মের পর তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে কি কাজ করতে হবে? যোগনিদ্রা থেকে ব্রহ্মা উত্থিত হয়ে ছেলেকে আদেশ দেন যে, মানুষের পাপপুণ্য বিচার করার জন্য তুমি যমালয়ে বাস কর। আমার কায়া হতে তোমার উদ্ভব হয়েছে বলে তুমি কায়স্থ নামে অভিহিত হবে। তিনি পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব গুপ্ত রাখেন বলে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন। চিত্রগুপ্তের অম্বষ্ঠ, মাথুর, গৌড়, সেনক, শ্রীবাস্তব্য ইত্যাদি নামে নটি ছেলে হয়। চিত্রগুপ্ত মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফলও লিখে থাকেন। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা হয়। অভিশপ্ত রাজা সৌদাস চিত্রগুপ্তের পূজা করে পাপমুক্ত সৌদাস চিত্রগুপ্তের পূজা করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গগমন করেন। ঐ তিথিতে ভিষ্ম এ চিত্রগুপ্তের উপাসনা করে তাঁর প্রসাদে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রাপ্ত হন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাপীদের যন্ত্রণা দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

চিত্ররথ

একজন গন্ধর্ব ও কুবেরের বন্ধু। তাঁর পর্ণ বা বাহন জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য ছিল বলে তিনি অঙ্গারপূর্ণ নামে খ্যাত। চিত্র-বিচিত্র রথের অধিকারি হিসেবে তাঁর অপর নাম চিত্ররথ। পাণ্ডবরা পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদির স্বয়ংবরসভায় যাত্রাপথে রাতকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। তখন গন্ধবৃরাজ সস্ত্রীক জলক্রীড়ায় রত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের জলস্পর্শ করতে বাঁধা দেন। ফলে, তাঁর সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুনের আগ্নেয়অস্ত্রে রথ দগ্ধ হওয়ায় গন্ধর্বরাজ অচেতন হয়ে পড়েন ও অর্জুনের হাতে বন্দি হন। তাঁর স্ত্রী কুম্ভিনসি যুধিষ্ঠিরের শরণ নিলে, তাঁর অনুরোধে অর্জুন এঁকে মুক্তি দেন। গন্ধর্বরাজ তখন অর্জুনের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন করেন। গন্ধর্বরাজ যুধিষ্ঠিরকে ও তাঁর প্রত্যেক ভাইকে এক শত বেগবান গন্ধর্বদেশিয় ঘোড়া উপহার দেন ও অর্জুনকে চাক্ষুষি বিদ্যা দান করেন। এ বিদ্যার প্রভাবে ত্রিলোকের সবকিছু ইচ্ছামাত্র দেখা যায়। এর পরিবর্তে অর্জুন এঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন।

তিনি অর্জুনকে পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ সংবরণ ও তপতীর কাহিনি বলেন এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইত্যাদির কাহিনি শোনান। তাঁরই পরামর্শে পাণ্ডবেরা দেবলের কনিষ্ঠ ভাই উৎকোচতীর্থে তপস্যাকারি ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করেন।

চিত্রসেন

(১) একজন অপ্সরা। অসুররাজ বাণের মেয়ে উষার সখি চিত্রলেখা। তিনি বাণরাজার মন্ত্রি কুম্মাণ্ডের মেয়ে। উষা স্বপ্নে কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্তা হন। চিত্রলেখা নানা দেশের রাজকুমারদের চিত্র দেখিয়ে কৌশলে উষার প্রকৃত প্রণয়ীর কথা জেনে নেন। তখন চিত্রলেখা দ্বারকায় গিয়ে নারদ-প্রদত্ত তামসীবিদ্যার প্রভাবে অন্যের অদৃশ্য হয়ে অনিরুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেন, এবং উক্ত বিদ্যাবলে অনিরুদ্ধকে অদৃশ্য রাণরাজার অন্তঃপুরে আনয়ন করে উষার সঙ্গে মিলন করিয়ে দেন। চিত্রলেখা চিত্রাঙ্কনে সুনিপুণা ছিলেন।

(২) গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ছেলে চিত্রসেন ইন্দ্রের সভাসদ এবং সঙ্গীত ও নৃত্যবাদ্যাদির নায়ক ছিলেন। স্বর্গের নৃত্যগীতাদিরও অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। বন বাসকালে অর্জুন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহার্থ তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্ররোকে গমন করে চিত্রসেনের কাছে নৃত্যগীতবাদ্যদি শিক্ষা করেন। এ চিত্রসেনই একদা উর্বশিকে বলেন যে, অর্জুন তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছেন। ফলে, উর্বশি অর্জুনের নিকট অভিসারে গমন করেন এবং অর্জুন দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন।

পাণ্ডবদের দ্বৈতবনের অবস্থানকালে দুর্যোধন ঘোষযাত্রার পথে দ্বৈতবনের কাছে এলে গন্ধর্বগণ দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হন। উক্ত সময় গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ক্রীড়া করার মানসে দ্বৈতবনস্থিত সরোবরের তীরে সদলবলে অবস্থান করছিলেন। গন্ধর্বরা দুর্যোধনকে দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়ায় দুর্যোধন তাঁদের সসৈন্যে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরিশেষে পরাজিত ও বন্দি হন। তাঁর ভাইগণ এবং কৌরব-স্ত্রীরাও গন্ধর্ব-হাতে বন্দি হন। দুর্যোধনের মন্ত্রিগণ ও পরাজিত সৈন্যেরা পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হলে, যুধিষ্ঠির ভিমের অমত সত্ত্বেও কৌরব-রমণিদের উদ্ধার করে কুলমর্যাদা রক্ষার জন্য চার ভাইকে চিত্রসেরন বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে চিত্রসেন পরাজিত হন ও অর্জুনের সখা বরে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন যে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের উপহাস করতে এসেছিলেন বলে ইন্দ্রের আদেশে তাঁকে তিনি বন্দি করেন। অর্জুনের অনুরোধে চিত্রসেন দুর্যোধনাদিকে মুক্ত করে দেন। কৌরবের কুলমর্যাদা হানি না করার জন্য যুধিষ্ঠির তাঁকে বহু ধন্যবাদ দেন। ইন্দ্র অমৃতবর্ষণ করে নিহত গন্ধর্বদের জীবন দান করেন। পরে যুধিষ্ঠির দুর্যোধন প্রভৃতিকে স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করতে বলেন। (মহাভার)

(৩) একজন গন্ধর্ব। লঙ্কার রাজা রাবণ তাঁর যেশে চিত্রাঙ্গদাকে অপহরণ করে নিয়ে বিয়ে করেন।

চিত্রাঙ্গদা

মণিপুররাজ চিত্রভানুর মেয়ে। এ বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ রাজা প্রভঞ্জন মহাদেবের তপস্যা করে বর লাভ করেন যে, তাঁর বংশের প্রত্যেক পুরুষই একটিমাত্র সন্তান লাভের অধিকারি হবে। কালক্রমে চিত্রভারুর একটি মেয়ে হয় এবং সে মেয়েকে তিনি একটি পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করেন ও শিক্ষা দেন। দ্রৌপদির সঙ্গে বিবাহের নিয়মভঙ্গ করার জন্য বনবাসে গমন করে অর্জুন যখন মণিপুরে উপস্থি হন, কখন তিনির সুন্দরি চিত্রাঙ্গদাকে দেখে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। চিত্রাঙ্গদাকে গর্ভজাত সন্তান মণিপুর রাজ্যের বংশধর হবে, এ শর্তে অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিয়ে হয়। অর্জুন সেখানে তিন বৎসর কাল বসবাস করেন ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁর বভ্রুবাহন নামে এক ছেলে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞাশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হলে, অর্জুনের অন্য পত্নী নাগকন্যা উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব আটক করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সে যুদ্ধে অর্জুন জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। তখন উলূপী সঞ্জীবনি-মণি বক্ষে স্থাপন ক'রে অর্জুনের চৈতন্য আনয়ন করেন। চিত্রাঙ্গদা স্বামির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও যজ্ঞকালে হস্তিনাপুরে গিয়ে স্বামির সঙ্গে বাস করতে থাকেন। (২) রাবণের স্ত্রী, বীরবাহুর মা। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশিয় রাজা ককুৎস্থর মেয়ে।

চণ্ডিদাস

বঙ্গদেশের সুখ্যাতিমান কবি। তাঁর প্রণীত 'গীতাচিন্তামণি" পরমাদরণীয় রত্ন বিশেষ। তিনি ১৩৩৯ শকে জন্মগ্রহণ করে। ১৩৯১ শকে মানবলীলা সম্বরণ করেন। সাকুপুর থানার পূর্বদিকে নান্নুর গ্রাম তার বাসভূমি। ঐ গ্রামে বাশুলি (বিশালাক্ষী) নামে এক শিলাময়ী দেবি আজও আছেন। জনপ্রবাদ এ যে, চণ্ডিদাস প্রথমে তাঁর উপাসনা করতেন, পরে তাঁরই আদেশে কৃষ্ণপরায়ণ হন। তিনি বরেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার বাবার নাম দুর্গাদাস।

চৈতন্য

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের ন্যায় জয়ন্তীয়াপতি আদিত্য সত্যসিন্ধু আর্যাবর্ত হতে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। সে ব্রাহ্মণসন্তানসন্ততিগণ সিলেট বৈদিক নামে খ্যাত। সে বৈদিককুলজাত উপেন্দ্র মিশ্রের ৭ ছেলে– ১. কংসারি, ২. পরমান্দ, ৩. পদ্মনাভ, ৪. সর্বেশ্বর, ৫. জগন্নাথ, ৬. জনার্দন ও ৭. ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথ

মিশ্র বিদ্যা অর্জনের জন্য নবদ্বীপে বাস করেন। সেখানে নীলাম্বর চক্রবর্তির মেয়ে শচির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। নীরাম্বর চক্রবর্তিও সিলেটবাসি ছিলেন। এ পরিণয়সূত্রে তিনিও নবদ্বীপে এসে বাস করেন। এর প্রমাণ এ যে, বৃন্দাবনবাস চৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন যে, নিমাই কোন সময় সিলেটের কদর্য ভাষার উল্লেখ করে সিলেটবাসিদের বিদ্রুপ করলে তাঁরা তাঁকে এ বলেছিলেন–

"তুমি কোন দেশি তাহা কহত নিশ্চয়
বাবা-মা আদি করি যতেক তোমার
বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কার
আপনি হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়
তবে ঢোল কর কারে অন্যে দুঃখ পায়।"

শচির গর্ভে ক্রমশ জগন্নাথের ৮ জন মেয়ে জন্মে। তাঁরা শৈশবে কালকবলিত হয়। তৎপরে তাঁদের ১টা ছেলে জন্মে। সে শিশুর নাম বিশ্বরূপ রাখা হয়েছিল। পরে শচি আবার সন্তান সম্ভবা হলে ১৩ মাস গর্ভধারণের পর ১৪০৭ শতাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমায় সন্ধাকালে এক ছেলে ভূমিষ্ট হয়। সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। সে নবকুমারকে প্রতিবেশিরা নিমাই বলে ডাকতো, কিন্তু নামকরণ কালে বিশ্বম্ভর নাম রাখা হয়েছিল। পাঞ্জাবের নানক ইউরোপীয় লুথার প্রায় বিশ্বম্ভরের সমসাময়িক। নিমাই শৈশব অবস্থায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপ গৃহপরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলে নিমাইয়ে চঞ্চল স্বভাব দূর হয়। তিনি প্রথমে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ, পরে বাসুদের সার্বভৌমের নিকট সাহিত্য অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করেন। বাসুদেবের ছাত্রদের মধ্যে চৈতন্য রঘুনাথ ও রঘুনন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ। নিমাইয়ের যৌবনারম্বে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পরে বল্লভাচার্যের কণ্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। নিমাই পিতৃভূমি দেখার জন্য সিলেটে যান। সে সময় তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী সর্পদংশনে জীবন পরিত্যাগ করেন। নিমাই সিলেটে থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে খুব কাতর হন। এ শোক হতেই তাঁর হৃদয়ে সংসারবৈরাগ্য ও বৈরাগ্য হতে ঈশ্বর প্রেমের সূত্রপাত হয়।

কিছুদিন পরে মার অনুরোধে পুনর্বার পণ্ডিতরাজ সনাতনের মেয়ে বিষ্ণু প্রিয়াকে বিয়ে করেন। কিন্তু তখন তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্বপত্নীর অভাব পূরণ করতে পারলেন না। তখন দাম্পত্যপ্রেমের পরিবর্তে তাঁর হৃদয়ে জগতের সারভূত ঈশ্বর প্রেমের প্রতিবিম্ব পতিত হলো। সে বৈরাগ্য পূর্ণ হৃদয়ে তিনি পূর্বপত্নীর প্রেতকৃত্যসম্পাদনের জন্য গয়া গমন করেন। সেখানে ঈশ্বরপুরির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বরপুরি একজন পণ্ডিত ও ঈশ্বরপ্রেমিক প্রকৃত বৈষ্ণব। ঈশ্বরপুরি সর্বদা নিমাইকে বৈষ্ণবধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

তাঁর সে উপদেশে নিমাইয়ের অন্তঃস্থল অবধি বিদ্ধ হলো। তিনি পুরির নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হলেন।

ছায়া

সূর্যের অন্যতমা স্ত্রী। তাঁর গর্ভে সাবর্ণিমনু, শনি ও তপতির জন্ম হয়। সূর্যের প্রথমা স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামির তেজ সহ্য করতে না পেরে, মায়াদ্বারা নিজের ছায়া হতে নিজের অনুরূপ এক নারীমূর্তি সৃষ্টি ক'রে তাঁকে সূর্যের কাছে রেখে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সংজ্ঞা নিজ ছেলে-মেয়ে পালনের ভার সাতনী ছায়ার উপর দিয়ে যান। বাবা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) মেয়ের এ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বামির নিকট প্রত্যাবর্তন করতে বলেন, কিন্তু সংজ্ঞা স্বামির কাছে না ফিরে উত্তর কুরুবর্ষে গিয়ে এক ঘোটকির রূপ ধারণ করে ভ্রমণ করতে থাকেন। সূর্য আপন স্ত্রী মনে করে ছায়াকে যৌন উপভোগ করেন। তাঁর ফলে তাঁদের সাবর্ণিমনু ও শনি নামে দু ছেলে, এবং তপতি নামে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ছায়া নিজ গর্ভজাত ছেলেদের সপত্নী সংজ্ঞার ছেলে যম অপেক্ষা অধিক ভালবাসায় যম একদা রেগে গিয়ে বিমাতাকে পদাঘাত করতে উদ্যত হন। তখন বিমাতা ছায়া যমকে অভিসম্পাত দেন যে, 'তোমার পা খ'সে যাক।' যম বাবার কাছে গিয়ে বিমাতার এ ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করেন। সূর্য নিজছেলে যমকে অভিশাপ থেকে মুক্ত না করে বলেন যে, তাঁর পায়ের মাংস নিয়ে কৃমিরা মাটিতে প্রবেশ করবে; কিন্তু সূর্য ছায়াকে যমের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করেন। স্বামির এ তিরস্কারের জন্য রেগে গিয়ে ছায়া তাঁর নিজের জন্মের কথা ও সংজ্ঞার পিতৃগৃহে গমনের সমস্ত সংবাদ সূর্যকে বলে দেন। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

জগন্নাথ

বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশেষ। জগন্নাথ বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় ও ভারতবর্ষের নানা অংশে পূজিত হয়ে থাকেন। উড়িষ্যার পুরি শহরে তাঁর মন্দির আছে। বৎসরের দুটি উৎসবে তিনি বিশেষভাবে পূজিত হন– একবার জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রার সময়ে এবং আর একবার আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে। প্রথম উৎসবে জগন্নাথকে স্নান করানো হয় এবং দ্বিতীয় উৎসবে জগন্নাথ, তাঁর ভাই বলরাম এবং বোন সুভদ্রাকে রথের উপর স্থাপন করে উপাসকরা টেনে নিয়ে যায়। জগন্নাথের জন্ম সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে– এক ব্যাধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়ে, তাঁর মৃতদেহ একটি বৃক্ষের তলায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কৃষ্ণের কয়েকজন অনুরাগী এ দৃশ্য দেখে বৃক্ষতল হতে মৃত কৃষ্ণের কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে একটি বাপক্সের মধ্যে স্থাপন করে। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা

বিষ্ণুকে পূজা করবেন মনে করেন। কিন্তু কি মূর্তিতে বিষ্ণুকে উপাসনা করবেন সে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন বিষ্ণু উপস্থি হয়ে তাঁকে বিষ্ণুর এক সনাতন মূর্তি নির্মাণ করে এ মূর্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্থি রক্ষা করতে বললেন। দেব-শিল্পি বিশ্বকর্মা এ মূর্তি প্রস্তুতের ভার নিলেন এ শর্তে যে যতদিন পর্যন্ত এ মূর্তি প্রস্তুত না হয়, ততদিন পর্যন্ত কেউই যেনো তাঁকে মূর্তির জন্য বিরক্ত না করে। কিন্তু পনের দিন পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অত্যন্ত অস্থির হয়ে মূর্তি দেখবার জন্য বিশ্বকর্মার নিকটে এসে উপস্থিত হন। ফলে বিশ্বকর্মা অত্যন্ত কুপিত হয়ে এ কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখে প্রস্থান করেন। মূর্তির হাত-পা তকন অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র কাঠামো অবস্থায়ই ছিল বলা চলে। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে এ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধে প্রীত হয়ে ঐ অসম্পূর্ণ মূর্তির চক্ষু ও প্রাণ দান করেন এবং নিজে পুরোহিত হয়ে মূর্তি স্থাপন পূর্বক পূজা করেন।

জটাধর

(১) দেবাসুর-যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ প্রভৃতি দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ পাঠিয়েছিলেন, জটাধর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। (মহাভারত–শল্য)

(২) মহাদেবের অন্যতম নাম জটাধর।

জটায়ু

পক্ষিরাজ। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভাই। সূর্য সরথি অরুণের দু ছেলে সম্পাতি ও জটায়ু। জটায়ু সকল পাখির ওপর আধিপত্য করার অধিকার পেয়েছিলেন। মহারাজ দশরথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। সীতাঅপহরণ কালে সীতার ক্রন্দনে ব্যথিত হয়ে জটায়ু রাবণের গতিরোধ করেন ও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু রাবণের খড়্গাঘাতে জটায়ু ছিন্নপক্ষ ও মৃতপ্রায় হয়ে ভূপতিত হন এবং রাবণ সীতাকে নিয়ে পলায়ন করেন। সীতান্বেষণ কালে ভূপতিত রক্তাক্ত জটায়ুর দেখা পেয়ে রাম তাঁকে সীতার ভক্ষণকারি মনে করে হত্যা করতে উদ্যত হলে, জটায়ু রামের নিকট সমস্ত বিবরণ বিবৃত করেন। জটায়ুই রামকে প্রথম বলেন যে, সীতা রাবণ দ্বারা অপহৃতা হয়ে দক্ষিণ দিকে গমন করেছেন। এ বিবরণ বলার পরই জটায়ুর মৃত্যু হয় এবং রাম-লক্ষ্মণ পিতৃসখা জেনে তাঁর সৎকার করেন।

সীতা হরণের সময় রাবণ জটায়ু দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে এবং পরিণামে জটায়ু পরাস্ত হয়। ভয়ে সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

রাবণ নিজের বীরত্ব সম্পর্কে সীতাকে ধারণা দানের উদ্দেশ্যে জটায়ুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য আহ্বান জানান। চাঁদমুখি সীতা রাবণের সীমাহীন বীরত্ব দেখে নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করেন। জটায়ু নিজের দোষেই মরেছে বলে রাবণের যুক্তি। কেউ জটায়ুকে রাবণের সাথে যুদ্ধ করতে বলেননি। জটায়ু অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। রাবণের মতে জটায়ু নিজেই যেনো নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। রাবণ সীতাকে বশীভূত করার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। জটায়ুর মৃত্যুর ঘটনাটি সীতাকে ভীত করে তুলবে রাবণ এমন ধারণা করেছেন। রাবণ নিজের পরাক্রম যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে তা সহায়ক হয়েছে। জটায়ুর মতো শক্তিশালি প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও নিহত করার মধ্যে রাজা রাবণের কৃতিত্ব বিদ্যমান।

জড়ভরত

পুরাকালে ভরত নামে এক রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করতেন। সর্বদা ভগবানের পূজার্চনার দ্বারা তিনি উন্নতিলাভ করেন। একদিন তিনি স্নানার্থ নদীর তীরে গিয়ে দেখেন যে, একটি জলপানরতা ও আসন্নপ্রসবা হরিণি সিংহদ্বারা আক্রান্ত হয়ে জলে পড়ে জল থেকে লাফ দিয়ে তীরের উপর উঠতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তীরভূমি অত্যন্ত উচ্চ হওয়ায় হঠাৎ সে পতিত হয় এবং তার গর্ভপাত হয়। এ গর্ভপাতের ফলে হরিণি তৎক্ষণাৎ সে স্থানে প্রাণত্যাগ করে। সদ্যোজাত হরিণশিশুটিকে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখে ভরত তাকে উদ্ধার করে নিজ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সযত্নে লালনপালন করতে থাকেন। অল্পকালের মধ্যেই হরিণশিশুটির উপর তিনি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন ও জলতপ বিস্মৃত হয়ে সর্বদা মৃগের চিন্তায় ও তাঁর লালনপালনে অযথা কালক্ষেপ করতে থাকেন। সমস্ত ভোগ্যবস্তু ত্যাগ এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেও কালক্রমে তিনি হরিণশিশুর প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁর ধর্মকর্ম সমস্তই লোপ পেয়ে যায়। মৃত্যুকালেও হরিণশিশুর প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করে, তারই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে কেবল হরিণ চিন্তা করেছিলেন বলে রাজা ভরত এক জাতিস্মর হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর পূর্বের আশ্রমে এসে দিনাতিপাত করতে থাকেন। অতঃপর যথাকালে আবার দেহত্যাগ করে জাতিস্মর হয়ে তিনি এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। আবার যাতে তাঁর অধোগতি না হয়, সেজন্য তিনি সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু সর্বদা জড়বুদ্ধি উন্মত্তের মতো অবস্থান করতেন, জড়িত স্বরে কথা বলতেন এবং কাজকর্ম বিমুখ ছিলেন বলে তাঁর নাম জড়ভরত হয়। সর্বদা মলিন বসন পরিহিত অপরিষ্কৃত দেহ ও মন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও, শাস্ত্রে তাঁর গভীর

জ্ঞান ছিল। সকলে তাঁকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ভেবে অপমান করত এবং আহার্য মাত্র দান করে তাঁর দ্বারা সর্বপ্রকার কাজ করিয়ে নিত। একসময় রাজা সৌবীর তাঁকে শিবিকাবহনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। দর্শন ও পরামার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নানা রকম উপদেশ দিতেন, শেষে এ জড়ভরত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করে সে জন্মেই মোক্ষলাভ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

জতুগৃহ

দুর্যোধনের চক্রান্তে বারণাবত নগরে লাক্ষাদি দাহ্য পদার্থ দিয়ে এক গৃহনির্মাণ করে তাতে পাণ্ডবদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। স্থির হয় যে পাণ্ডবদের অগোচরে দুর্যোধনের মন্ত্রি পুরোচন গৃহে অগ্নিসংযোগ করে তাঁদের হত্যা করবেন। বিদুর পূর্বেই কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে এ বিষয়ে সাবধান করে দেন। বিদুরের প্রেরিত খননকারির সাহায্যে পাণ্ডবরা গৃহমধ্যে পলায়নের জন্য নদীতীর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ খনন করার। এখানে এক বৎসর বাস করার পর, একদিন কুন্তি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যদের ভোজন করান এবং গভীর রাত্রে পাণ্ডবেরা গৃহে অগ্নিসংযোগ করে সুড়ঙ্গপথে নদীতীরে এসে বিদুর প্রেরিত নৌকায় পার হয়ে পলায়ন করেন। জতুগৃহে পুরোচন ও পাঁচ ছেলেসহ নিমন্ত্রিত এক নিষাদী (মাহুত) অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নিদ্রিত অবস্থাতেই দগ্ধ হয়, ফলে পাণ্ডবরাই দগ্ধ হয়েছেন বলে রটনা হয়। (মহাভারত– বনপর্ব)

জনমেজয়

(১) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রপৌত্র। তিনি অভিমন্যুর পৌত্র ও রাজা পরীক্ষিতের ছেলে। বাল্যকালেই বাবার মৃত্যুর পর জনমেজয় রাজপুরোহিত এবং মন্ত্রিগণদ্বারা রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন। যথাকালে কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার মেয়ে বপুষ্টমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। একবার হরিণাকালে রাজা পরীক্ষিৎ মৌনব্রতী শমিকমুনির স্কন্ধে মৃত সর্প অর্পণ করায় শমিকের ছেলে শৃঙ্গি দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে শশিকের ছেলে শৃঙ্গি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে তক্ষকনাগের দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। জনমেজয় রাজ্যলাভের পর মন্ত্রিদের নিকট বাবার মৃত্যুর বিবরণ জ্ঞাত হয়ে জলস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেন যে, পিতৃহন্তা তক্ষকের উপর প্রতিশোধ অবশ্যই তিনি গ্রহণ করবেন। পুরোহিতদের নিকট পরামর্শ নিয়ে সর্পকুল বিনাশের জন্য জনমেজয় সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞ করেন। যজ্ঞভূমি পরিমাপ কালে সূত নামে এক পুরাণকথক ভবিষ্যৎবাণি করেন যে, কোন ব্রাহ্মণ এ যজ্ঞে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন। তখন জনমেজয় দ্বাররক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঋত্বিকরা নাম উচ্চারণ করে সর্পগণের উদ্দেশে আহুতি দান করলে

সর্পগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যজ্ঞকুণ্ডে এসে পতিত হতে থাকে। অবশেষে ভীত তক্ষকনাগ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। নাগরাজ বাসুকি তার ভগ্নী জরৎকারুকে অনুরোধ করেন যে, তাঁর ছেলে আস্তিক যেনো সর্পকুল রক্ষা করে। মার আদেশে আস্তিক যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে জনমেজয়কে নানারূপে স্তুতি করে সন্তুষ্ট করেন। সকলেই আস্তীকের গুণে অত্যন্ত প্রীত হন। জনমেজয় তাঁকে বর দিতে ইচ্ছুক হলে রাজ-সদস্যগণ ও হোতারা বাঁধা দিয়ে বলেন যে তক্ষক তখনো যজ্ঞে আসে নি। ঋত্বিকগণ ইন্দ্রই তক্ষকের আশ্রয়দাতা জানতে পেরে ইন্দ্রিকে আহ্বান করেন। ইন্দ্র যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলে পর তক্ষক তাঁর উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। জনমেজয় রেগে গিয়ে তক্ষকসহ ইন্দ্রকেই যজ্ঞে নিক্ষেপ করতে বলায় ইন্দ্র ভয়ে তক্ষককে ত্যাগ করে পলায়ন করেন। মন্ত্র-প্রভাবে মোহাগ্রস্ত তক্ষক যজ্ঞাগ্নি অভিমুখে আত্মাহুতি প্রদান মানসে অগ্রসর হতে থাকেন। ঋত্বিকগণ কার্যসিদ্ধি হয়েছে মনে করে জনমেজয়কে অনুমতি করলেন ব্রাহ্মণকে বর দিতে। রাজা আস্তিককে অভিপ্রেত বর চাইতে বললে আস্তিক তক্ষকের উদ্দেশে 'তিষ্ঠ' বলায় তক্ষকের চলৎশক্তি রহিত হলো। তখন আস্তিক রাজাকে যজ্ঞে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। রাজা প্রথমে অসম্মত হন; কিন্তু পরে সদস্যগণের অনুরোধে আস্তিককে অভিষ্ট বর দান করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে পর তক্ষক ও অবশিষ্ট সর্পরা নিষ্কৃতি পায়। এর পর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উদ্যত হন। কলিযুগে অশ্বমেধ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এ যজ্ঞ করা স্থির করেন। যজ্ঞস্থলে এক ব্রাহ্শণকুমারকে কোন কারণে জনমেজয় সর্প করে দেন এবং ফলে সে হত হয়। এ ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হতবুদ্ধি জনমেজয় বেদব্যাস রচিত মহাভারত ব্যাসশিষ্য বৈশ্যম্পায়নের কাছে শ্রবণ করে এ মহাপাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন। (মহাভারত- আদি)

(২) পুরুবংশের খ্যাতিমান রাজা দুষ্মন্তের অপর স্ত্রী লক্ষ্মণার গর্ভজাত পুত্রের নাম জনমেজয়।

জমদগ্নি

একজন বৈদিক ঋষি। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব- এ চার বেদেই তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ভৃগুছেলে ঋচিকের ঔরসে ও কান্যকুব্জরাজ গাধির কন্য সত্যবতির গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। একদা স্ত্রীসহ ভৃগু তাঁর ছেলে জমদগ্নি ও ছেলেবধূ সত্যবতিকে দেখতে এসে বর দিতে উদ্যত হলে, সত্যবতি নিজের ও তাঁর মার জন্য ছেলে ভিক্ষা করেন। ভৃগু ঋতুস্নানের পর সত্যবতির মাকে অশ্বথবৃক্ষ ও সত্যবতিকে উযুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করতে উপদেশ দেন, এবং দু জনের জন্য দু

চরু ভক্ষণার্থ দিয়ে যান। সত্যবতি ও তাঁর মা (গাধির স্ত্রী) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে বিপর্যয় ঘটান। ভৃগু যোগবলে এ ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সত্যবতিকে বলেন যে, 'তোমরা বিপরীত কাজ করেছ। তোমার মাই তোমাকে বঞ্চনা করেছেন। আমি চরু প্রস্তুতকালেই তোমার গর্ভে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার মার গর্ভে মহাবল ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মগ্রহণ করবে স্থির করেছিলাম। কিন্তু চরু আহারে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ায় তোমার গর্ভস্থ ছেলে ব্রাহ্মণ হলেও ক্ষত্রিয়ধর্মী হবে ও তোমার মার ছেলে ক্ষত্রিয় হলেও আচারে ব্রাহ্মণ হবে।' সত্যবতির বহু অনুনয়ে ভৃগু বলেন যে, তাঁর পুত্রের পরিবর্তে পৌত্র ক্ষত্রিয়াচারী হবে। জমদগ্নি নামে তাঁর ছেলে কালক্রমে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠলেন। ঋচিক তাঁর সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্য রেণুকার বিয়ে দেন। তাঁর গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়; তন্মধ্যে পঞ্চম ছেলে পরশুরাম বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেগণের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিন স্নানকালে মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথকে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে জলক্রীড়ারত দেখে রেণুকার মনে কামভাবের রেণুকা বিহ্বল ও ত্রস্তভাবে আর্দ্রগাত্র আশ্রমে ফেলে আসেন। গৃহে-প্রত্যাগত স্ত্রীকে অধীর অবস্থায় ও শ্রীবর্জিত দেখে সন্দিহান হয়ে জমদগ্নি একে একে তাঁর চার ছেলেকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। মাতৃস্নেহবশে চারছেলে অনুরূপ আদেশ পালন করতে অসম্মত হওয়ায়, বাবার অভিশাপে তাদের জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটে। পরশুরাম আশ্রমে এসে বাবার আদেশ শ্রবণমাত্র কুঠারাঘাতে মার শিরচ্ছেদ করেন। জমদগ্নি প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলে পরশুরাম মার পুনর্জন্ম, নিজের মাতৃহত্যার পাপমুক্তি, হত্যার বিস্মৃতি, ভাইদের জড়ত্ব-মুক্তি, নিজের যুদ্ধে অজেয়ত্ব ও দির্ঘায়ুলাভের বর প্রার্থনা করেন। বাবা পরশুরামের মনস্কাম পূর্ণ করেন।

একবার হৈহয়রাজ সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন অনুচরগণসহ ছেলেগণের অনুপস্থিতিকালে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হন। স্ত্রী রেণুকা তাঁদের যথোচিত অতিথিসৎকার করা সত্ত্বেও তাঁরা আশ্রমের বৃক্ষাদি ভগ্ন করেন ও কামধেনু সুরভিকে অপহরণ করে নিয়ে যান। পরশুরাম ফিলে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে কার্তবীর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করে কার্তবীর্যকে বধ করেন। পরে একদিন কার্তবীর্যের ছেলেগণ আশ্রমে এসে পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে হত্যা করেন। আশ্রমে প্রত্যাগত পরশুরাম বাবাকে নিহত দেখে কার্তবীর্যের ছেলেদের সানুচর নিহত করেন ও একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে স্যমন্তপঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রক্তময় হ্রদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তর্পণ করেন। (মহাভারত– বন)

জয় ও বিজয়

(১) এ দু ভাই স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক ছিলেন। দ্বাররক্ষাকালে একদিন সনকাদি ঋষিরা বিষ্ণু-দর্শনে আসেন। ভাইরা তাদের প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত না হওয়ায় ঋষিরা এদের মর্তে জন্ম গ্রহণের অভিশাপ দেন। কিন্তু পরে এঁদের অনুনয়ে প্রীত হয়ে বলেন যে, 'আমাদের শাপ ব্যর্থ হবে না; তবে তোমরা দ্বিবিধ উপায়ে মুক্তি পেয়ে পারো। প্রথমতঃ মর্তলোকে ঈশ্বরকে মিত্রভাবে ভজনা করলে সাত জন্মে, এবং দ্বিতীয়ত বৈরীভাবে ভজনা করলে তিন জন্মে স্বর্গে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করবে।' জয় ও বিজয় আশু মুক্তিলাভের আশায় ঈশ্বরকে শত্রুভাবে ভজনা করে মুক্তি প্রার্থনা করলেন। মুনিদের শাপে জয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও দ্বাপরে শিশুপালরূপে এবং বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁরা বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে স্বর্গগমন করেন।

(২) বিরাট-গৃহে অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের গৃহিত গুপ্ত নাম।

জয়দ্রথ

সিন্ধুরাজ। বাবা বৃদ্ধক্ষত্র। ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ে দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামি। পুত্রের নাম সুরথ। পাণ্ডবদের কাম্যকবনে অবস্থানকালে জয়দ্রথ বিয়েকামনায় শাল্বরাজ্যে গমনরত অবস্থায় দ্রৌপদিকে দেখে মুগ্ধ হন এবং আশ্রমে পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিরি সুযোগ নিয়ে দ্রৌপদিকে অপহরণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত সময় পাণ্ডবরা হরিণী সমাপনান্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে দ্রৌপদির ধাত্রিমেয়ের নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন করেন। জয়দ্রথের সেনারা পরাস্ত ও নিহত হওয়ায় তিনি দ্রৌপদিকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে পলায়ন করতে থাকেন। ভিম ও অর্জুন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে বন্দি করেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের অনুরোধে ভিম তাঁকে হত্যা করে ক্ষৌরকার্য করে মস্তকের মধ্যে মধ্যে ক্ষৌরকার্য করে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদির সম্মুখে লাঞ্ছিত করে মুক্তি দান করেন। এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি মহাদেবের তপস্যা করে অর্জুন ভিন্ন সমস্ত পাণ্ডবকে অন্তত একদিনের জন্যও জয় করতে পারার বর লাভ করেন। ফলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুবধের জন্য দ্রোণ যে চক্রব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর ব্যূহদ্বার রক্ষকরূপে তিনি যুধিষ্ঠির ভিম, নকুল ও সহদেবকে পরাজিত করেন। এ চক্রব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট অভিমন্যু নিহত হন। অর্জুন সংসপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত থাকার জন্য ব্যূহমুখে উপস্থিত হতে সক্ষম হন নি। সন্ধ্যাকালে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে অভিমন্যুবধের বার্তা শুনে অর্জুন প্রতীক্ষা করেন যে,

পরাহ্নে সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করবেন অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করবেন। এ প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত হয়ে জয়দ্রথ স্বগৃহে পলায়ন করতে উদ্যত হলে দুর্যোধন ও দ্রোণ তাঁকে আশ্বস্ত করেন।

পর দিন দ্রোণ শকটব্যূহ রচান করেন। তার পশ্চাতে গর্ভব্যূহ ও গর্ভব্যূহের মধ্যে সূচীব্যূহ নির্মিত হয়। উক্ত সূচিব্যূহের মধ্যে বিশাল সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে জয়দ্রথ গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। শ্রেষ্ঠ কৌরববীরগণ কর্তৃক রক্ষিত জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হবার পূর্বেই সূর্যাস্ত আসন্ন দেখে কৃষ্ণ যোগবলে (চক্রদ্বারা) সূর্যকে আচ্ছাদিত করে দিবসেই সন্ধ্যা সৃষ্টি করেন। কৌরবগণ অর্জুনের অগ্নিপ্রবেশের সম্ভাবনায় আশান্বিত হন এবং জয়দ্রথ নির্ভয়ে সূর্য দেখতে থাকেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে, জয়দ্রথের বাবা বৃদ্ধক্ষত্র তাঁর পুত্রের জন্মকালে দৈববাণি শুনেছিলেন যে, রণস্থলে জয়দ্রথের মুণ্ডচ্ছেদ হবে। তাতে তিনি এ অভিসম্পাত করেন যে, যে তাঁর পুত্রের মস্তক ভূলুণ্ঠিত করবে তাঁর মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। যুদ্ধকালে বৃদ্ধক্ষত্র স্যমন্তপঞ্চকদেশের বহির্ভাগে তপস্যায় রত ছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন কৌতূহলি ও অসতর্ক জয়দ্রথের মস্তক এক শরাঘাতে ছেদনপূর্বক তা মাটিতে নিপতিত হবার পূর্বেই আরো কয়েকটি বাণে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনারত রাজা বৃদ্ধক্ষেত্রের ক্রোড়ে ফেলেন। সন্ত্রস্ত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র দণ্ডায়মান হতেই মস্তকটি তাঁর ক্রোড় হতে ভূপতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হয়। (মহাভারত– বন)

জরৎকারু

ভৃগুবংশিয় মুনি। জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, করু শব্দের অর্থ দারুণ। কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি শরিরকে ক্ষয় করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয় জরৎকারু।

(১) যাযাবর নামে ঋষি বংশের ছেলে। উর্ধরেতা, ব্রহ্মচারি, মহাতপা পরিব্রাজক মুনি। তিনি বায়ু মাত্র ভক্ষণ করে কঠোর তপস্যা ও ব্রতানুষ্ঠান করতেন। একদা ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি কতকগুলি লোককে বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্বক উর্ধপাদ ও অধোমুখ হয়ে লম্বমান দেখেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন যে, জরৎকারু নামে তাঁদের এক ছেলে বিয়ে ও সন্তানোৎপাদন না করায় তাঁরা বংশলোপের আশঙ্কায় এরূপ অবস্থায় লম্বমান আছেন। জরৎকারু তাঁদের আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন যে, কেবল মাত্র পিতৃপুরুষদের মুক্তির জন্যই তিনি তাঁরই সমনামা কোন মেয়েকে বিয়ে সকরতে প্রস্তুত আছেন, অবশ্য যদি সে মেয়ের আত্মীয়গণ স্বেচ্ছায় তাঁকে দান করেন, তবেই তিনি তাঁকে ভিক্ষা স্বরূপ গ্রহণ করে তাঁহাতে সন্তানোৎপাদন করবেন। বিয়োর্থী জরৎকারু ভ্রমণরত অবস্থায় বনগমন করে উপর্যুপরি তিনবার উচ্চৈঃস্বরে মেয়েভিক্ষা করেন। তখন

বাসুকি ঐ বাক্য শ্রবণ করে তাঁর বোন জরৎকারুকে নিয়ে এসে মুনি জরৎকারুকে তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। মেয়ের নামের সঙ্গে তাঁর নামের একত্ব লক্ষ্য করে জরৎকারু মুনি তাঁকে বিয়ে করেন। বিবাহের সময় স্থির হয় যে, তিনি স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন না এবং স্ত্রী অন্যায় কোন আচরণ করলে তিনি তাঁকে ত্যাগ করবেন। কিছুদিন পরে জগৎকারু সন্তানসম্ভবা হন। একদিন মহর্ষি স্বীয় স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে নিদ্রিত আছেন, এমত অবস্থায় সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদির সময় অতিক্রান্তপ্রায় লক্ষ্য করে আশঙ্কিত স্ত্রী স্বামির নিদ্রাভঙ্গ করেন। মহর্ষি জরৎকারু এ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ করে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান। যাবার সময় বলে যান যে, তাঁর এক তেজস্বি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে এবং এ ছেলেই আস্তিক নামে অভিহিত হবে।

(২) নাগরাজ বাসুকির বোন। ইনিই মনসা দেবি, জরৎকারু মুনির স্ত্রী। মা কদ্রু সপত্নী বিনতার সঙ্গে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের রঙ শ্বেত কি কৃষ্ণ এ বিষয় নিয়ে তর্ক করেন ও মীমাংসায় বিজয়িনীর দাসিত্ব স্বীকার করতে অঙ্গীকার করেন। কদ্রু তাঁর সর্পছেলেদের আদেশ করেন যে, তাঁরা যেনো উচ্চৈঃশ্রবার লেজলগ্ন হয়ে থাকে, যাতে লেজটি কালোরঙ দেখায়। যে সকল সর্প এ কাজ করতে অস্বীকার করে, তাঁদের তিনি অভিশাপ দেন যে, তাঁরা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনষ্ট হবে। কদ্রুর জ্যেষ্ঠছেলে বাসুকি সর্পকুল রক্ষার উপায় চিন্তা করতে থাকেন। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে বলেন যে, অভিশাপদানকালে তিনি মাতৃক্রোড় হতে শ্রবণ করেছিলেন যে, ব্রহ্মা দেবগণকে বলছেন, জরৎকারু মুনির ঔরসে বাসুকির বোন জরৎকারুর গর্ভজাত সন্তান আস্তিক মুনি সর্পদের রক্ষা করবেন। বাসুকি জরৎকারু মুনির সন্ধান করে তাঁর সঙ্গে বোনর বিয়ে দেন। বিয়েকালে মুনি শর্ত করেন যে, যদি তাঁর স্ত্রী তাঁর কোন অপ্রিয় কার্য করেন, তবে তিনি স্ত্রী ও গৃহ উভয়ই পরিত্যাগ করবেন। একদা মুনি তাঁর স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্বক নিদ্রিত ছিলেন। সূর্যাস্তকাল উপস্থিত হলে সায়ংকৃত্যের সময় উত্তীর্ণ হবার আশঙ্কায় জরৎকারু স্বামিকে জাগ্রত করেন। মহর্ষি এতে অপমানিত বোধ করেন এবং বলেন যে, তিনি সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালিন সূর্যেরও অস্ত যাবার সামর্থ্য ছিল না। এ বলে, তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে প্রস্তান করেন। তখন জরৎকারু গর্ভবতি ছিলেন। তাঁর বহু অনুরোধেও মুনি নিবৃত্ত হন না। গমনকালে তিনি কেবল স্ত্রীর উদরে তিনবার হস্ত স্পর্শ করে বলেন যে, 'অস্তি' অর্থাৎ গর্ভে আছে। সেকারণেই জরৎকারুর গর্ভজাত পুত্রের নাম হয় আস্তিক। তিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ নষ্ট করে নির্মূলপ্রায় সর্পকুলকে রক্ষা করেন।

জরাসন্ধ

তিনি মগধাধিপতি রাজা বৃহদ্রথের ছেলে। কৃহদ্রথের দু স্ত্রীর গর্ভে দু অংশে তাঁর জন্ম হয়। পরে জরা নামে রাক্ষসি ঐ দুখণ্ড সংলগ্ন করে দিলে তাঁর জীবন লাভ হয়। তিনি পৈতৃক সিংসাহন অধিকার করে মগধের একজন প্রবল নরপতি বলে খ্যাত হন।

জরাসন্ধের দু মেয়ের সাথে কংসের বিয়ে হয়। কৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করলে জরাসন্ধ কৃষ্ণদ্বেষি হয়ে কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণকে ধ্বংস করার জন্য ১৮ বার সসৈন্যে মুথুরা অবরোধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের অলৌকিক বিরত্ব প্রভাবে ইষ্টসাধনে বঞ্চিত হন।

জরাসন্ধ একদিন যজ্ঞে বলি দেয়ার জন্য বহু দেশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজ গৃহে আনয়ন পূর্বক বন্দি করে রাখেন। কৃষ্ণ তাঁর সে ক্রর কর্মের সংবাদ পেয়ে ভিম ও অর্জুন সহ জরাসন্ধপুরিতে উপস্থিত হন এবং বন্দিগণকে মুক্ত করতে অনুরোধ করেন। জরাসন্ধ তাতে অসম্মত হলে পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং ঐ যুদ্ধে জরাসন্ধ ভিমের হাতে নিহত হন। পরে নিজ ছেলে সহদেব পিতৃ-সিংহাসনে আরোহন করেন।

জলন্ধর

দৈত্য বিশেষ। একদিন ইন্দ্র কৈলাসে শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এক ভীষণাকার পুরুষ দেখেন। শিবের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁর কোন উত্তর না পেয়ে রেগে গিয়ে ইন্দ্র তাঁর মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। সে বজ্রাহত পুরুষের মস্তক হতে এক ভীষণ অগ্নি নির্গত হয়ে ইন্দ্রকে ভস্ম করতে উদ্যত হয়। তখন ইন্দ্র উপলব্ধি করেন যে, তিনি স্বয়ং রুদ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত করেছেন। নানারকম স্তব-স্তুতিতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলে পর মহাদেব তুষ্ট হয়ে সে অগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপে করেন। তা থেকে তখন এক বালক আবির্ভূত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকে। এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে ব্রহ্মা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হন। তখন সমুদ্র ব্রহ্মাকে বলেন যে, 'এ আমার ছেলে, একে আপনি পালন করুন।' ব্রহ্মা তাঁকে নিজক্রোড়ে স্থাপন করেন। এ শিশু ব্রহ্মার শ্মশ্রু এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, ব্রহ্মার চক্ষু দিয়ে জলধারা নির্গত রাখেন জলন্ধর এবং তাঁকে এ বর দেন যে, এক রুদ্র ছাড়া সে সকলেরই অবধ্য হবে। তাঁকে তিনি অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কালনেমির মেয়ে বৃন্দার সঙ্গে জলন্ধরের বিয়ে হয়। জলন্ধরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গচ্যুত হয়ে শিবের আশ্রয় নেন। মহাদেব জলন্ধরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দা স্বামির প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুর পূজা আরম্ভ করেন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ গ্রহণ করে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। স্বামি অক্ষত দেহে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন মনে করে পূজারত বৃন্দা অসমাপ্ত পূজা ত্যাগ কহৈ চলে আসেন। এ ফলে জলন্ধরের মুত্যু হয়। বৃন্দা বিষ্ণুর এ কপট ব্যবহারে তাঁকে শাপ দিতে যান। তখন বিষ্ণু বললেন যে, 'তুমি সহমৃতা হও। তোমার ভস্মে তুলসি, ধাত্রি, পলাশ ও অশ্বত্থ– এ চার প্রকার বৃক্ষ জন্মলাভ করবে।' (পদ্মপুরাণ)

জানকি

সীতা। মিথিলার রাজা জনকের মেয়ে। যজ্ঞভূমি চাষ করার সময় পিতা তাঁকে সীতায় অর্থাৎ লাঙলের রেখায় প্রাপ্ত হন। তাঁকে তিনি নিজ মেয়ের মতো লালন করেন। মহর্ষি কুশধ্বজের মেয়ে বেদবতি রাবণকে বলেন যে, 'ত্রেতাযুগে আমিই তোমাকে হত্যা করার জন্য কোন ধার্মিকের অযোনিজা মেয়েরূপে জন্মগ্রহণ করবো।' সে বেদবতিই সীতা। দক্ষযজ্ঞের সময় মহাদেব দ্বারা ব্যবহৃত ধনু পূর্বপুরুষ দেবতাদের নিকট থেকে পিতা পেয়েছিলেন। সীতা বিয়েযোগ্য হলে পিতা পণ করেন, যে এ হরধনুতে যিনি জ্যা লাগাতে পারবেন তাঁর হাতেই সীতাকে অর্পণ করা হবে। রামচন্দ্র তাতে সফল হন।

জাম্বুবান

ব্রহ্মার ছেলে ভল্লুকরাজ জাম্বুবান। তিনি ত্রেতাযুগে সুগ্রীবের মন্ত্রি ছিলেন এবং রাম রাবণের যুদ্ধকালে সুগ্রীব ও রামকে সাহায্য করেছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্বুবানের যুদ্ধ হয়। তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেন এবং বিষ্ণুর আরাধনা করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জাহ্নবি

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নকালে গঙ্গা জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করে তাঁর যজ্ঞোপকুরণাদি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্টি হয়ে জানু বিদীর্ণ করে (মতান্তরে কর্ণপথে) গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সে হতে গঙ্গা জহ্নু মুনির মেয়েস্থানীয়া এবং জহ্নু মেয়ে বা জাহ্নবি নামে খ্যাতা।

জৈগীষব্য

তপস্বি অসিতদেবল সকল সময়ে ব্রহ্মচর্য ও ধর্মকার্যে নিযুক্ত হয়ে দিনাতিপাত করতেন। এমন সময় একদিন জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি দেবলের আশ্রমে এসে

যোগনিরত হয়ে বসবাস করতে থাকেন। তিনি কেবলমাত্র দেবলের ভোজনের সময় তাঁর সমীপস্থ হতেন। একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সমুদ্রে গিয়ে দেখলেন যে, জৈগীষব্য পূর্বাহ্নেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্নানের পরও আশ্রমে ফিরে এসে দেবল দেখেন যে, তাঁর পূর্বেই জৈগীষব্য নিরবে সেখানে উপবিষ্ট আছেন। জৈগীষব্যের শক্তিপরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রজ্ঞ দেবল ব্যোমমার্গে উত্থিত হয়ে দেখলেন, অন্তরীক্ষচারি সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের পূজারত রয়েছেন। অতঃপর তিনি আরও দেখলেন যে, জৈগীষব্য স্বর্গলোক, পিতৃলোক, যমলোক ও চন্দ্রলোক প্রভৃতি বহু উর্ধ লোক বিচরণ করে অন্তর্হিত হলেন। সিদ্ধরা দেবলকে জানালেন যে, জৈগীষব্য শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন, সেখানে দেবলের যাবার শক্তি নেই। তখন দেবল আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে জৈগীষব্যকে দেখে তাঁর কাছে মোক্ষধর্ম শিক্ষা করার অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। দেবল ভেবে দেখেছিলেন, মোক্ষধর্ম ও গার্হস্থ্যধর্মের মধ্যে মোক্ষধর্মই শ্রেষ্ঠ; তখন তিনি জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষধর্ম শিক্ষা ও গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। (মহাভারত– শল্যপর্ব)

জৈমিনি

তিনি ব্যাসদেবের শিষ্য। দর্শন শাস্ত্রে তার বিশেষ পারদর্শি ছিল। তাঁর প্রণীত জৈমিনি দর্শন বা পূর্বমীমাংসার বিশেষ খ্যাতিমান গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন জৈমিনি ভারত নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার অশ্বমেধ পর্বমাত্র পাওয়া যাচ্ছে।

ডিম্বক

শাল্ব নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দু রূপবতি স্ত্রী। ছেলেলাভের জন্য ব্রহ্মদত্ত দশ বৎসর যাবৎ মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি প্রীত হয়ে স্বপ্নে রাজাকে বর দেন যে, তাঁর দু রাণির গর্ভে দুটি ছেলেলাভ হবে। কালক্রমে দু রাণির দু মহাবীর্য ছেলে হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম হংস ও কনিষ্ঠপুত্রের নাম ডিম্বক। ক্রমে এ হংস ও ডিম্বক হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেব এঁদের আরাধনায় প্রীত হয়ে বর দান করেন যে, এ দু ভাই দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও দানবাদের অবধ্য হবে ও সমস্ত রুদ্রাস্ত্র এঁদের করতলগত হবে। সে বলে তাঁরা দেব-দানবদের অজেয় হয়ে উঠলেন। এ দু ভাই একবার হরিণির্থ বনগমন করে দুর্বাসার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করলে, দুর্বাসা এঁদের অভিশাপ দেন। এর ফলে, তাঁরা দুজন অত্যন্ত রেগে গিয়ে দুর্বাসার সমূহ দ্রব্যাদি ছিন্ন ভিন্ন করে তাঁকে বিশেষ অপমানিত করেন। তখন দুর্বাসা কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে তাঁর প্রতিবিধান প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ এতে সম্মত হন। এর পর হংস ও

ডিম্বক রাজসূয় যজ্ঞের জন্য কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করেন ও তাঁর কাছে কর চান। তখন তাঁদের ঔদ্ধত্যেল প্রতিকার করার জন্য কৃষ্ণ এঁদের যুদ্ধে আহ্বান করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে ডিম্বকের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অবশেষে ডিম্বক যখন জ্ঞাত হন যে, হংস কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়েছেন, তখন তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক যমুনায় প্রাণবিসর্জন দেন। (হরিবংশ)

ডুণ্ডুভ

একদা সহস্রপাদ নামে এক ঋষি খগম নামে তাঁর ব্রাহ্মণ-সখার অভিসম্পাতে ডুণ্ডুভ বা ঢোঁড়া সাপ এর দশাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। খগমের বাক্য অব্যর্থ ছিল। একবার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকার সময় খগমকে তৃণনির্মিত সর্প নিয়ে সহস্রপাদ ভয় দেখান। ফলে ভয়ে খগম মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞানলাভ করে খগম বলেন যে, তাঁকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য যেমন সহস্রপাদ নির্বিষ সর্প তৈরি করেছিলেন, খগমের শাপে সহস্রপাদও স্বয়ং সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হবেন। বহু অনুনয়ের পর খগম বলেন যে, তাঁর কথা মিথ্যা হবে না; তবে প্রমতীর ছেলে রুরুর দর্শনলাভ করলে সহস্রপাদ মুক্তিলাভ করবেন। রুরুর স্ত্রী প্রমদ্বরা দুর্দৈবক্রমে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করলে, দেবদূতের পরামর্শে রুরু তাঁর অর্ধায়ু দান করে প্রমদ্বরাকে জীবিত করেন বটে, কিন্তু সর্পকুল বিনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি সকল প্রকার সর্প বধ করতে করতে একবার বনমধ্যে গিয়ে এক ডুণ্ডুভকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, সে বলে ওঠে যে, মনুষ্যদংশনকারি সর্পরা এক জাতি আর সে অন্য জাতি, অতএব ডুণ্ডুভ বধ করা তাঁর উচিত নয়। রুরু তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, ডুণ্ডুভরূপি সহস্রপাদ পূর্ব-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন ও পূর্বরূপ ফিরে পেয়ে রুরুকে অহিংসাধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হন। (মহাভারত– আদি)

তন্ত্র

শিব ও শক্তির উপাসনা যে শাস্ত্র দ্বারা বিস্তার করা হয়েছে, তাকে তন্ত্র বলে। সর্বসুদ্ধ ১৯২টি তন্ত্র আছে, তার মধ্যে ৬৪টি বাংলা দেশের। মহাতন্ত্র ছাড়া কতকগুলি উপতন্ত্রও আছে। বিশেষজ্ঞের মতে পুরাণের পর এ তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। স্ত্রীশক্তির উপাসনা হিন্দুধর্মে প্রথম হতেই নিহিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তন্ত্র এ শক্তিপূজাকে বিশেষভাবে প্রচারিত করে। তন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব এ– প্রচারিত করে। তন্ত্রের দেবতার মধ্যে একটি জাগ্রত বামাশক্তি আছে। দেবতার এ জাগ্রত প্রকৃতি তাঁর শক্তি বা স্ত্রী রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক তন্ত্রে দেবির বা শিবশক্তির বিভিন্ন রূপকে পূজা করা হয়েছে। দেবতাদের কথোপকথনচ্ছলে এ তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারিত হয়েছে। তন্ত্রকে একটি গুহ্যশাস্ত্র

(mystic doctrine) বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতদীক্ষিত ও অভিষিক্ত ছাড়া কারো কাছে এ শাস্ত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কুলার্ণব তন্ত্রের লিখিত আছেঃ ধন দেবে, স্ত্রী দেবে, আপন প্রাণ পর্যন্ত দেবে কিন্তু গুহ্যশাস্ত্র কারো কাছে প্রকাশ করবে না। শিবের স্ত্রী বা দেবি একটি বিশেষ শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়ে যৌন সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে তন্ত্রশাস্ত্রকে কার্যকরি করেছে। এ দুটি সামগ্রিই তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ অবলম্বন। তন্ত্রপূজায় পাঁচটি জিনিসের বিশেষ আবশ্যকতা আছে– মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মিথুন। প্রত্যেক শক্তির দু প্রকৃতি বা স্বভাব আছে– শ্বেত বা কৃষ্ণ, অর্থাৎ নম্র বা উগ্র স্বভাব। উমা ও গৌরী শিবের নম্রশক্তির প্রতীক এবং দুর্গা ও কালি রুদ্রশক্তির প্রতীক। শক্তির উপাসক বা শাক্তরা দু শ্রেণিতে বিভক্ত– দক্ষিণাচারি ও বামাচারি। দক্ষিণাচারি শাক্তরা উগ্র তন্ত্রপূজারি ও নানাবিধ যৌন ও উদ্ভট পদ্ধতির সমর্থনকারি। এ বামাশক্তিকে কল্পিতরূপে নয়, বাস্তবরূপে পূজা করা হয়। সে জন্য অনেক ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ সূচিত করে শক্তিপূজা করা হয়। দক্ষিণাচারিরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে অর্চনা করে থাকেন। তারা বামাচারিদের ন্যায় মদ্য, মাংস বা কারণ ব্যবহার দ্বারা শক্তিসাধনা করেন না। বাংলায় তান্ত্রিক অর্থে প্রধানত বামাচারিদেরই বুঝায়। আবার কোনা কোন স্থালে দক্ষিণাচার ও বামাচারের মিশ্রণও দেখা যায়। হিন্দুদের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হয়েছিল।

তক্ষক

প্রধান আটনাগের মধ্যে তক্ষক অন্যতম। পুরাণমতে আটনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক-এ তিনজন প্রধান। তিনি নাগরাজ বাসুকির ভাই এবং অনন্তনাগ নামেও প্রসিদ্ধ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও তাঁহার স্ত্রী দক্ষমেয়ে কদ্রুর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। ইন্দ্রের সঙ্গে তক্ষকের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর বাসস্থান ছিল খাণ্ডব বনে। মন্দাগ্নির জন্য কৃষ্ণর্জুনের সহায়তায় অগ্নির খাণ্ডব দাহনকালে তক্ষক উক্ত স্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী-ছেলে পলায়নকালে অর্জুনের শরে বিদ্ধ হন। ফলে, অর্জুন তাঁর শত্রুপদবাচ্য হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিৎ মৌনী তপোরত মহর্ষি শমিকের স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করলে, শমিকের ছেলে শৃঙ্গি দ্বারা অভিশপ্ত হন যে, সাতরাতর মধ্যে তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। শমিক পরীক্ষিতকে অভিশাপের বিষয় জ্ঞাত করে সতর্ক করে দেন। পরীক্ষিৎ এক সুরক্ষিত প্রাসাদে বিষ-চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সাবধানে বসবাস করতে থাকেন। সপ্তম দিবসে কশ্যপ নামে এক দক্ষ বিষ-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের নিকট গমনরত ছিলেন। তক্ষকও উক্ত দিবসে অভিশাপের বিবরণ জ্ঞাত হয়ে অর্জুনের বংশধরকে

দংশনেচ্ছায় যাত্রা করেন। পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কাশ্যপের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তাঁর শক্তি পরীক্ষার্থে তক্ষক এক বটবৃক্ষকে দংশন করে ভস্মিভূত করলে, কশ্যপ মন্ত্রবলে তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন। এতৎদৃষ্টে তক্ষক কশ্যপকে বলেন যে, রাজার আয়ু ক্ষয় হয়ে এসেছে; অতএব তাঁকে এখন চিকিৎসা করা বৃথা; সুতরাং কশ্যপ যেনো আশাতিরিক্ত ধন তক্ষকের নিকট হতে গ্রহণ করে বিদায় হন। কশ্যপ ধ্যানবরে তক্ষকের কথা সত্য বলে জ্ঞাত হয়ে তাঁর কাছ হতে অভীষ্ট ধন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তক্ষক কয়েকজন ব্রাহ্মণবেশি নাগের সাহায্যে রাজার নিকট কিছু ফলমূলাদি প্রেরণ করেন। রাজা উক্ত ফল গ্রহণ করে খাবার উপক্রম করলে, ফলমধ্যে তিনি একটি কালোরঙ কীট দর্শনে বলেন যে তাঁর আর কোন ভয় বা দুঃখ নেই– শৃঙ্গির বাক্যই সত্য হোক। এ কীট তক্ষকরূপ ধারণপূর্বক তাঁকে দংশন করুক। এ উক্তি করে তিনি সহাস্যে কণ্ঠদেশে সে কীটটি স্থাপন করেন। তখন তক্ষক নিজমূর্তি ধারণপূর্বক পরীক্ষিতকে দংশন করে প্রস্থান করেন। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জনমেজয় রাজা হন।

উপাধ্যায় বেদের শিষ্য উতঙ্ক যখন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রাজা পৌষ্যের রাণির নিকট হতে উপাধ্রায়ানির জন্য মণিকুণ্ডল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তক্ষক ঐ কুণ্ডল অপহরণ করেন। পরে উতঙ্ক নাগলোকে গিয়ে সে কুণ্ডল তক্ষকের নিকট হতে উদ্ধার করেন। উতঙ্ক তক্ষকের উপর রেগে গিয়ে তাঁকে বিনাশ করার জন্য রাজা জনমেজয়কে উত্তেজিত করেন। জনমেজয় উতঙ্ক এবং তাঁর মন্ত্রিদের নিকট বাবার মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণ করে সর্পসত্রের আয়োজনের দ্বারা সর্পকুল বিনাশের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে, বহু সর্প বিনষ্ট হয়। তক্ষক তখন ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় নেন, কিন্তু তক্ষকযজ্ঞেরন হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। বস্ত্রাঞ্চলে তক্ষককে গোপন করে ইন্দ্র যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন। রাজা পরীকিক্ষৎ তক্ষকসহ ইন্দ্রকেই যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে, ইন্দ্র তক্ষককে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন। পরিশেষে বাসুকির বোন মনসাদেবির ছেলে আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে জনমেজয়কে তুষ্ট করে অগ্নিতে পতনোন্মুখ তক্ষক ও অবশিষ্ট সর্পকুলকে রক্ষা করেন।

তপতি

সূর্যের রূপবতি মেয়ে। সাবিত্রির কনিষ্ঠা। সূর্যের স্ত্রী ছায়ার গর্ভে তাঁর জন্ম। সূর্য এ মেয়ের উপযুক্ত একটি পাত্র বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাপ্ত হন না। উক্ত মসয় কুরুবংশিয় ঋকষ নামধারি এক রাজার ছেলে সূর্যভক্ত সংবরণ প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতেন। এ রূপবান ধার্মিক রাজার হাতে মেয়েকে দান করবেন

লে সূর্য স্থির করেন। একদা সংবরণ বনে হরিণি করতে গেলে তাঁর ঘোড়া তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পড়ে। তখন সংবরণ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে এক রূপবতি মেয়েকে দেখতে পান। তিনি মুগ্ধ হয়ে মেয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গেলে সে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাতে রাজা কামমোহিত হয়ে ভূমিতে পতিত হন। তখন তপতি পুনরায় ফিরে এসে তাঁকে উত্থিত হতে ও তাঁর বাবা সূর্যকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে বলেন। রাজা পুরোহিত বশিষ্ঠকে স্মরণ করেন। বশিষ্ঠের মধ্যস্থতায় তপতি ও সংবরণের বিয়ে হয়। বিয়োন্তে সংবরণ মন্ত্রিদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বারো বৎসর উপবনে পত্নীসহ সুখে বিহার করতে থাকেন। এ বার বৎসর তাঁর রাজ্যের প্রজারাও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করতে থাকে। অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্দশার অবধি থাকে না। বশিষ্ঠ তখন সংবরণ ও তপতিকে রাজপুরিতে ফিরিয়ে আনলে ইন্দ্র আবার বারিবর্ষণ করে রাজ্যরক্ষায় সহায়তা করেন। তপতির গর্ভে কুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এ কুরুই কৌরব-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। (মহাভারত– আদি)

তাড়কা

সুকেতু যক্ষের মেয়ে। ব্রহ্মা সুকেতুর তপশ্যায়প্রীত হয়ে তাঁর এ মেয়েকে সহস্র মত্ত হাতির বল প্রদান করেন। তাড়কার স্বামির নাম সুন্দ এবং পুত্রের নাম মারিচ।

অগস্ত্য মুণির শাপে সুন্দের মৃত্যু হলে তাড়কা ও মারিচ অগস্তকে হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং ঋষির পুনরভিসম্পাতে তারা রাক্ষস রূপে পরিণত হয়। পরে তাড়কা অগস্ত্য মুণির আশ্রমে প্রাণিশূন্য করে বাস করতে লাগলেন।

রাম বিশ্বমিত্রের যজ্ঞরক্ষা করতে গমনকালে তাড়কাকে হত্যা করেন।

তারকাসুর

দেবতা-বিদ্বেষি এক অসুর। তারকা দেবতাদের জয় করার জন্যে সহস্য বৎসর তপস্যা করেও কোন ফল লাভ করতে পারে না। তখন তাঁর মস্তক হতে এক তেজ নিঃসৃত হয়ে দেবতাদের দগ্ধ করতে থাকে। এতে সমস্ত দেবতারা অতিশয় ভীত হয়ে ব্রহ্মার কাছে এসে সমস্ত বিবৃত করে তাঁকে বর প্রদান করতে বলেন। তখন ব্রহ্মা তারকাসুরের কাছে গিয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। তারকা ব্রহ্মার কাছে দুটি বর প্রার্থনা করেন। একবরে তাঁর চেয়ে শক্তিশালি আর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না, আর দ্বিতীয় বরে একমাত্র মহাদেবের বীর্যসম্ভূত পুত্রের হাতে ভিন্ন তাঁর মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার এ দু বরে বলিয়ান হয়ে তারকা দেবতাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। দেবতারা তখন বাধ্য হয়ে আবার ব্রহ্মার শরণাপন্ন

হন। ব্রহ্মা দেবতাদের জানান যে, তাঁর পক্ষে তারকাকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, একমাত্র শিবের বীর্য থেকে উদ্ভূত ছেলেই তারকাকে হত্যা করতে পারে। ব্রহ্মা দেবতাদের উপদেশ দেন যে, যাতে মহাদেবের সন্তান লাভের ইচ্ছা হয়, তাঁর চেষ্টা করতে। তখন দেবতারা কামদেবের সঙ্গে হিমালয়ে যোগমগ্ন মহাদেবের কাছে আসেন। সে সময়ে হিমালয়দুহিতা উমা শিবের আরাধনায় মগ্ন হয়ে তাঁর সম্মুখেই ধ্যানরতা ছিলেন। কামদেব তাঁর পুষ্পধেনু হতে শর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়। মহাদেব অত্যন্ত রেগে গিয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতেই কন্দর্পের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। কামদেব তৎক্ষণাৎ তাঁর নেত্রাগ্নিতে ভস্মিভূত হন। এর পর পার্বতি মহাদেবকে লাভ করার জন্য আরো কঠোর তপস্যায় রত হন এবং তপস্যার ফলে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। কিন্তু পতি-পত্নীরূপে দির্ঘকাল সম্ভোগের পরেও এঁদের কোনো সন্তান না হওয়ায় দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন; কারণ, তারকার উৎপীড়ন তখন একেবারে অসহ্য হয়ে পড়েছিল। তখন অগ্নি কপোতের রূপ ধারণ করে মহাদেবের নিকট আসেন। মহাদেব কপোতকে দেখে তাঁর শুক্র ধারণ করতে আদেশ দিয়ে সম্ভোগে বিরত হন। কপোত-রূপি অগ্নি শিববীর্য ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় বীর্য নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা সে বীর্য ধারণে অশক্ত হয়ে তা হিমালয়ের পার্শ্বস্থ শরবনে ত্যাগ করেন। এতে বিপদ উপস্থিত হবে ভেবে দেবতারা ছজন কৃত্তিকাকে ঐ বীর্য রক্ষা করার জন্য বনে প্রেরণ করেন। কৃত্তিকারা এ বীর্য পানের পর গর্ভধারণ করেন ও এ ছ-কৃত্তিকা সকলেই একত্রে ছ-সন্তান প্রসব করেন।

এদের ছ-ছেলেকে একত্র মিলিত করে এক (ষড়ানন) ছেলে সৃজিত হয়। পরে দেবি বসুন্ধরা এ ছেলেকে গ্রহণ করেন এবং শরবনে ঐ ছেলে ক্রমে বর্ধিত হতে থাকে। এ পুত্রের নাম হয় কার্তিকেয়। কার্তিকেয় বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর দেবতাদের নিকট হতে তারকাসুরের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করে দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হন এবং তারকাকে নিহত করেন। (শিবপুরাণ ও দেবিভগবত)

তালজঙ্ঘা

জনৈক রাক্ষস। অতিশয় দির্ঘকায়। আকাশ ছোঁয়া তাঁর দৈর্ঘ।

তিলোত্তমা

দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দু ছেলে সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করে, কিন্তু ব্রহ্মা এঁদের অমরত্বের বরদানে সম্মত হন না। তবে তিনি বলেন যে, স্থাবর-জঙ্গম কোন প্রাণি হতেই এঁদের কোনো ভয় থাকবে না। যদি এঁদের কখনো মৃত্যু হয়, তবে পরস্পরের হাতেই হবে। এ বর পাবার পর তাঁরা যখন আবার দেবতাদের পীড়নে রত হলে, তখন দেবতা,

ঋষি, যজ্ঞ ইত্যাদি প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন দেবতা ও মহর্ষিদের প্রার্থনায় এঁদের বধের জন্য ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক পরমাসুন্দরি নারী সৃষ্টি করতে বললেন। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম সামগ্রি তিল তিল সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মা এক অতুলনীয়া নারী সৃষ্টি করেন। তিল তিল করে সুন্দর বস্তু মিলিত হয়ে এ সুন্দরির সৃষ্টি হয়েছিল বলে এর নাম হয় তিলোত্তমা। সৃষ্টির পরে তিলোত্তমা দেবতাদের প্রদক্ষিণ করেন। তাঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মুখের সৃষ্টি হয় এবং ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হয়। সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্রহ্মা একে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিলোত্তমা তাঁদের সম্মুখে গিয়ে নৃত্য করতে থাকে। সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্যে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করে ও একে অন্যকে নিহত করে।

একবার তিলোত্তমা বলির ছেলে সাহসিকের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে ঋষি দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করেন। ফলে, তিনি দুর্বাসার শাপে বাণের কন্য উষা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

তুলসি

তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরি। একদিন গোলোকে (স্বর্গে) তুলসিকে কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখে রাধিকা এঁকে অভিশাপ দেন যে, 'তুমি মানবিরূপে জন্মগ্রহণ করবে।' এতে কৃষ্ণ দুঃখিত হয়ে তুলসিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, 'যমানবিরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যাদ্বারা তুমি আমার এক অংম লাভ করবে।' রাধিকার শাপে তিনি পৃথিবীতে রাজা ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুলসি নামে অভিহিত হন। অতঃপর তুলসি বনগমন করে ব্রহ্মার তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা স্থির থাকতে না পেরে তুলসিকে ইপ্সিত বর দিতে সম্মত হন। তুলসি বলেন যে, তিনি নারায়ণকে স্বামিরূপে কামনা করেন। একথা শ্রবণ করার পর ব্রহ্মা বলেন যে, 'এখন তুমি কৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূত সুদামের স্ত্রী হও, পরে কৃষ্ণকে লাভ করবে। রাধিকার শাপে সুদাম দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করবে। তাঁর নাম হবে শঙ্খচূড়। নারায়ণের শাপে তুমি বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর অতি প্রিয় হবে। তুমি না জন্মগ্রহণ করলে তাঁর সকল পূজাই ব্যর্থ হবে।' যথাসময়ে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে রাজা ধর্মধ্বজের মেয়ে তুলসির বিয়ে হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে, তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হলেই তাঁর মৃত্যু হবে। শঙ্খচূড়ের অত্যাচার ও উৎপাত সহ্য করতে না পেরে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে শিবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। শিব তখন সকলের সঙ্গে নারায়ণের সমীপস্থ হন। দেবতাদের দুর্দশা দর্শনে নারায়ণ বললেন যে আমার শূলদ্বারা শিব শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলে পর, আমি এর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করব। শিব শঙ্খচূড় নিহত হয়। তাঁর অস্থি লবণ-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে এ অস্থি হতে দেবপূজার জন্য

নানাপ্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হয়। নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ গ্রহণপূর্বক তাঁর সতীত্ব নষ্ট করছেন জ্ঞাত হয়ে তুলসি নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ গ্রহণপূর্বক তাঁর সতীত্ব নষ্ট করছেন জ্ঞাতহয়ে তুলসি নারায়ণকে অভিশাপ দেন যে, 'তুমি পাষাণে পরিণত হও।' স্বামির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তুলসি নারায়ণের চরণে পতিত হন। তুলসিকে সান্ত্বনা দিয়ে নারায়ণ বললেন যে, 'তোমার দেহ থেকে গণ্ডকি নদী উৎপন্ন হবে, আর তোমার কেশ থেকে উৎপন্ন হবে তুলসিবৃক্ষ। তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয়া হবে।' সে হতে নারায়ণ শিলারূপে অবস্থিত হয়ে সর্বদা তুলসিযুক্ত হয়ে থাকেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

পদ্মপুরাণে তুলসি সম্বন্ধে এরূপ বৃত্তান্ত কথিত আছে– জলন্ধর নামে এক অসুরের স্ত্রী ছিলেন বৃন্দা। জলন্ধর ইন্দ্রকে পরাস্ত করে অমরাবতি অধিকার করলে, ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হন। শিব জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে পতিপরায়ণা বৃন্দা স্বামির প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার নিকটে এলে স্বামিকে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে দেখে, বৃন্দা অসমাপ্ত বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করে আসায় জলন্ধরের মৃত্যু হয় (অন্য মতে বৃন্দার সতীত্ব অক্ষুণ্ন থাকতে জলন্ধরের মৃত্যু হবে না জেনে বিষ্ণু জলন্ধরে রূপ ধরে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন)। বৃন্দা সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। সতীর শাপ অমোঘ জেনে বিষ্ণু ভীত হন এবং বৃন্দাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, 'তুমি সহমৃতা হও, তোমার ভস্মে তুলসি, ধাত্রি, পলাশ ও অশ্বত্থ এ চারপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। বৃন্দা হতেই তুলসির জন্ম।

তৃষ্ণা

তৃষ্ণা প্রদ্যুম্নের মেয়ে।

তুকারাম

মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্গত পুনার নিকটবর্তি দেহুগ্রামের তাঁর জন্ম হয়। তিনি সামান্য শূদ্রজাতের বণিক ছিলেন। কিন্তু আসামন্য দয়া, ধার্মিকতা ও সংসারবৈরাগ্য প্রভৃতি সদগুণে তদানিন্তন জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তিনি ছন্দোবদ্ধবাক্যে এক প্রকার অভিনব কথকতা ও কীর্তনের প্রথা প্রবর্তিত করে সবার মন আকর্ষণ করেছিলেন। এ সময়ে অনেকে তাঁর শিষ্য হন। মহারাষ্ট্রদেশের অধিপতি শিবাজি তুকারামের পরম ভক্ত ছিলেন।

তুকারাম ১৫৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৬৫১ সালে পরলোকগমন করেন।

শিবাজির উপদেশার্থ তুকারামের রচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত হলো–

এ এক সার কথা জানহ কল্যাণ
একি আত্মা সর্বভূতে রহেন সমান।

ত্রিজট

পিঙ্গলরঙা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি বনমধ্যে ভূমি খনন করে বাস করতেন। রাম বনগমনকালে ধন বিতরণ করছেন শুনে কিছু ভিক্ষা করার জন্য তিনি রামের কাছে এলেন। রাম বললেন, 'যত দূর তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করতে পারবে ততদূর পর্যন্ত ধেনু তোমার হবে।' তখন ত্রিজট এমন জোরে লাঠি নিক্ষেপ করলেন যে, সেটা সরযূর অপর পারে গিয়ে পড়লো। সে পর্যন্ত সমস্ত ধেনু সে ব্রাহ্মণ পেলো। (রামায়ণ)

ত্রিজটা

রাবণের অন্তঃপুরের বুড়ি রাক্ষসি। রাবণের আদেশে বৃদ্ধা ত্রিজটা অশোকবনে সীতাকে রক্ষা করতেন। এ রাক্ষসি সরমার মতো সীতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সীতা তা ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করলে অন্য রাক্ষসিরা সীতার অঙ্গহানি করে কষ্ট দেবার ভয় দেখান। সে সময়ে ত্রিজটা রাক্ষসিদের নিবৃত্ত করে এবং ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কথা বিবৃত করে বলে যে, 'আমি দেখলাম, রাম ও লক্ষ্মণের সাথে সীতা দিব্য রথে আরূঢ়া। লঙ্কাপুরি চূর্ণ ও ভস্মিভূত হয়েছে।' ইন্দ্রজিতের শরজালে রাম ও লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হলে রাবণ সীতাকে পুষ্পক রথে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁদের মৃতপ্রায় দেখে সীতা রাবণকে পতিত্বে বরণ করবেন। ত্রিজটা তখন সান্ত্বনা দিয়ে সীতাকে বলেন যে, তাঁরা শরাঘাতে মূহ্যমান হয়েছেন মাত্র, এখনও তাঁদের মৃত্যু হয়নি।

ত্রিপুর

দেবগণের সাথে যুদ্ধে দৈত্যগণ পরাজিত হওয়ার পর তারকাসুরের তিনছেলে– ১. তারকাক্ষ, ২. কমলাক্ষ ও ৩. বিদ্যুন্মালি; কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এ বর প্রার্থনা করেন যে তাঁরা যেনো তিনজন পৃথক পুরে (নগরে) বাস করতে পারে, সেখানে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু থাকবে, যা দানব, যক্ষ বা রাক্ষসেরা বিনষ্ট করতে পারবেন না। সে নগর ব্রহ্মশাপেও নষ্ট হবে না। সহস্র বৎসর পরে তারা মিলিত হলে তাদের এ ত্রিপুর যখন এক হয়ে যাবে, তখন যে দেবশ্রেষ্ঠ এ সম্মিলিত ত্রিপুরকে এক বাণে ভেদ করতে পারবেন, ইনিই তাদের নিহত করবেন। ব্রহ্মা তাঁদের এ প্রার্থিত বর দান করলেন। তারকাসুরের এ ছেলেরা ময়দানবের দ্বারা তিনটি পুর নির্মাণ করলেন। তারকাক্ষের ছেলে হরি ব্রহ্মার বর

পেয়ে এ তিন পুরে এক একটি মৃতসঞ্জীবনি পুকুর নির্মাণ করলেন। এদের এ গুণ ছিলো যে, এতে মৃত দৈত্যদের নিক্ষেপ করলে তারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতো। এ পুনরুজ্জীবিত দৈত্যদের নিক্ষেপ করলে সকলকে উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের শিবের কাছে যেতে বললেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব এ দৈত্যদের হত্যা করতে সম্মত হলেন এবং নিজে দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করলেন। এর ফলে তাঁর বল সকলের চেয়ে বেশি হলো এবং তিনি মহাদেব বলে খ্যাত হলেন। মহাদেব ধনুতে পাশুপত অস্ত্র যোজন করে ত্রিপুরে একত্র হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় দানবদের তিন পুর একত্র হলো এবং মহাদেবও অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন এ তিনপুর অস্ত্রাঘাতে দানবদের সাথে দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সাগরে নিক্ষিপ্ত হলো।

ত্রিমূর্তি

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এ তিন দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের প্রতিকস্বরূপ।

ত্রিশঙ্কু

তিনি সূর্যবংশিয় অযোদ্ধাপতি জনৈক রাজা। মর্তলোক পরিহার পূর্বক চিরবাসের জন্য তাঁর সশরিরে স্বর্গে যাবার ইচ্ছে হওয়ায় কুলগুরু বশিষ্ঠ ও তাঁর ছেলেগণকে অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলেন। তারা রাজার প্রার্থনা অস্বীকার করলে ত্রিশঙ্কু অভিলাষিত কার্যসিদ্ধির ইচ্ছায় বিশ্বমিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র নিজ তপঃপ্রভাবে রাজাকে সশরিরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। রাজা স্বর্গের সন্নিহিত হলে ইন্দ্র বিরূপ হয়ে তাঁকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে পৃথিবীতে পতিত হতে না দিয়ে তাঁর অবস্থানের জন্য তপোবলে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করলেন এবং রাজা সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলে দ্বিতীয় অঙ্গে তাঁর প্রতি বিদূষকের বাক্য এ– "ত্রিশঙ্কুরির অন্তরা তিষ্ঠ।"

দক্ষ

তিনি ব্রহ্মার ছেলে। তাঁর স্ত্রীর নাম প্রসূতি। প্রসূতির গর্ভে তাঁর ঔরসে অনকগুলো মেয়ে জন্মে। তন্মধ্যে ২৭ টি মেয়ের সঙ্গে চন্দ্রের এবং কনিষ্ঠা মেয়ে সতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়।

একদিন দক্ষ নিমন্ত্রিত হয়ে ভৃগুমুণির যজ্ঞে গমন করেন। সেখানে জামাতা শির তাঁর অভিবাদন না করায় তিনি রেগে শিবের যজ্ঞভাগ রহিত করার ইচ্ছায়

নিজেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শিব ছাড়া সকল দেবগণকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন।

তাঁর মেয়ে সতী অনিমন্ত্রিত হয়েও বাবার যজ্ঞে আগমন করলে বাবা দক্ষ সতীর সমক্ষে অযথা শিবনিন্দা করেন। সতী পতিনিন্দা শ্রবণে একান্ত মর্মাহত হয়ে পিত্রালয়ে দেহত্যাগ করেন।

এ দুর্ঘটনার পরে শিবের অনুচরবর্গ যজ্ঞধ্বংস এবং দক্ষের প্রাণ নাশ করলে মহাদেব দক্ষপত্নী প্রসূতির অনুরোধে দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মস্তক অগ্নিতে ভস্ম হওয়ায় ছাগমুণ্ড যোজিত করা হয়।

দন্তবক্র

জনৈক রাজা। তিনি রাজা সুরের মেয়ে পৃথুকীর্তির গর্ভে ও রাজা বৃদ্ধশর্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি করুষ দেশের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন (হরিবংশ)। কৃষ্ণ দ্বারকায় থাকবার সময়ে এঁকে বিনাশ করেন। তিনি শিশুপালের ভাই। শিশুপাল নিহত হ'লে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃষ্ণের গদায় তিনি নিহত হন।

দময়ন্তি

তিনি বির্দভরাজ ভিমের মেয়ে এবং সুখ্যাতিমান নিষধাধিপতি নলরাজ্যের মহিষি। পতিব্রতা কুলকামিনীগণের আদর্শ স্বরূপ এ স্ত্রীরত্ন নিজ, অসাধারণ গুণসমূহে এ বিশ্বসংসারে অক্ষয়কীর্তি লাভ করেছেন।

নলরাজা ও দময়ন্তি পরস্পর যথাযোগ্য অসামান্য রূপ গুণের পরিচয় পেয়ে অনুরাগ পাশে নিবদ্ধ হন, সে অনুযায়ি দময়ন্তি নলরাজাকে মানসে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। পরে দময়ন্তি বাবার অভিপ্রায়ানুসারে স্বয়ংবরা হয়ে স্বয়ংবরসভায় সমাগত বহুসংখ্যক সুখ্যাতিমান রূপগুণসম্পন্ন নরপতিগণ এবং ইন্দ্রাদি দিকপালগণ উপস্থিত থাকতেও নলরাজাকে বরমালা প্রদান করেন।

এ ঘটনায় নলরাজা দুরাশয় কলির প্রকোপে পতিত হওয়ায় কিছুদিন পরে তাঁর ভাই পুষ্করের সাথে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হন এবং তৎসূত্রে ঘোরতর ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় নলরাজার সর্বস্ব অপহরণ করে সস্ত্রীক নলকে এক একখানি পরিধেয় বস্ত্রমাত্র দিয়ে রাজ্য হতে বহিস্কৃত করেন।

নলরাজা দময়ন্তির সাথে রাজ্যচ্যুত হয়ে নিরাশ্রয়ে ও অনাহারে তিন দিন কাটান। পুষ্করের শাসন বাক্যে ভীত হয়ে প্রজাবর্গের মধ্যে কেউ তাঁদেরকে আশ্রয় বা আহার দেননি। তারা বনে প্রবেশ করে কৃছ্রলব্ধ ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকেন।

একদিন নলরাজা নিজ পরিধেয় কাপড় দ্বারা একটা পাখি ধরতে যান, ঐ পাখি তাঁর বস্ত্র অপহরণ করে প্রস্থান করে। তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে স্ত্রীর অর্ধ বসন পরিধান করে উভয়ে একত্র উপবিষ্ট রইলেন।

এ সকল ঘটনায় তখন তাঁর নিজের দুঃখ অপেক্ষাও পত্নীর দুরবস্থা খুব কষ্টকর হওয়ায় শরিরস্থ কলির কুপরামর্শে দময়ন্তিকে পরিত্যাগ করে স্থানান্তর গমনে কৃতসংঙ্কল্প হলেন এবং ছলক্রমে দময়ন্তিকে বিদর্ভদেশ গমনের পথপরিচয় করে দিলেন। কিন্তু দময়ন্তি তখন তার মর্ম কিছুই বুঝতে পারলেন না। পরে দময়ন্তি ক্ষুধাতৃষ্ণায় খুব কাতর হওয়ায় পতির পার্শ্বদেশে ভূতলশায়িনী হয়ে নিদ্রাগত হলে নল অর্ধবস কর্তন করে সে নিরাশ্রয়া প্রিয়তমাকে নির্জন বনে পরিত্যাগ করে উন্মত্তের ন্যায় সে স্থান হতে প্রস্থান করলেন।

দময়ন্তি জেগে নলকে না দেখে খুব দুঃখিত ও ভীত হলেন এবং পাগলের মতো হা নাথ, হা নাথ, এরূপ উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে তাঁকে সব জায়গায় খুঁজতে লাগলেন। এ সময়ে এক ভীষণ অজগর সাপ তাঁকে গ্রাস করার চেষ্টা করলে জনৈক ব্যাধ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে সাপকে মেরে ফেলেন।

পরে ঐ দুরাচার ব্যাধের কু অভিসন্ধি বুঝতে পেরে দময়ন্তি অমূল্য সতীত্ব রক্ষার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে তদ্‌গতচিত্তে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন। ঐ ব্যাধ হঠাৎ পরে মরে গেলো।

এরপর বিজন বনে একাকি ঘুরতে ঘুরতে একদল বণিকের সাথে তাঁর দেখা হয় এবং তাদের সঙ্গে চেদিরাজধানিতে উপস্থিত হয়ে সেখানে রাজমাতার অর্থাৎ স্বীয় মাতৃষসার আশ্রয়ে থাকতে লাগলেন।

বিদর্ভরাজ ভিম জামাতা ও মেয়ের খোঁজে নানা স্থানে দূত প্রেরণ করলেন। সুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ দূত চেদিরাজ্যে গিয়ে সেখানে দময়ন্তিকে দেখতে পান এবং রাজমাতার অনুমতি নিয়ে দময়ন্তিসহ বিদর্ভরাজ ভবনে উপস্থিত হলে দময়ন্তি মাতা-বাবার দেখাতে কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বাপের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন।

অনন্তর নলরাজাকে খোঁজার জন্য সর্বত্র দূত পাঠানো হলো। দূতগণকে দময়ন্তির একটা সাঙ্কেতিক বাক্য বলে দেয়া হলো। ঐ বাক্যের সদুত্তর নল ছাড়া অন্য কেউই দিতে সমর্থ নয়। পরে অযোধ্যা হতে প্রত্যাগত দূত ঐ বাক্যের উত্তর নিয়ে দময়ন্তির নিকট উপস্থিত করলে তিনি তা অবগত হয়ে জানলেন যে, নল অযোধ্যাতেই আছেন। তখন সুদেবকে নিজ পুন স্বয়ংবরের সংবাদ সহ পুনরায় অযোধ্যায় প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন তুমি যে দিবস সেখানে পৌঁছবে তারপর দিবসেই এখানে স্বয়ংবর হবে এ কথা প্রচার করবে।

সুদেব আদেশমত কার্যসম্পাদন করলে অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ নিজ সারথি বাহুকের অলৌকিক ঘোড়াচালনার কৌশলে এক দিবসের মধ্যেই কিদর্ভরাজভবনে উপস্থিত হলেন। আসার সময় পথে ঘটনাক্রমে নল রাজার শরির হতে কলি বের হয়েছিল। দময়ন্ত ঋতুপর্ণ রাজার এক দিবসেই বিদর্ভ রাজধানিতে আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজ সারথি বাহককে পরিচারিকা দ্বারা নানরূপে পরীক্ষা করেন, তাতে ঐ সারথিই যে ছদ্মবেশি নল তা স্থির হওয়ায় পতিব্রতা দময়ন্তি তিন বৎসর অশেষ কষ্ট ভোগ করে আবার স্বামির সাথে মিলিত হলেন এবং নলরাজা আগের মতো রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলে পতিছেলে নিয়ে পরম সুখে কালযাপন করতে লাগলেন।

দশরথ

তিনি সূর্যবংশে একজন প্রধান নরপতি। তাঁর তিনটি প্রাধানা মহিষি ছিলেন– ১. জ্যেষ্ঠা কৌশল্যা, ২. মধ্যমা কৈকেয়ি ও ৩. কনিষ্ঠা সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভে প্রথমে শান্তা নামে এক মেয়ে জন্মে। দশরথ সে মেয়েটি লোমপাদ রাজাকে কৃত্রিম পুত্রি করে দান করেন। শান্তার সাথে মুণিবর ঋষ্যশৃঙ্গের বিয়ে হয়। দশরথের ছেলে না হওয়ায় পরিশেষে ঋষ্যশৃঙ্গ এসে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, তাতেই রাজার চারটি ছেলে জন্মে। কৌশলার গর্ভে রাম, কৈকেয়ির গর্ভে ভরত এবং সুবিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মলাভ করেন। চারটি ছেলে চারটি রত্ন স্বরূপ। তাঁরা যদিও অশেষ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন তথাপি তাদের সৌভ্রাত্র গুণ সর্বজন প্রশংসনীয় ছিলো।

একদিন দশরথ দেবাসুর যুদ্ধে দেব তাঁদের সাহায্যে গিয়ে সেখান থেকে বিক্ষত শরিরে ফিরে এলে মধ্যমা পত্নী কৈকেয়ি শুশ্রূষা করে রাজাকে সুস্থ করেন। রাজা তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীত হয়ে তাঁকে দু টি বর দিতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু রানি বলিলেন, "প্রয়োজন হলে যথা সময়ে বর চাইবো।"

রাজা জ্যৈষ্ঠছেলে রামচন্দ্রের অসাধারণ বলবীর্যের পরিচয় পেয়ে এবং দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদগুনে তাঁর প্রতি যাবতীয় প্রজার আন্তরিক অনুরাগ দেখে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার অনুষ্ঠান করেন। তখন পরিচারিকা মন্থরা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কৈকেয়ি রাজার নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুত বর প্রার্থনা করলেন। প্রথম বরে রামের ১৪ বছর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজত্ব চাওয়া হয়।

রাজা কৈকেয়ির এরূপ অচিন্তিত, অশ্রুতপূর্ব বর প্রার্থনা শুনে মুর্চ্ছিত হন। পরে চেতনা লাভ করে বিনীতভাবে নানা প্রবোধবাক্যে কৈকেয়ির প্রার্থনা অন্যথা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য না হওয়ায় সত্যভঙ্গ ভয়ে অগত্যা তাকে এরূপ বর প্রদানে সম্মত হতে হয়েছিলো।

তখন তিনি ভাবলেন যে, আমি এক সময় শিকার করতে গিয়ে রজনিযোগে অন্ধমুণির ছেলেকে হরিণবোধে শব্দভেদী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলাম। সে সময় অন্ধঋষি এ বেদবাক্য পাঠ করছিলেন– "অন্তরিক্ষোদর কোশো ভূমি বুধ্নো ন জীর্যতি দিসাহস্য স্রুক্তয়ো দৌরস্যোক্তারং বিলংস এষ কোশোব সুধা নস্ত স্মিন্ বিশ্ব মিদং শ্রিতম। তস্য প্রাচী দিগ্ জুহুর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নমো প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এত মেবং বায়ুর দিসাং বৎ সং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোহহমেত মেবং বায়ুং দিসাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোহ হমেত মেবং বায়ুং দিসাং বৎ সং বেদ মা পুত্র রোদং রুদম।" ঋষিকুমার প্রাণত্যাগ করলে বাবা অন্ধক ছেলে শোকে যখন প্রাণ ত্যাগ করেন তখন অভিসম্পাত করেন, 'তুমিও আমার ন্যায় ছেলেশোকে প্রাণ হারাবে। সে অমোঘ ব্রহ্মশাপ আমার পক্ষে অপরিহার্য।'

এদিকে রাম পিতৃসত্য পালনার্থ অম্লানবদনে সীতা ও লক্ষ্মণের সাথে বনে গমন করলে রাজা রামবিয়োগ যাতনা সহ্য করতে না পেরে জীবন ত্যাগ করলেন।

দশাবতার

১. মৎস্য, ২. কূর্ম, ৩. বরাহ, ৪. নৃসিংহ, ৫. বামন, ৬. পরশুরাম, ৭. রামচন্দ্র, ৮. বলরাম, ৯. বুদ্ধ ও ১০. কল্কি– এ দশাবতার। এ দশটি অবতার পৃথিবীর অত্যন্ত সঙ্কট সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে দশাবতার বললে এঁদেরই বোঝায়। এ দশাবতারের কাহিনি এরূপ বর্ণিত আছে–

মৎস্যাবতার– প্রলয়কালে পয়োধিজলে বেদ নিমগ্ন থাকায় ভগবান মৎস্যরূপে তার উদ্ধার করেন; এ জন্য তাঁর নাম মৎস্যাবতার। কূর্ম অবতার– ভগবান ভাসমান পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করে রক্ষা করেন। বরাহ অবতার– ভগবান নিমজ্জমান পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার করেন এবং হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন। নৃসিংহ অবতার– প্রহলাদের বাবা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করার জন্যে ভগবান নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হন। বামন অবতার– ভগবান দৈত্যরাজ বলিকে দমন করেন। পরশুরাম অবতার– ভগবান পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করেন। রামচন্দ্র অবতারে– ভগবান রামচন্দ্ররূপে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করেন। বলরাম অবতারে– ভগবান প্রলম্ব অসুরকে বিনাশ করেন। বুদ্ধ অবতারে– ভগবান জীবহিংসা নিরোধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত আছে যে, শেষ কল্কি অবতারে– কলির শেষে ভগবান কল্কিরূপে ম্লেচ্ছাদি দুস্কৃতদের দমন ও সত্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন।

দশাশ্বমেধ

কাশির তীর্থস্থান। ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কাশির যেস্থানে এ যজ্ঞ হয়েছিলো তার নাম দশাশ্বমেধ।

দংশ

জনৈক অসুর। সত্যযুগে দংশ নামে এক প্রবল মহাসুর ছিল। এক দিন ভৃগুর স্ত্রীকে এ অসুর বলপূর্বক অপহরণ করে। এতে ভৃগু রেগে গিয়ে শাপ দেন যে, সে মূত্রভোজি কীট হবে। তখন দংশ বার বার ভৃগুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ভৃগু বলে, "আমার বংশোদ্ভূত পরশুরাম হতে তুমি মুক্তিলাভ করবে।" দংশ তখন কীটযোনি প্রাপ্ত হয়। কর্ণ পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করার সময়ে একদিন পরশুরাম কর্ণের কোলে মস্তক রক্ষণপূর্বক নিদ্রাভিভূত ছিলেন। উক্ত সময় এক ভিষণ কীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করে ঊর্ধে উত্থিত হতে থাকে। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হবে, এ ভীতিতে কর্ণ কীটের ভিষণ দংশন সহ্য করতে থাকেন। পরে কর্ণের প্রবেশ করলে, পরশুরাম জাগ্রত হয়ে উঠেন এবং সমূহ বৃত্তান্ত জানতে চান। তখন কর্ণ সমস্ত বৃত্তন্ত গুরুকে জানান। কর্ণের কথা শ্রবণ করে পরশুরাম সে কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এর ফলে উক্ত কীট তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে ও শাপমুক্ত হয়ে পরশুরামকে প্রণাম করে যথাস্থানে প্রস্থান করে।
(মহাভারত– শান্তি)

দিবোদাস

(১)ঋগবেদে উল্লিখিত দিবোদাস একজন ধর্মভীরু ন্যায়বান রাজা। তাঁর জন্য ইন্দ্র একশত প্রস্তরপুরি বিদীর্ণ করেন।

(২) কাশির রাজা হর্যশ্বের ছেলে সুদেব, সুদেবের ছেলে দিবোদাস। দেবগণ আকাশ হতে পুষ্প ও রত্ন ইত্যাদি এঁকে দান করতেন বলে তাঁর এ নাম। হর্যশ্ব ও তাঁর ছেলে সুদের দুজনেই হৈহয় বা বীতহব্যের ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হন। বাবার মৃত্যুর পর দিবোদাস রাজা হন। বীতহব্যের ছেলেরা আবার কাশি আক্রমণ করে দিবোদাসকে পরাজিত করে ও তাঁর ছেলেদের বধ করে। অন্য উপায় না দেখে দিবোদাস পলায়ন করে মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হন। ভরদ্বাজ এঁকে আশ্বাস দিয়ে এক যজ্ঞ করেন। তার ফলে দিবোদাসের প্রতর্দন নামে এক ছেলে হয়। এ ছেলে ভরদ্বাজের যোগবলে পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দিবোদাস তাঁর ছেলেকে পরাক্রান্ত দেখে হৃষ্টচিত্তে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তারপর বাবার আজ্ঞায় প্রতর্দন বীতহব্যের শত ছেলে বিনাশ করেন।

বীহব্য প্রতর্দনের ভয়ে পলায়ন করে ভৃগু মুনির শরণাপন্ন হন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসারণ করে ভৃগুর আশ্রমে এসে বীতহব্যকে ত্যাগ করার জন্য ভৃগু মুনিকে অনুরোধ করেন। মুনি তার কারণ জানতে চাইলে প্রতর্দন সমস্ত ঘটনা বলেন এবং আরও বলেন যে তাঁকে বধ করলে প্রতর্দন পিতৃঋণ হতে মুক্ত হবেন। তখন শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য ধর্মাত্মা ভৃগু বীতহব্যকে ব্রাহ্মণ করে দিয়ে বরেন যে, এখানে কোন ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রতর্দন তখন বীর্যবান বীতহব্যকে জাতিত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন জেনে প্রসন্নমনে ফিরে যান। (মহাভারত– অনুশাসন)

(৩) ধন্বন্তরির ছেলে কেতুমান, কেতুমানের ছেলে দিবোদাস, দিবোদাসের ছেলে প্রতর্দন। (বিষ্ণুপুরাণ)

(৪) পুরুবংশিয় রাজা হর্যশ্বের ছেলে মুদগল। এ মুদগল হতে জাত ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়ে মৌদগল্য নামে খ্যাত হন। মুদগলের ছেলে বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের ছেলে দিবোদাস ও মেয়ে অহল্যা। দিবোদাসের ছেলে মিত্রয়ুর ছেলে রাজা চ্যবন। (বিষ্ণুপুরাণ)

দিলীপ

সূর্যবংশের প্রসিদ্ধ রাজা। তার স্ত্রীর নাম সুদক্ষিণা। দিলীপের সন্তান না হওয়ায় তিনি সস্ত্রীক কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে নিজ অসীম মানসিক কষ্টের বিষয় জানান। পরে বশিষ্ঠের আদেশানুসারে নিজ আশ্রমস্থিত নন্দিনিনামক কামধেনুর আরাধনা করে অভিষ্ট ছেলে লাভ করে ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম রঘু। অংশনুমানের ছেলে ও ভগীরথের বাবা রামের পূর্বপুরুষ। দিলীপ একবার স্বর্গ থেকে ফেয়ার সময়ে সুরভি গাভিকে অতিক্রম করেন। সুরভি এভাবে দিলীপ দ্বারা অপমানিত হয়ে দিলীপকে অভিশাপ দেন– সেবা দ্বারা তার মেয়ে নন্দিনির প্রীতি সাধন না করতে পারলে দিলীপের কোন সন্তান হবে না। রাজা বহুদিন নিঃসন্তান থেকে বশিষ্ঠ ঋষির পরামর্শে স্ত্রী সুদক্ষিণাকে সাথে নিয়ে নন্দিনির সেবা করতে আসেন।

নন্দিনির বরে দিলীপের ছেলে রঘুর জন্ম হয়।

দির্ঘতমা

ঋষি উতথ্য ও মমতার ছেলে। মমতা যখন গর্ভিণি ছিলেন, তখন তাঁর দেবর ও দেবতাদের পুরোহিত বৃহস্পতি তাঁর সঙ্গে সংগমেচ্ছু হন। তখন মমতা বলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই হতেই আমি গর্ভিতা হয়েছি, তোমার বীর্য অমোঘ।" গর্ভস্থ শিশুও বৃহস্পতিকে রেতঃপাত করতে নিষেধ করেন; কারণ এ গর্ভমধ্যে দুজনের

স্থিতি সম্ভব নয়। কিন্তু বৃহস্পতি শিশুর কথায় কর্ণপাত না করে মার অসম্মতিতে রেতঃপাত করেন। তখন শিশু নিজের পদদ্বারা শুক্র প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেন। এতে বৃহস্পতি রেগে গিয়ে গর্ভস্থ ছেলেকে এ বলে অভিসম্পাত দেন, "তুমি দির্ঘ তামসে প্রবিষ্ট হবে, অর্থাৎ অন্ধ হবে।" উতথ্যের এ ছেলে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হয় দির্ঘতমা। প্রদ্বেষী নামে এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দির্ঘতমা ধার্মিক বেদজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সুরভি-সন্তান কামধেনু হতে গোধর্ম শিক্ষা করে যত্রতত্র সংগম করার জন্য প্রতিবেশি ক্রুদ্ধ মুনিগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তাঁর স্ত্রীও স্বামির এ ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে অন্ধ স্বামিকে ভরণপোষণ করতে অস্বীকার করেন। দির্ঘতমার ছেলেরা মার আদেশে তাঁকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। বলিরাজা স্নানের জন্য গঙ্গায় এসে তাঁকে এ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান এবং তেজস্বি দেখে সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যান ও নিজ স্ত্রী সুদেষ্ণাকে দির্ঘতমার কাছে গমন করতে বলেন। সুদেষ্ণা তাঁকে বৃদ্ধ ও অন্ধ দেখে অবজ্ঞাভরে স্বয়ং না গিয়ে তাঁর শূদ্রা দাসিকে বৃদ্ধ ঋষির কাছে পাঠিয়ে দেন। ফলে, শূদ্রযোনিতে দির্ঘতমা কাক্ষিবানাদি একদশ পুত্রের জন্ম দেন। রাজা এ ঘটনা জ্ঞা হয়ে পুনরায় স্ত্রী সুদেষ্ণাকে দির্ঘতমার কাছে প্রেরণ করেন। তখন দির্ঘতমা রাণির অঙ্গ স্পর্শ করে বলেন যে, তাঁর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি তেজস্বি ছেলে হবে এবং তাদের নামে এক একটি দেশ নামাঙ্কিত হবে। যথা– অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ এবং সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ হবে। (মহাভারত– আদি)

দুর্গা

পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বের আদি কারণ ও শিবপত্নী। মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ হতে বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। দেবতারা বিপন্ন হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা শিব ও দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেন ও তাঁদের বিপদ হতে রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। কারণ, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হয়েছে। বিষ্ণু তখন বলেন যে, এ অসুরকে বধ করতে হলে নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, স্ব স্ব তেজের কাছে এ প্রার্থনা করতে হবে যে, এ সমবেতভাবে উৎপন্ন তেজ হতে যেনো এক নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। এ নারীই অসুরকে বিনাশ করবেন। এ শুনে ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের দেহ হতে তেজ নির্গত হয় এবং এ সমবেত তেজরাশি হতে এক নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ

অস্ত্রসমূহ এঁকে দান করেন। এ দেবি মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন। প্রথম বার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতয়িবার ও তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গারূপে। রাত্রে ভদ্রকালির মূর্তি স্বপ্নে দেখে মহিষাসুর এ মূর্তির আরাধনা করেছিলেন। দেবি মহিষাসুরের কাছে এলে মহিষাসুর বলেন, "আপনার হাতে মৃত্যুর জন্য? কোন দুঃখ নেই; কিন্তু আপনার সঙ্গে আমিও যাতে সকলের পূজিত হই তারই ব্যবস্থা করুন।" দেবি তখন বললেন, "উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালি ও দুর্গা– এ তিন মূর্তিতে তুমি সব সময় আমার পদলগ্ন হয়ে দেবতা, মানুষ ও রাক্ষসদের পূজ্য হবে"। (দেবি ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডি ও কালিকাপুরাণ)

দুর্যোধন

ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ ছেলে। মার নাম গান্ধাবি। ভানুমতি নামে মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিণয় হয়। পর চিত্রাঙ্গদ রাজার মেয়েকে স্বয়ম্বর সভা হতে অপহরণ করে বিয়ে করেন। তাঁর পুত্রের নাম লক্ষ্মণ ও মেয়ের নাম লক্ষ্মণা।

মেয়ে বিয়ের যোগ্য হলে তিনি তাঁর স্বয়ম্বর ঘোষণা করেন। কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব সে মেয়েকে অপহরণ করলে দুর্যোধন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দি করেছিলেন। বলরাম শাম্বকে পরিত্যাগ করার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দুর্যোধন সে অনুরোধ রক্ষা না করায় বলরাম রেগে হস্তিনাপুর ধ্বংস করতে উদ্যত হন। তখন দুর্যোধন ভীত হয়ে শাম্বকে কারামুক্ত করে তাঁর সাথে লক্ষ্মণার বিয়ে দেন এবং এরূপে বলরামকে সন্তুষ্ট করে তাঁর নিকট শিষ্য ভাবে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন।

তিনি পাণ্ডব বিদ্বেষি ছিলেন। তাঁদের অনিষ্টের জন্য সর্বদাই চক্রান্ত করতেন। কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন তাঁর মন্ত্রি ছিলেন। তাঁরা সর্বদাই পাণ্ডবদের অনিষ্ট সাধনের জন্য তাঁকে কুপরামর্শ দিতেন।

বাল্যকালে ভিমকে খাবারের সাথে বিষ মেশানো, হস্তিনাপুর হতে বের করে পাণ্ডবগণকে খাণ্ডব প্রস্থে পাঠানো, বারণাবতে জতুগৃহদাহ এবং যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বান ইত্যাদি দুরভিসন্ধিমূলক যাবতীয় কার্য দুর্যোধনের দুষ্টাশয়তার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত।

দ্যুতসভায় দ্রৌপদির প্রতি অযথা কুৎসিত ব্যবহার এবং বনবাস ও অজ্ঞাত বাস হতে প্রত্যাগত পাণ্ডুবগণকে তাঁদের পৈতৃক রাজ্যের কিয়দংশ দানেও অনিচ্ছা প্রদর্শন এ দু টিই পরিণামে তাঁর সর্বনাশের মূল কারণ হয়েছিল। এ মহাপাপে ঘোরতর ভারত সমরে সমস্ত কুরুস্থল বিনষ্ট হয় এবং পরিশেষে দুর্যোধন ভিমের সাথে গদাযুদ্ধে নিহত হন।

দুষ্মন্ত

চন্দ্রবংশের নরপতি। তাঁর রাজধানি হস্তিনাপুর। তিনি একদিন শিকার করতে গিয়ে কণ্বমুণির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে ঋষির পালিত মেয়ে শকুন্তলাকে দেখে তাঁর অলৌকিক রূপ গুণে মুগ্ধ হয়ে গান্ধর্ব বিধানে তাঁকে বিয়ে করেন। পরে তাঁর ঔরসজাত শিশুছেলেকে নিয়ে শকুন্তলা স্বামির নিকট উপস্থিত হলে দুষ্মন্ত প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেন নি। বৈদবাণিতে সমস্ত অবগত হয়ে পরে স্বপুত্র শকুন্তলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ ছেলে খ্যাতিমান ভরত।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে গর্ভবতি শকুন্তলার পতিগৃহে গমন, পথিমধ্যে রাজদত্ত স্মরণ চিহ্ন, অঙ্গুরিয় স্খলন, দুষ্মন্ত দ্বারা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, অসহায়া রোরুদ্যমানা শকুন্তলার অপ্সরা লোকে গমন সেখানে ছেলেপ্রসব, মৎস্যের উদর হতে প্রাপ্ত অঙ্গুরিয় দর্শনে রাজার শকুন্তলা বিষয়ক সর্ববৃত্তান্ত স্মরণ, সে জন্য অনুতাপ, অসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্যে স্বর্গগত রাজা দুষ্মন্তের প্রত্যাবর্তন কালে শকুন্তলার সাথে পুনর্মিলন এবং মহর্ষি কশ্যপের মুখে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের কারণ অবগত হয়ে ছেলে ও শকুন্তলার সাথে রাজধানিতে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত আছে।

অপ্সরা মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়, মুণি সদ্য প্রসূত অবস্থায় তাঁকে পেয়ে পালন করেন।

দ্রুপদ

তিনি পাঞ্চাশ দেশের রাজা ও পৃষতের ছেলে। এর অন্য নাম রাজ্জসেন। দ্রুপদ পাণ্ডব ও কৌরবদের শিক্ষাগুরু দ্রোনের বাল্যসখা ছিলেন। দ্রোণ ও দ্রুপদ প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে ক্রীড়া করতেন। পৃষতের মৃত্যুর পর দ্রুপদ পাঞ্চাশ দেশের রাজা হন এবং ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণও তপস্যা ও ধনুর্বেদের চর্চায় মগ্ন থাকেন। বাল্যসখা দ্রুপদ একদা দ্রোণকে বলেছিলেন যে, তিনি রাজ্যলাভ করলে সে রাজ্য তিনি একদিন দ্রোণকে দেবেন। রাজ্যলাভের পর একদিন দ্রোণ দ্রুপদের কাছে এসে তাঁর সখ্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু দ্রুপদ বলেন যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার সখ্য সম্ভব নয়। ঐশ্বর্যগর্বিত বাল্যসখা দ্রুপদের কাছে অপমানিত দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বসবাস করতে থাকেন। কিছুকাল পরে দ্রোণ কুরুপান্ডবদের অস্ত্রশিক্ষকের পদে ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁদের যথারীতি শিক্ষিত করে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তিনি শিষ্যদের পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করে দ্রুপদকে বন্দি করে দ্রোনের নিকট উপস্থিত করেন। তখন দ্রুপদ গঙ্গার উত্তরস্থ অহিচ্ছত্র দেশ দ্রোণকে দান করে তাঁর সঙ্গে সখ্য

স্থাপন করেন। কিন্তু বলপূর্বক বন্ধুত্বস্থাপন দ্রুপদের পক্ষে অপমানজনক হয়। প্রতিশোধেচ্ছু দ্রুপদ দ্রোণহন্তা ছেলেলাভের জন্য যাজ ও উপযাজ নামে দু স্নাতক তপস্বি ব্রাহ্মণের সাহায্যে এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞাগ্নি হতে খরগধনুধারি বর্মভূষিত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক ছেলে ও যজ্ঞবেদি থেকে শ্যামাঙ্গি দ্রৌপদি নামে এক মেয়ে (যাজ্ঞসেনি বা কৃষ্ণা) উত্থিতা হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনের প্রত্যুষে তিন পৌত্রসহ দ্রুপদ দ্রোণের হাতে নিহত হন এবং সে দিন উদৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোনকে হত্যা করেন। দ্রুপদের অন্য নপুংসক সন্তান শিখন্ডি ভিষ্মের মৃত্যুর কারণ হণ। (মহাভারত– আদি)

দুঃশলা

ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ে এবং জয়দ্রথের স্ত্রী। অভিমন্যু হত্যার পর জয়দ্রথ অর্জুন দ্বারা নিহত হলে দুঃশলা নিজ শিশুছেলে সুরথকে রাজ্যাভিষিক্ত করে স্বয়ং রাজ্যশাসন করেছিলেন।

দুঃশাসন

ধৃতরাষ্ট্রের তৃতিয় ছেলে, তিনি অত্যন্ত দুঃশিল ও ক্রুরমতি ছিলেন। দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হলে দুর্যোধনের আদেশে দ্রৌপদিকে চুল ধরে সভায় আনয়ন করেন এবং তাঁর বস্ত্রঅপহরণ করে যৌনাচারেপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের যথেষ্ট দুশ্চরিত্রতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন।

ভিম দুঃশাসনের সে নৃশংস ব্যবহারে যারপরনাই ব্যথিত হয়ে এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, দুরাত্মা দুঃশাসনের পাষাণ হৃদয় দীর্ণ করে রক্ত পান করবেন এবং সে রুদিরাক্ত হাতে দ্রৌপদির কেশ বন্ধন করে দিবেন।

পরে ভারত যুদ্ধের ১৭ তম দিনে মহাবল পরাক্রান্ত ভিম নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন।

দেবকি

(১) বিদর্ভরাজ আহুকের দু ছেলে ১. দেবক ও ২. উগ্রসেন। দেবকের সাত মেয়ের মধ্যে কৃষ্ণের মা দেবকি অন্যতমা। বসুদেব এ সাত মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। উগ্রসেনের ন ছেলে; তার মধ্যে কংস কৃষ্ণের বিরোধি। বসুদেবের ঔরসে দেবকির গর্ভে আটটি ছেলে হয়; অষ্টম ছেলে শ্রীকৃষ্ণ। দেবকির বিবাহের পর নারদ এসে কংসকে সংবাদ দেন যে, কংস দেবকির অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতে নিহত হবেন।

এ সংবাদ পেয়ে কংস দেবকিকে হত্যা করতে উদ্যত হন, কিন্তু বসুদেব প্রতিশ্রুতি দেন যে, দেবকির গর্ভজাত সকল সন্তানকে জন্মমাত্র কংসের হাতে সমর্পণ করবেন। সে দিন হতে বসুদেব ও দেবকি কংসের কারাগারে বন্দি অবস্থায় থাকেন। এক এক করে তাঁদের সাতটি সন্তানকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কংস হত্যা করেন। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মালে বসুদেব সদ্যোজাত শিশুকে যমুনাপারে ব্রজধামে নন্দের গৃহে রেখে, নন্দের স্ত্রীর সদ্যোজাত মেয়েকে এনে দেবকির নিকট রেখে কংসকে প্রতারিত করেন। কংস উক্ত মেয়েকে অষ্টম গর্ভের সন্তান মনে করে পাথরের ওপর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেন। তখন মহামায়ার অংশীভূতা এ মেয়ে স্বর্গে অদৃশ্য হয়ে যান। যাবার সময় মহামায়া বলে যান, যে কংসকে নিহত করবে, সে অন্য স্থানে আছে। পরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হন এবং বসুদেব ও দেবকি কারাগার হতে মুক্তিলাভ করেন। যদু বংশের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর সময়ে বসুদেব ও দেবকি জীবিত ছিলেন। অর্জুনের হাতে যাদব নারীদের রক্ষার ভার দিয়ে বসুদেব যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন এবং দেবকি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামির চিতায় সহমৃতা হন।

(২) তিনি যুধিষ্ঠির পত্নী। শৈব্যরাজ গোবাসন তাঁর বাবা।

দেবতা

দেবতা অর্থে সমস্ত দেবতাকেই বোঝায়।

দেবগুরু

বৃহস্পতি দেখুন।

দেবযানি

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মেয়ে। বৃহস্পতির ছেলে কচ বিদ্যাশিক্ষার জন্য শুক্রের নিকট গিয়ে তাঁর ঘরে বহদিন অবস্থান করেন। সে কালে কচের সদ্ব্যহারে তাঁর প্রতি দেবযানির অনুরাগ সঞ্চার হয়। কচ পাঠ সমাপ্ত করে স্বর্গে গমন কালে দেবযানি তাঁকে পতিত্বে বরণ করার ইচ্ছা করেন। মহামতি কচ গুরুকন্যা বোনবোধে তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলে দেবযানি এ বলে তাঁকে অভিসম্পাত করেন যে, "তোমার শিক্ষিত মৃত সঞ্জীবনি বিদ্যা ফলদায়িনী হবে না।" কচও বিনাপরাধে অভিশপ্ত হওয়ায় অতিশয় কুপিত হযে তাঁকে অভিশাপ দেন যে, "তুমি ব্রাহ্মণের স্ত্রী না হয়ে ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী হবে।

দৈত্যরাজ বৃষপর্বের মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানির সখি হয়েছিলেন। একদিন ভয়ে নদী স্নান করতে গিয়ে পরস্পর কলহে লিপ্ত হন। তাতে শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধ ভরে দেবযানিকে অরণ্য মধ্যবর্তি একটি জল শূন্য কুয়ায় নিক্ষেপ করে বাড়ি বাড়ি

ফিরে আসেন। চন্দ্রবংশিয় মহারাজ যযাতি শিকারের জন্য ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ সে বনে উপস্থিত হন এবং জল অন্বেষণ করতে গিয়ে কুপমধ্যে দেবযানিকে দেখে তাঁকে তোলেন।

দেবযানি শর্ম্মিষ্ঠার অত্যাচারের কথা বাবাতে জানালে শুক্রাচার্য রেগে বৃষপর্ব রাজার রাজ্য পরিত্যাগ করতে উদ্যত হন। দৈত্যপতি নিজ মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানির দাসিপদে নিযুক্ত করে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের রাগ মোচন করেন।

শেষে শুক্রাচার্যের আদেশে যযাতি দেবযানিকে বিয়ে করেন। দেবযানি ভর্তাগৃহে গমন কালে শর্ম্মিষ্ঠা তাঁর পরিচারিকা হয়ে গমন করেন। যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে ১. যদু ও ২. তুর্বসু নামে দু ছেলে জন্মে। যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকেও বিয়ে করেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে ১. অনু, ২. দ্রুহ্য ও ৩. পুরু নামে তাঁর আর তিন পুত্রের জন্ম হয়।

দেবি

মহাদেবের স্ত্রীকে দেবি বা মহাদেবি আখ্যা দেয়া হয়। তিনি হিমালয়ের মেয়ে। শিবের শক্তিরূপে দেবির চরিত্র দ্বিবিধ– একদিকে তিনি নম্র ও স্নিগ্ধ এবং অপর দিকে উগ্র। উগ্রভাবের জন্যই দেবি অধিক পূজিতা হন। নানা প্রকার কর্ম, বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন আকারের জন্য দেবি বিভিন্ন নামে পরিচিতা। নম্র ও স্নিগ্ধ ভাবের জন্য দেবির নাম উমা, গৌরি, পার্বতি, হৈমবতি, জগন্মাতা ও ভবানি। উগ্রমূর্তির জন্য তাঁর অন্য নাম– কালি, ক্ষ্যামা, চন্ডি, চন্ডিকা ও ভৈরবি। এ উগ্রমূর্তিতে দেবি নানাপ্রকার আসুরিক পদ্ধতিতে পূজিতা হয়ে থাকেন।

চন্ডিতে আমরা দেবিকে বিভিন্ন মূর্তিতে দেখতে পাই। চন্ডিতে দেবির বিভিন্ন মূর্তিতে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের কথা বর্ণিত আছে। চন্ডিতে দেবি বিভিন্ন নামে নানাঙ্কিতা হয়েছেন; যথা– দুর্গা, দশভূজা, সিংহবাহিনি, মহিষমর্দিনি, জগদ্ধাত্রি, কালি, মুক্তকেশি, তারা, ছিন্নমস্তা ও জগদগৌরি। স্বামি হতে দেবি এ সকল নাম প্রাপ্ত হয়েছেন; যথা– ভগবতি, ঈশানি, ঈশ্বরি, কপালিনি, কৌশিকি, কিরাতি, মহেশ্বরি, রুদ্রাণি, সর্বাণি, শিবা, ত্রম্ব্যকি। দেবির জন্ম ও গুণসূচক নাম– আদ্রিজাম গিরিজা, দক্ষজা, মেয়ে, মেয়েকুমারি, সতি, অনন্তা, আর্যা, বিজয়া, ঋদ্ধি, ভ্রামরি, কর্ণমোতি, শিবদূতি, দক্ষিণা, সর্বমঙ্গলা, সিংহরথি, অম্বিকা ইত্যাদি। নানারূপ তপস্যায় রতা বলে দেবিকে অর্পণা ও কাত্যায়নি বলা হয়। ভূত ও প্রেতের নায়িকারূপে তাঁর নাম ভূতনায়কি ও গণনায়কি নামেও আখ্যাত হয়েছেন; যথা– ভদ্রকালি, ভিমাদেবি, চামুন্ডা, মহাকালি, মহামারি, মহাসুরি, মাতঙ্গি ও রক্তদন্তি।

দ্রোণ

(১) মহর্ষি ভরদ্বাজের ছেলে। একদিন গঙ্গাস্নানকালে আর্দ্রবক্ষে প্রায়নগ্ন অপ্সরা ঘৃতাচিকে দেখে কামার্ত ভরদ্ভাজের শুক্রপাত হয়। সে শুক্র দ্রোণ নামে এক যজ্ঞিয় পাত্রে তিনি রক্ষা করেন। সে যজ্ঞিয় পাত্র হতে এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্রোণ বা পরিমাপক পাত্রে এ পুত্রের জন্ম হয় বলে এর নামকরণ হয় দ্রোণ। দ্রোণ ভরদ্বাজের শিষ্য ও অগ্নির ছেলে অগ্নিবেশ্য মুনির কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। মহর্ষি শরদ্বানের মেয়ে কৃপিকে দ্রোণ পিতৃআজ্ঞায় বিয়ে করেন। এঁদের একমাত্র ছেলে জন্মমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষাবর করায় অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন। এ সময়ে দ্রোণ পরশুরামের কাছে মহাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করার জন্য মহেন্দ্র পর্বতে যান এবং তাঁর কাছে প্রথমে ধনরত্ন প্রার্থনা করেন। পরশুরাম বলেন, "আমার সমস্ত ধনরত্ন ব্রাহ্মণদের ও পৃথিবী কশ্যপকে দান করেছি, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও এ শরির ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এর মধ্যে আমার শরির ছাড়া তোমার ইচ্ছামতো সামগ্রি প্রার্থনা করো।" তখন দ্রোণ তাঁর কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করেন। পাঞ্চালরাজ পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন। তাঁর ছেলে দ্রুপদ ছিলেন দ্রোণের ক্রীড়াসঙ্গি। দ্রুপদ দ্রোণকে শৈশবে বলেছিলেন যে, রাজ্যলাভ করলে তিনি দ্রোণকে অর্ধরাজ্য দান করবেন। দ্রোণ অতি দরিদ্র ছিলেন। এমন কি, নিজ ছেলে অশ্বত্থামা দুগ্ধপানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, তাও দিতে তিনি অক্ষম হন। অশ্বত্থামার সমবয়সি বালকরা তাকে পিটুলিগোলা জল দুধ বলে পান করিয়ে প্রতারিত করে। এ ঘটনা জেনে দারিদ্র্যের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দ্রোণ বাল্যবন্ধু দ্রুপদের নিকট পূর্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে উপস্থিত হন। দ্রুপদ তাঁর সখ্য অস্বিকার করে দ্রোণকে একদিনের মতো ভিক্ষা দিতে চেয়ে অপমানিত করেন। দ্রোণ রেগে গিয়ে ফিরে এসে হস্তিনাপুরে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় একদিন দ্রোন ক্রীড়ারত কৌরব রাজকুমারের কূপমধ্যে পতিত বিটার (এক প্রকার ছোট বল) পশ্চাতে ঈষিকা বিদ্ধ করে উহা উত্তোলন করেন। ভিষ্ম এ বিবরণ শুনে তাঁর পরিচয় জানতে পারেন ও তাঁকে কৌরব ও পান্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার আচার্যপদে বরণ করেন। সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জুনই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বি করার জন্য তিনি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর ছেলে একলব্যের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করেন। অস্ত্রশিক্ষার পর দ্রোণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রাজকুমারদের দিয়ে দ্রুপদের রাজ্য অধিকার করে তাঁকে বন্দী করেন। পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে ক্ষমাশিল দ্রোণ দ্রুপদের কোন অনিষ্ট করলেন না। দ্রোণ তাঁর অর্ধরাজ্য গ্রহণ করে বাকি অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দেন। রাজা না হলে রাজার সঙ্গে সখ্যস্থাপন করা যায় না। তাই তিনি অর্ধরাজ্য গ্রহণ করে পূর্বসখার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন ও তাঁকে অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

তখন দ্রুপদ বুঝতে পারেন যে, ব্রাহ্মণ না হলে দ্রোনাচার্যের ধ্বংস অসম্ভব। সে জন্য তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এরই ফলে দ্রোনহন্তা ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্নের হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ কৌরবান্নে প্রতিপালিত বরে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। অর্জুন গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে দ্রোণ অর্জুনকে বলেন, "আমি যদি কখনো তোমার সঙ্গে যুদ্ধে রত হই তখন তুমিও আমার সঙ্গে প্রতিযুদ্ধে লিপ্ত হবে। গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে কোনরূপ সঙ্কোচ প্রকাশ করবে না।" অর্জুনের এ প্রতিশ্রুতিই দ্রোণের গুরুদক্ষিণা ছিল। এ প্রতিশ্রুতির জন্যই কৌরবগণ দ্বারা বিরাট রাজ্যের গোঅপহরণকালে বৃহন্নলারূপি অর্জুন সম্মোহনাস্ত্রে দ্রোণ প্রভৃতিকে মোহাচ্ছন্ন করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গুরুর সঙ্গে ভিষণ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে এগারো হতে পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত দ্রোণ সেনাপতি ছিলেন। ভিষ্মের সেনাপতিত্বের ফলে সপ্তম দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ বিরাটপুত্র শঙ্খকে বধ করেন। ত্রয়োদশ দিবসে চক্রব্যূহ রচান করে তিনি অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেন। চতুর্দশ দিবসে রাজা বৃহৎক্ষত্র, শিশুপালছেলে ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ছেলে ক্ষত্রধর্মাকে নিহত করেন এবং শেষ পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করেন। এতদ্ভিন্ন বহু পান্ডব সেনা তাঁর হাতে বিনষ্ট হয়। অস্ত্রত্যাগ না করলে দ্রোণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয় ছিলেন বলে, কৃষ্ণের পরামর্শমতো দ্রোণকে অস্ত্রত্যাগ করার জন্য তাঁর ছেলে অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ তাঁকে শোনান প্রয়োজন বলে স্থির করা হয়। যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য কারো কথা দ্রোণ বিশ্বাস করবেন না বুঝে, যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা সত্বেও তাঁকে সম্মত করানো হয় দ্রোণের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য। ভিম মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক হাতিকে গদাঘাতে বধ করেন এবং দ্রোণকে এ সংবাদ দেন। দ্রোণ উক্ত সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। তিনি যুদ্ধে বিরত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেন। যুধিষ্ঠির তখন কৌশলপুর্বক বলেন, "অশ্বত্থামা 'হত' এবং পরে অস্ফুটস্বরে বলেন, 'ইতি গজঃ'। অর্থাৎ, অশ্বত্থামা নামক হস্তি নিহত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে শোকার্ত দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের শেষ উক্তি শ্রবণে অক্ষম হন এবং ছেলেশোকে কাতর হয়ে রথের উপরই যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হন। এ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের রথোপরি আরোহণপূর্বক তার কেশাকর্ষণ করে খড়্গ দ্বারা শিরশ্চেদ করেন এবং কৌরব সেনাগণের সম্মুখে উক্ত শির নিক্ষেপ করেন। (মহাভারত)

(২) বসুশ্রেষ্ঠ। তিনি ভগবানের দর্শন পাবার আশায় গন্ধমাদন পর্বতে স্ত্রী ধরার সঙ্গে কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান এঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে বলেন– জন্মান্তরে তোমরা হরির দর্শন পাবে। তারপর দ্রোণ নন্দরূপে ও ধরা যশোদা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

(৩) এক প্রকার মেঘের নাম।

ভরদ্বাজ মুণির ছেলে। তিনি বাবার নিকট সাঙ্গবেদ এবং পিতৃশিষ্য অগ্নিবেশের নিকট হতে ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন। পরে পরশুরামের শিষ্য হয়ে বহু অস্ত্রশস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তার স্ত্রীর নাম কৃপি, তাঁর গর্ভে অশ্বত্থামা নামে এক ছেলে জন্মে।

দ্রোণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করার জন্য তার সহাধ্যায়ি বাল্যবন্ধু দ্রুপদ রাজার নিকট যান। দ্রুপদ কটুবাক্য প্রয়োগে তাঁকে প্রত্যাখান করলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হয়ে হস্তিনাপুরে কৃপাচার্যের আশ্রমে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করেন। সেখানে একদিন কজন বালক গুলিকা খেলা করছিল। তাদের গুলিকা একটি শুষ্ক কুয়ায় পড়লে তারা তা তুলতে অসমর্থ হয়ে দুঃখিত মনে কুয়ার নিকট দাঁড়িয়ে থাকে। এ সমসয়ে দ্রোণ সেখানে উপস্থিত হয়ে সমুদয় অবগত হন এবং ঐ কুপমধ্যে আর একটি অঙ্গুরিয় নিক্ষেপ করে গুলিকা ও অঙ্গুরিয় উভয়ই বাণ দ্বারা উত্তোলন করেন।

তা দেখে বালকগণ আশ্চর্য হয়ে শহরের মাঝে দ্রোণের এরূপ অসাধারণ শরনৈপুণ্যের কথা প্রচার করে। ভিষ্ম এ বিষয়ে যথাযথ অবগত হয়ে কৌরব ও পাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রশিক্ষার জন্য দ্রোণকে গুরুপদে নিযুক্ত করেন। শিষ্যগণের মধ্যে অর্জুন তার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর সৎস্বভাব, শিক্ষা বিষয়ে যত্নাতিশয় ও নৈপুণ্য দেখে গুরু খুবই সন্তুষ্ট লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে আচার্য গুরু দক্ষিণা স্বরূপ দ্রুপদ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দি করে আনয়ন করার আদেশ দিলে শিষ্যদের মধ্যে অর্জুন তাঁর সে আদেশ পালন করেন।

দ্রোণাচার্য পরাজিত দ্রুপদ রাজার নিকট হতে পঞ্চালের অর্ধেক রাজ্য কেড়ে নিয়ে তার অধিপতি হন। এবং নিজ ছেলে কলত্রকে নিয়ে সেখানে পরম সুখে বাস করেন। কালে ভারত সংগ্রাম উপস্থিত হলে তিনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন এবং অভিমন্যুবধে সাতরথির অন্তর্গত ছিলেন। যুদ্ধের ১৫তম দিনে তুমুল যুদ্ধ করে বিরাট ও দ্রুপদ রাজাকে হত্যা করেন। পরে অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি মারা পড়লে "অশ্বত্থামানিহত" এ কথা যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনে পুত্র শোকে তিনি নিতান্ত ম্রিয়মান হয়ে যোগাবলম্বনে রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। দুষ্টমতি দৃষ্টদ্যুম্ন বৈরনির্যাতনের অভিপ্রায়ে দ্রোণাচার্যের রথে চড়ে খড়গাঘাতে তাঁর মাথা কেটে ফেলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য ৮৫ বছর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন।

দ্রৌপদি

পঞ্চাল দেশাধিপতি দ্রুপদ রাজার তনয়া। তিনি পাঞ্চালি, যাজ্ঞসেনি, কৃষ্ণা ও দ্রৌপদি নামে অভিহিত হতেন। পাণ্ডবগণ মার সাথে জতুগৃহদাহ হতে নিস্কৃতি পেয়ে যখন প্রচ্ছন্নভাবে একচক্রা নগরিতে বাস করেন, তৎকালে দ্রৌপদির বাবা যজ্ঞসেন বা দ্রুপদ একটি দুরবনমনয়ি সুদৃঢ় দণুক ও মৎস্যচক্র স্থাপিত করে এরূপ ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি সে ধনুকে জ্যা স্থাপন করে মৎস্যচক্র ভেদ করতে পারবেন ইনিই তার মেয়ে দ্রৌপদিকে বিয়ে করবেন। এ উপলক্ষে সভাস্থ অনেক রাজন্যবগ্য প্রথমত শরাসনে শরসন্ধান করতেই অসমর্থ হয়ে দ্রৌপদি লাভে হতাশ হন। পরে মহাবীর কর্ণ ধনুকে জ্যা রোপণ করলে দ্রৌপদি উঠে বললেন, আমি সূতছেলেকে পতিত্বে বরণ করব না। তা শুনে কর্ণ বিরত হয়ে সভায় উপবিষ্ট হলেন। অনন্তর ছদ্মবেশি অর্জুন যথাবিধি লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদিকে লাভ করেন। পরে মা ও ব্যাসদেবের আদেশশানুসারে পাঁচ পাণ্ডবের সাতে তাঁর বিয়ে হয়।

দ্রৌপদি রমণিকুলের উৎকৃষ্ট অন্যতম রত্ন। একদিন কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা তাঁকে জিজ্ঞোস করেন তুমি কি কাজ করে পতির প্রীতি লাভ কর। তাতে দ্রৌপদি উত্তর করেন যে, "আমি সর্বদা অহঙ্কার ও কাম ক্রোধ পরিহার করে বিশেষ যত্নপূর্বক পতির পরিচর্যা করি। কখনও তাদের প্রতিকুলাচরণ বা সেবায় আলস্য করি না। আমার ভর্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ পান বা সেবন করতে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন আমিও তৎসমূদয় পরিহার করি। স্বামি অন্য কোন স্থান হতে গৃহে আগমন করলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান করে আসন ও উদকাদি দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করি। পতি অস্নাত, অভূক্ত বা অসুপ্ত থাকলে আমি কখনও স্নান, ভোজন বা শয়ন করি না। আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্যমশিলতা ও গুরু শুশ্রূষা দ্বারাই ভর্তগণ আমার বশতাপন্ন হয়েছেন। আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করে যে ধর্ম তাই স্ত্রীলোকদের ধর্ম।"

তিনি আরও বলেছিলেন যে, "পাণ্ডবেরা আমার ওপর যাবতিয় পোষ্যবর্গের ভার সমর্পণ করেছেন। আমি সকলে কৃতাকৃত কর্ম পরিদর্শন করি। গৃহ, গৃহোপকরণ ও ভোজন দ্রব্য সমস্ত সুন্দর, পরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ করে রাখি। পরিচারকেরা অভুক্ত অথবা অসুপ্ত থাকতে আমি ভোজন বা শয়ন করতে ইচ্ছা করি না। আমি চিরকাল সকলের পরে শয়ন করি এবং সকলের অগ্রে জাগরিত হই।"

যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় দ্রৌপদিকে পণে হারালে দুর্যোধনের আদেশে দুরাত্মা দুঃশাসন চুল ধরে তাকে দ্যূত সভায় আনয়ন করে এবং দ্রৌপদির পরিধেয় পাণ্ডব বস্ত্র গ্রহণ করার জন্য সভামধ্যে তা আকর্ষণ করে। তিনি দুষ্টের ব্যবহারে

ঘোরতর বিপন্ন হয়ে সভাস্থ সকলের নিকট কাতর বচনে অনুনয় করতে লাগলেন। কিন্তু কেউই তার বিপদ নিবারণে যত্নবান হলেন না দেখে তিনি অনন্য মনে সজলনয়নে ভগবান কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। দয়াময় হরির কৃপায় তার পরিধেয় বসন এরূপ অসমি হলো যে দুরাচার দুঃশাসন তা টেনে কোনক্রমে শেষ করতে পারলো না, এরূপে ভগবানের কৃপায় তার লজ্জানিবারণ হয়। কৃষ্ণের প্রতি তার অচলা ভক্তি ছিল, কৃষ্ণও তার সদ্ব্যবহারে পরম প্রীত প্রসন্ন ছিলেন।

বনবাসকালে একদা জয়দ্রথ দ্রৌপদিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পাণ্ডবেরা তাকে সে বিপদ হতে উদ্ধার করেন।

অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাটরাভাজনে দ্রৌপদি নৈসরিন্ধিবেশে রাজমহিষির পরিচারিকা রূপে অবস্থান করেন।

তথায় দশমাস অতীত হলে বিরাটরাজের শ্যালক কুমতি কীচকের কুদৃষ্টিতে পতিত হলেন। কীচকের দ্বারা বিরাটের রাজ্য রক্ষার অনেক আনুকূল্য হতো। সেজন্য বিরাটভবনে কীচকের একাধিপত্য ছিল। সুতরাং তার কৃতকার্য সৎ বা অসৎ যাই হোক কেউ তার বিরুদ্ধবাদি হতে সাহস করতেন না। দুরাত্মা দ্রৌপদির প্রতি একান্ত আসক্ত হয়ে একদিন কোন কাজের ছল করে রাজ্ঞি দ্বারা তাঁকে নিজ আবাস গৃহে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর প্রতি আক্রমণ করার উদ্যম করলে দ্রৌপদি নিতান্ত ভীত হয়ে সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে একেবারে রাজসভায় উপস্থিত হন। দুর্বৃত্ত পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে সভামধ্যে তাঁকে পদাঘাত করে। বিরাটরাজ তার কোনরূপ প্রতিকার করতে সমর্থ হলেন না দেখে দ্রৌপদি পাপাত্মার সমস্ত ঘটনা ভিমের নিকট নিবেদন করেন। ভিম একদিন রাতে নাট্যশালায় কিচককে হত্যা করে তার চিত্ত সুস্থ করেন।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় তিনি পাণ্ডবগণের শিবিরে থাকতেন। একদিন অশ্বত্থামা সেখানে প্রবেশ করে তাঁর ঘুমন্ত পাঁচ ছেলেকে হত্যা করেন। তাতে তিনি যার পর নাই শোকাভিভুত হন।

এরূপ অশেষ কষ্ট ভোগ করে ভারত সমরের অবসানে পাণ্ডবরাজ্য সংস্থাপিত হলে দ্রৌপদি কিছুদিন রাজমহিষি রূপে কালাতিপাত করে পাঁচপাণ্ডবের সাথে মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন। ভর্তৃগণের মধ্যে অর্জুনের প্রতি তাঁর অধিক অনুরাগ ছিলো এ পাপে দ্রৌপদি সশরিরে স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়ে সুমেরু শিখরে গমনের সময় ভূ-পতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

ধন্বন্তরি

(১) তিনি দেববৈদ্য। সমুদ্রমন্থনকালে তিনি অমৃতভান্ড হাতে সমুদ্র হতে উত্থিত হন। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হলে বিষ্ণুর আদেশে দেবতারা সমুদ্র মন্থন

করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার সময় আনুষঙ্গিক আরো জিনিসের মধ্যে শেষে অমৃতহাতে ধন্বন্তরি ও সর্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। তিনি বেদজ্ঞ ও মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ। (বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মহাভারত, ভাগবত)

(২) হরিবংশে ধন্বন্তরির জন্ম সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছেঃ দেবাসুরের অমৃতমন্থনকারে ধন্বন্তরি অমৃত-কলস হতে উৎপন্ন হন। উক্ত সময় তিনি বিষ্ণুর ধ্যানরত ছিলেন। বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে দেখে বলেন, "তুমি জল হতে জন্মগ্রহণ করেছ বলে তোমার নাম হবে অজদেব।" তখন দন্বন্তরি বলেন, "আমি আপনার ছেলে; তাই আমার জন্য যজ্ঞ ভাগ কল্পনা ও অবস্থানের নির্দেশ দিন।" তখন বিষ্ণু বলেন, "তুমি দেবতাদের পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেছো; অতএব যজ্ঞভাগ গ্রহণে তুমি সমর্থ হবে না। এ জন্মে তুমি দেবতাদের ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ; অতএব দ্বিতীয় জন্মে লোকমধ্যে খ্যাতিলাভ করবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হবে, আর সে শরিরেই তুমি দেবত্বলাভ করবে। তুমি আয়ুর্বেদ আটভাগে বিভক্ত করবে।" অতঃপর ধন্বন্তরি দ্বপরযুগে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেন। সুনহোত্রবংশিয় অজ দেবের আরাধনা করেন। তিনি প্রার্থনা করেন, যে দেবতা তাঁকে বর দান করবেন ইনিই যেনো তাঁর ছেলেরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগবান অজদেব (ধন্বন্তরি) ধন্বের গৃহে কাশিরাজ নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। পরে তিনি আয়ুর্বেদ আটভাগে বিভক্ত করেন। ধন্বন্তরির কেতুমান নামে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। (হরিবংশ)

ধর্মধ্বজ

(১) মিথিলার পিতাবংশের একজন রাজা। দন্ডনীতি, সন্ন্যাসধর্ম ও মোক্ষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। একবার সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনি ধর্মধ্বজের খ্যাতি শুনে এঁকে পরীক্ষা করার জন্য নিজরূপ ত্যাগ করে, যোগবরে এক মনোহর সুন্দরি স্ত্রীমূর্তি ধারণ করে ধর্ম্মধ্বজের কাছে উপস্থিত হন। রাজা তাঁর সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়ে সুলভা যোগবলে নিজের স্বত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষু রাজার স্বত, বুদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করেন। সুলভার অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে রাজা তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ করে বলেন, "আসক্তি, মোহ ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমি পরম বুদ্ধিলাভ করেছি এবং জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করেছি; অতএব তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভবপর নয়। তুমি সন্ন্যাসিনি, আমি গৃহস্থ; তুমি ব্রাহ্মণি, আমি ক্ষত্রিয়। তুমি আমাকে পরাজিত করে নিজের উন্নতি কামনা করছো। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ নেই বলে– এ মিলন বিষতুল্য হবে। আমাকে ত্যাগ করে তুমি সন্ন্যাসধর্ম পালন কর।" এর উত্তরে সুলভা বলেন, "এ

বস্তু আমার, এ বস্তু আমার নয়– এ দ্বন্দ্ব থেকে তুমি মুক্ত হও নাই। তুমি নিজেকে এবং অন্যকে সমান জ্ঞান করে না; তুমি মোক্ষের অধিকারি না হয়েই নিজেকে মুক্ত মনে করছো। সমদৃষ্টিহীন ব্যক্তির মোক্ষের অভিমান বৃথা। তুমি জীবন্মৃত নও, তাই আমার সংস্পর্শে তোমার অপকার হবে মনে করছো। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে তোমার দেহে আমি আছি। তোমার এ স্পর্শজ্ঞানের কোন মূল্য নেই।" সুলভার যুক্তিসঙ্গত ও অর্থযুক্ত কথা ও গভীর মোক্ষজ্ঞান দেখে ধর্মধ্বজ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। (মহাভারত– শান্তি)

(২) একজন রাজা। তাঁর স্ত্রীর নাম মাধবি। ধর্মধ্বজ হতে মাধবির গর্ভে তুলসির জন্ম হয়।

ধনঞ্জয়

অর্জুনের অন্য নাম। সমস্ত জনপদ জয় করে ধন-সংগ্রহপূর্বক তার মধ্যে বাস করতেন বলে অর্জুন এ নামে পরিচিত। (অর্জুন দেখুন)

ধর্মছেলে

যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম। দুর্বাসার মন্ত্র-প্রভাবে কুন্তি ধর্মকে (যম) আকর্ষণ করেন। যমের ঔরসে ও কুন্তির গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। (দুর্বাসা ও কুন্তি দেখুন)

ধুন্ধুমার

তিনি ইক্ষাকুবংশিয় রাজা কুবলাশ্ব। অযোধ্যার এ রাজার 'ধুন্ধুমার' নাম প্রাপ্তির ইতিহাস এরূপ– মধুকৈটভের ছেলে দানব ধুন্ধু তপস্যার ফলে ব্রহ্মার কাছ হতে বর নিয়ে দেব, দানব, রাক্ষস ইত্যাদির অবধ্য হয়। মহর্ষি উতঙ্কের আশ্রমের নিকট মরুপ্রদেশে উজ্জ্বালক নামে এ বালুকাপূর্ণ সমুদ্রে লুকিয়ে ধুন্ধু উতঙ্কের আশ্রমে নানা উপদ্রব করত। উতঙ্ক অযোধ্যার রাজা বৃহদশ্বকে ধুন্ধু দানবকে বিনাশের জন্য অনুরোধ করলে, তিনি নিজ কাজে নিয়োগ করতে মুনিকে পরামর্শ দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। উতঙ্ক কুবলাশ্বের শরাণাপন্ন হলে তিনি একুশ হাজার ছেলে ও সেনা নিয়ে ধুন্ধুকে বধের জন্য যাত্রা করেন। এক সপ্তাহ ধরে সে বালুময় সমুদ্র খনন করার পর ধুন্ধুকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যায়। সে উঠে তার মুখনিঃসৃত অগ্নির তেজে কুবলাশ্বের ছেলেদের ভস্ম করে ফেললো। তখন কুবলাশ্ব যোগবলে তার মুখাগ্নি নির্বাপিত করে, ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাকে বধ করে 'ধুন্ধুমার' নামে খ্যাতিমান হলেন। (মহাভারত– বনপর্ব)

ধিকপ্রচেত

অর্থ সমুদ্রকে ধিক্কার। সমুদ্র পরিবেষ্টিত লঙ্কায় আক্রমণকারি রামের যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষিতে পদানত সমুদ্রের প্রতি ধিক্কার দেন রাজা রাবণ। সমুদ্র যদি রামের বশীভূত না হতো তাহলে লঙ্কা হতো অজেয়। আর রাজা রাবণেরও এ দুর্গতি বৃদ্ধি পেতো না। লঙ্কার প্রসাদে উঠে চারদিকে বেষ্টিত সমুদ্রকে দেখে রাজা রাবণের মনে সমুদ্রের পদানত হওয়া মর্মঘাতি বলে বিবেচিত হয়েছে। অজেয় সমুদ্র রামকে লঙ্কা আক্রমণের পথ করে দিয়েছে– এটা রাবণের কাছে সহনীয় নয়। তাই প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে রাবণ সমুদ্রকে আত্মসচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন। একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে রাবণ সে মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অধম ভালুককেই শৃঙ্খলিত হতে হয় যাদুকরের হাতে। কিন্তু পশুরাজ সিংহের প্রবল পরাক্রম কারও কাছে লুণ্ঠিত হয় না। সমুদ্র তার বৈশিষ্ট্যে সিংহের মতোই প্রবল শক্তিশালি। কিন্তু রামের লঙ্কাভিযানের সুযোগ দান করে সমুদ্র অধম ভালুকের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছে। বীর রাবণ সমুদ্রের আবরণকে কখনই মেনে নিতে পারেননি। তিনি ধিক্কার বাণি উচ্চারণ করে বেদনার্ত হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র

বিচিত্র বীর্যের স্ত্রী। অম্বিকার গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসজাত। তিনি জন্মান্ধ বলে তাঁর কনিষ্ঠ পাণ্ডু পৈতৃক রাজ্যের অধিকারি হন। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীর নাম গান্ধারি। গান্ধারির গর্ভে তাঁর দুর্যোধন প্রভৃতি শত ছেলে এবং দুঃশলা নামের এক মেয়ে জন্মে।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়। পাণ্ডবদের বলবিক্রমে এবং দয়াদাক্ষিণ্যসহ বিবিধ সদগুণে সর্বত্র তাদের যশোঘোষণা আরম্ভ হলে দৃতরাষ্ট্রের মন বিদ্বেষে কলুষিত হতে লাগলো। ক্রমশ সে দুষিত ভাবের পরিপোষক কুমন্ত্রণা পেয়ে পাণ্ডবদেরকে রাজ্যচ্যুত করার ইচ্ছে হলো। দুর্যোধনও সে সময়ে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করার জন্য নানারূপ চেষ্টা করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুছেলেগণকে মার সাথে হস্তিনাপুর হতে বারণাবতে যাবার জন্য আদেশ করলে তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের কুঅভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। তাঁর আদেশ অলঙ্ঘনীয় বিবেচনায় বিদুরের উপদেশানুসারে সেখানে গিয়ে দুর্যোধননিরূপিত জতুগৃহে বাস করতে লাগলেন।

পরে পাণ্ডবগণ নানা কৌশলে জতুগৃহ দাহ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে থাকেন এবং সে অবস্থায় ধনুর্বেদবিশারদ অর্জুন দুর্ভেদ্য লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদিকে লাভ করলে পাণ্ডবগণ প্রকাশিত হন।

সে কালে ধৃতরাষ্ট্র লোকনিন্দার ভয়ে সৎপরামর্শের অনুবর্তি হয়ে পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করেন। কিন্তু ছেলেগণের উত্তেজনায় তাদেরকে হস্তিনাপুরে রাখতে না পেরে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করতে অনুমতি দিলেন। সেখানে পাণ্ডবগণ রাজ্যস্থাপন করে ক্রমশ বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করলে ধৃতরাষ্ট্রের মন বড়ই বিচলিত হয়ে উঠলো। এদিকে দুর্যোধন তার মন্ত্রকর্ণ ও শকুনিকে নিয়ে পাণ্ডবের বিরুদ্ধে নানা উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন। তাঁর যে উপায় যখন অনুষ্ঠিত হতো ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাতে সম্মত হতেন। দ্যুতসভায় দ্রৌপদিকে আনয়ন ও তাঁর অপমানের সময় তিনি কোন কথা বলেননি।

পাণ্ডবগণ অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে বনে গমন করলে ধৃতরাষ্ট্র কর্তব্য স্থির করার জন্য বিদুরকে পরামর্শ জিজ্ঞেস করেন, বিদুর পাণ্ডবদেরকে রাজ্য প্রত্যার্পণ করতে বললে তিনি বিদুরের প্রতি মহাক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন।

পরে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস হতে ফিরে আসা পাণ্ডবদের সাথে কৌরবগণের যখন যুদ্ধ হয়। সে সময় সঞ্জয় ব্যাসদেবের বরে দিব্য চক্ষু লাভ করে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের যথাযথ ঘটনা শোনাতেন। ক্রমশ ঘোর যুদ্ধে কুরুকুল নির্মুল হলো শুনে ধৃতরাষ্ট্র অতীব শোকার্ত হন এবং ভিমের হাতে শতছেলে নিহত হওয়ায় ভিমের প্রতি তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

যুদ্ধাবসানে তাঁর সাথে পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ করার সময় কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধির আশঙ্কা করে লৌহনির্মিত ভিমকে তাঁর নিকট অর্পন করেন। তিনি আলিঙ্গণ করার ছলে তা ভগ্ন করে পরে লৌহময় ভিমের কথা শুনে বিশেষ লজ্জিত হন।

যুদ্ধিষ্ঠিরের রাজত্বের সময় তিনি ১৫ বছর হস্তিনায় (দিল্লিতে) বাস করেন, অনন্তর সস্ত্রীক বনে গিয়ে দু বছর তপশ্চরণ করে একদিন বাড়বাগ্নিতে ভস্মিভূত হন।

ধ্রুব

উত্তানপাদ রাজার ঔরসে সুনীতির গর্ভজাত। ৫ বছর বয়সের সময় একদিন সিংহাসনাধিষ্ঠিত বাবার কোলে বৈমাত্রেয় ভাইকে দেখে কোলে উঠতে ইচ্ছা করেন। রাজা তাঁকে ক্রোড়ে ধারণ করার উপক্রম করছিলেন। এ সময়ে বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে বললেন, "তুমি আমার উদরে জন্ম লাভ না করে কি জন্য বৃথা এ মহৎ অভিলাষ করছো? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তা কি তুমি জানো না? ধ্রুব বিমাতার দুর্বাক্যে ব্যথিত হয়ে ম্লানমুখে মার নিকট গিয়ে সমস্ত কথা বললেন।

সুনীতি শুনে বললেন, সুরুচি যথার্থই বলেছে। সে অনাথনাথ দুঃখহারি পদ্মপলাশলোচন হরির কৃপা ছাড়া তোমার এ দুঃখ দূর হবে না। মার কথায় সে

দীনভৎসল হরির কৃপালাভের জন্য ধ্রুবের মন একান্ত বিচলিত হয়ে উঠলো। পঞ্চম বৎসরের শিশু ধ্রুব একদিন রাতে মার ঘুমন্ত অবস্থায় ঘর ছেড়ে বনে গিয়ে তদ্‌গতচিত্তে হরিকে আহ্বান করতে লাগলেন।

পরে নারদ এসে তাঁকে দীক্ষিত করলে তিনি যমুনাতীরে মধুবনে যোগাবলম্বনে তপস্যা করতে লাগলেন। নারদ প্রসন্ন হলে তাঁর দেয়া বর লাভে সক্ষম হয়ে ঘরে ফিরে আসেন।

বাবা সন্তুষ্ট হয়ে ধ্রুবকেই রাজসিংহাসন প্রদান করেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই উত্তম মৃগয়া নিমিত্ত গমন করে যক্ষ দ্বারা নিহত হন। ধ্রুব কিছুকাল রাজত্ব করে পরিশেষে ভগবৎপ্রসাদ লব্ধ ধ্রুবলোকে গিয়ে থাকতে লাগলেন।

নকুল

পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনী কুমারের ঔরসজাত চতুর্থ পাণ্ডব। তিনি অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাটভবনে গ্রান্থিক নামে অভিহিত হয়ে ঘোড়াধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞকাল নকুল পশ্চিম দিকে গমন করে সেখানকার রাজন্যবর্গের নিকট হতে কর আদায় করেন।

রাজ্য ভোগের পর ভ্রাতৃগণের সাথে মহাপ্রস্থান সময়ে সুমেরুশৃঙ্গে পতিত হয়ে দেহ ত্যাগ করেন। আপনাকে সর্বাপেক্ষা রূপবান বলে গর্ব করতেন, সে গর্বের জন্য পাপস্পর্শ তাঁর সশরিরে স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক হয়েছিল।

নক্ষত্র

নক্ষত্রেরা– (পুরাণে) চন্দ্রেরপত্নী। এরা সংখ্যায় ২৭টি। ১. অশ্বিনি, ২. ভরণি, ৩. কৃত্তিকা, ৪. রোহিণি, ৫. হরিণশিরা, ৬. আদ্রা, ৭. পুনর্বসু, ৮. পুষ্যা, ৯. অশ্লেষা, ১০. মঘা, ১১. পূর্বফল্গুনি, ১২. উত্তরফল্গুনী, ১৩. হস্তা, ১৪. চিত্রা, ১৫. স্বাতি, ১৬. বিশাখা, ১৭. অনুরাধা, ১৮. জ্যেষ্ঠা, ১৯. মূলা, ২০. পূর্বষাঢ়া, ২১. উত্তরাষাঢ়া, ২২. শ্রবণা, ২৩. ধনিষ্ঠা, ২৪. শতভিষা, ২৫. পূর্ব-ভাদ্রপদ, ২৬. উত্তর-ভাদ্রপদ, ২৭. রেবতি।

নটরাজ

নৃত্যকলার উদ্ভাবকব বলে মহাদেবের এক নাম নটরাজ। তাঁর বিশ্ব ধ্বংসের সময়কার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। অন্যমতে উত্তেজক দ্রব্য পানের পর তিনি স্ত্রীর সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্যে রত হন।

নন্দ

শ্রীকৃষ্ণের পালকবাবা। মথুরার অপরদিকে গোকুল গ্রামে গোপজাতীয় নন্দের বাস ছিল। সে সময় কংস মথুরার রাজা ছিলেন। নন্দের স্ত্রীর নাম যশোদা। যে রাত্রে যশোদার গর্ভে মহামায়া মেয়েরূপে জন্মগ্রহণ করেন, সে রাত্রেই শ্রীকৃষ্ণও মথুরার কারাগারে দেবকির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'বসুদেব ও দেবকির কোন সন্তানের হাতে কংসের মৃত্যু হবে', এরূপ ভবিষ্যদবাণি ছিল। বংসের ভয়ে বসুদেব জল-ঝড়পূর্ণ মধ্যরাত্রে কৃষ্ণকে নন্দের আবাসে নিদ্রিতা যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন করে, তাঁর অজ্ঞাতসারে মেয়ে মহামায়াকে এনে দেবকির কোলে রেখে দেন। মহামায়ার জন্মের সময় তাঁর মায়াতে সকলেই আচ্ছন্ন ছিলেন, সে জন্য বসুদেবের এ সন্তা-পরিবর্তন কেউই জানতে পারে নি। কৃষ্ণ নন্দের গৃহে লালিত পালিত হতে লাগলেন। তিনি নন্দের সমস্ত ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এ-দিকে কংস কৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত জানতে পেরে তাঁকে বধ করার জন্যে গোকুলে ছদ্মবেশি চরদের পাঠান; কিন্তু এতে তিনি কৃতকার্য হন না। তখন নন্দ ভীত হয়ে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যান। একবার কংসের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে নন্দ কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরায় যান। সেখানে কৃষ্ণ কংসকে বর করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন। (ভাগবত)

নন্দনকানন

স্বর্গস্থিত উপবন। সুরোদ্যান।

নন্দিনি

স্বর্গের গোমাতা সুরভির মেয়ে। নন্দিনি মার মতো কামধেনু ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ নন্দিনিকে নিজের আশ্রমে রাখেন। সূর্যবংশের রজা দিলিপ অপুত্রক হওয়াতে স্ত্রীসহ এ নন্দিনিকে সেবা করে ছেলে রঘুকে লাভ করেন। এবার সস্ত্রীক বসুগণের বন-বিহারকালে দ্যু নামক বসুর স্ত্রী নন্দিনিকে দেখে তাঁকে পাবার জন্যে স্বামিকে অনুরোধ করেন। দ্যু তখন অন্যান্য বসুর সাহায্যে একে অপহরণ করেন। এর ফলে বশিষ্ঠের শাপে বসুদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। দ্যু ভিষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এ কামধেনু ননি্দনীর জন্যই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের বিরোধ হয়।

নন্দিগ্রাম

অযোধ্যা হতে এককোশ দূরে। রামকে বনবাস হতে ফিরিয়ে না আনতে পেরে, ভরত অযোধ্যায় না গিয়ে এ স্থান হতে রামের হয়ে রাজ্যপালন করেন।

লঙ্কাজয়ের পর চতুর্দশ বৎসর বনবাস শেষ হলে, রাম এস্থানে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হন ও অযোধ্যায় ফিরে আসেন। (রামায়ণ)

নভগ

বৈবস্বত মনুর দশটি পুত্রের অন্যতম নভগ। ব্রহ্মচারি অবস্থায় থাকার সময় পিতৃধন বিভাগকালে তিনি বাবা এবং অন্যান্য ভাতৃগণ দ্বারা বঞ্চিত হন। বাবার কাছে অনুযোগ করলে মনু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাইদের বিশ্বাস করো না। আঙ্গিরস মুনিদের কাছে বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে দুটি সূক্ত পাঠ করে শোনাও। ফলে যজ্ঞের শেষে স্বর্গে যাবার সময় তাঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে দান করে যাবেন।" যজ্ঞান্তে নভগ দানগ্রহণে উদ্যত হলে এর কৃষ্ণকায় পুরুষ এসে তাঁকে বাঁধা দেন ও বলেন, "এ ধন আমার।" বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "এ কৃষ্ণকায় পুরুষ রুদ্র, এ ধনের প্রকৃত অধিকারি।' নভগ তখন সমস্ত ধন এঁকেই দান করলেন। পিতা-পুত্রের সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে রুদ্র নভগকে ধন ও ব্রহ্মবিদ্যা দান করে অন্তর্হিত হলেন। (ভাগবত)

নরক

অসুরবিশেষ। বিষ্ণুর বরাহ অবতারে তাঁর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। মার অনুরোধে পিতৃদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রভাবে অসুর অন্যের অজেয় হয়ে উঠে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ অর্থাৎ অসম প্রদেশের অন্তর্গত কামরূপ তাঁর রাজধানি। নরকাসুর বিদর্ভরাজদুহিতা মায়াকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে ভগদত্ত প্রভৃতি চার ছেলে জন্মে। এ দুর্বৃত্ত অসুর সাধুলোকের প্রতি বড়ই অত্যাচার করতেন। দিব্যাঙ্গনাদেরকে অপহরণ করে নিজ পুরিতে কারারুদ্ধ করে রাখতেন দুরাত্মা দেবমা অদিতির কুন্তল পর্যন্ত অপহরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। পরিশেষে কৃষ্ণের হাতে তিনি নিহত হন।

নর-নারায়ণ

দুজন প্রাচীন ঋষি, ধর্ম ও অহিংসার ছেলে। তাঁরা অতি দুর্গম পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন। দুই জনই অমিততেজা ছিলেন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে এঁদের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্রদ্বারা নানাপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য না হয়ে অপ্সরাদের পাঠিয়ে দু জনকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন। নর-নারায়ণ এতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে নিজেদের তপোবল দেখাবেন বলে ঠিক করলেন। নারায়ণ একটি ফুল নিয়ে নিজের উরুর ওপর স্থাপন করামাত্র একটি সুন্দরি অপ্সবা বেরিয়ে এল। এ অপরূপ সৌন্দর্য দেখে

ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরারা লজ্জায় ও দুঃখে স্বর্গে ফিরে গেল। ঋষির উরু থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এর নাম হল উর্বশি। দেবতাদের সম্মুখে এরূপে এ অপ্সরার সৃষ্টিতে ইন্দ্রাদি দেবগণের গর্ব খর্ব হল। পরে নারায়ণ ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরাদের পরিচর্যার জন্য কয়েক সহস্র সুন্দরি নারী সৃষ্টি করলেন। অপ্সরারা এ ব্যাপারে বিস্মিত হলে নারায়ণ তাদের উর্বশিকে নিয়ে ইন্দ্রের কাছে ফিরে যেতে বলেন। প্রথমে নানা অনুনয়-বিনয় করে নারায়ণের সান্নিধ্য প্রার্থনা করলেও অপ্সরারা প্রত্যাখ্যাত হন। এ রব ও রারায়ণ দ্বাপরের শেষভাগে অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (বামনপুরাণ)

(২) শরভরূপি মহাদেব দন্তাঘাতে নরসিংহকে দ্বিধাবিভক্ত করেন। নররূপ দেহার্ধ হতে মহাতপা মুনিরূপধারি নর আর সিংহরূপ দেহার্ধ হতে মহাতপা নারায়ণ নামক জনার্দন উৎপন্ন হন। (কালিকাপুরাণ)

নরসিংহ

বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। এ অবতারে বিষ্ণু অর্ধনর ও অর্ধসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন। ব্রহ্মার বরে অসুররাজ হিরণ্যকশিপু ঘোর অত্যাচারি ও গর্বিত হয়ে দেবতাদের নানা প্রকার অপমান করতে আরম্ভ করেন। তিনি দেবাসুর ও গন্ধর্বদের অবধ্য ছিলেন। ব্রহ্মার বরের জন্য মুণিরা তাঁকে অভিশাপ দিতে পারতেন না। তাঁর চার ছেলে। তারমধ্যে প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। একদিন হিরণ্যকশিপু ছেলেদের বিদ্যাপরীক্ষা করার জন্য সভায় আহ্বান করলেন। জিজ্ঞাসিত হলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণ বর্ণনা করলেন। পুত্রের মুখে শত্রুর (বিষ্ণুর) প্রশংসা শুনে প্রহ্লাদকে তিনি খুব তিরস্কার করলেন। ক্রমে প্রহ্লাদ আরও বিষ্ণু ভক্ত হয়ে পড়ায় হিরণ্যকশিপু নানা প্রকারে ছেলেকে পীড়ন করতে আরম্ভ করলেন, 'তোমার ভগবান কোথায় আছেন?' তখন প্রহ্লাদ বিনীত হয়ে উত্তর দিলেন– 'সর্বস্থানেই ঈশ্বর আছেন।' তখন হিরণ্যকশিপু সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন– এর মধ্যে ভগবান আছেন কিনা। তখন প্রহ্লাদ বিনীতভাবে আবার জানালেন– 'তিনি সর্বত্রই যখন বিদ্যমান, তখন এ স্তম্ভের মধ্যে নিশ্চয় আছেন।' এ শুনে হিরণ্যকশিপু এক পদাঘাতে সে স্ফটিকস্তম্ভ যেমন চূর্ণ করতে গেলেন অমনি এক নরসিংহ মূর্তি ভিম গর্জন সহকারে স্তম্ভের ভেতর থেকে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুর পেট ফেড়ে তাঁকে হত্যা করলেন।

নল

নিষধরাজ বীরসেনের ছেলে। বিদর্ভরাজ ভিমের মেয়ে দময়ন্তির রূপ ও গুণের কথা শুনে নল তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। দময়ন্তিকে পাওয়া নিয়ে কলির সঙ্গে নলের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং অশুচি অবস্থায় নল রাজার দেহে কলি

প্রবেশ করে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটান। ফলে নল একাধারে রাজ্য, পত্নী সব কিছু হারান।

নলরাজা

নিষধদেশের অধিপতি চন্দ্রবংশিয় বীরসেন রাজার ছেলে। তিনি অসাধারণ রূপ-গুণ সম্পন্ন নরপতি ছিলেন। প্রজাপালন এবং সৎকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য নলরাজা পুণ্যশ্লোক নামে কীর্তিত হয়ে সংসারে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। তিনি বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তিকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে তাঁর ইন্দ্রসেন নামে ছেলে ইন্দ্রসেনা নামের মেয়ে জন্মে। নলরাজা দেবতাদের বর প্রভাবে স্বেচ্ছানুসারে অগ্নি ও জল প্রস্তুত করে নিতে পারতেন। অশ্বচালনায় তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিলো, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক যোজন পথ অতিক্রম করতে পারতেন।

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে বনভ্রমণকালে নলরাজা কর্কোটক নামক সর্পকে অগ্নিদাহ হতে রক্ষা করেন। নাগরাজ প্রত্যুপকারার্থ নলকে দংশন করলে নল বিবর্ণ হন এবং কর্কোটকের উপদেশানুসারে অযোধ্যায় ঋতুপর্ণ রাজার নিকট বাহুক নামে পরিচিত অশ্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নাগ

নরাকার দেবযোণি বিশেষ। পাতালে অর্থাৎ নাগলোকে তাদের বাসস্থান। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে কশ্যপের জন্ম হয়। তাঁর কদ্রু নামে এক স্ত্রী ছিল। এ কদ্রুর গর্ভে কয়েকজন পরাক্রান্ত পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম– ১. অনন্ত, ২. বাসুকি, ৩. পদ্ম, ৪. মহাপদ্ম, ৫. তক্ষক, ৬. কুলির, ৭. কর্কট ও ৮. সঙ্খ। তাঁরাই কশ্যপের বংশধর– নাগ নামে অবিহিত। তাদের ছেলে-পৌত্রাদি ক্রমে পৃথিবী নাগ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এ সর্পরা অতি কুটিল ও বিষপূর্ণ। এ নাগদের বিষের প্রকোপে প্রজাসকল ক্ষয় হতে লাগলো। তখন প্রজাসকল ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তাদের রক্ষা করতে বললো। ব্রহ্মা তখন বাসুকি প্রভৃতি নাগদের ডেকে রেগে গিয়ে শাপ দিলেন যে, নাগবংশ কল্পান্তরে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। নাগরা এ শাপ শুনে ভয় পেয়ে ব্রহ্মার স্তব করতে লাগলো। তারা ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলো যে, কুটিল বিষপূর্ণ করে আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আপনি এখন আমাদের জন্য পৃথক স্থান নির্দেশ করুন। তখন ব্রহ্মা নাগদের পাতাল, বিতল ও সুতল– এ তিনলোকে অবস্থানের আদেশ দিলেন। ব্রহ্মা আরও বললেন, যে সব মানুষ কালপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের সাপরা ভক্ষণ করতে পারবে ও যারা মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি ধারণ করে, তাদের নাগরা স্পর্শ করতে পারবে না।

নানক

একজন পরম ধার্মিক ক্ষত্রিয় এবং বর্তমান শিখধর্মের প্রবর্তক। ১৪৬৯ সালে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণে তালবন্তি নানকানা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম কালুবেদি, তাঁর নাম ত্রিপতা। বাল্যাবস্থা থেকেই তাঁর মন সৎপথে ধাবিত হয়। সন্ন্যাসি ও ফকির দেখলেই সর্বকর্ম ত্যাগ করে তাঁদের সাথে কথোপকথনে সময় কাটাতে ভালবাসতেন।

তাঁর বাবা জনৈক ভূমাধিকারির নিকট পাটোয়ারির কাজ করতেন। তিনি নানককে সংসারি করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হওয়া তাঁর পক্ষে সুকঠিন হয়েছিল। নানকের পবিত্রভাব তাঁর বাবার হৃদয়ে স্থান পায়নি। বাবা অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারি হবার জন্য তাঁকে কঠোর বাক্যে শাসন এবং সংসারি না হলে বাড়ি ছেড়ে যাবার আদেশ করলে নানক বাবার দুর্ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হয়ে ২০ বৎসর বয়সে বাড়ি হতে বের হন। প্রথমে সুলতানপুরে কোন নানকির ঘরে থেকে ভগ্নি ও ভগ্নিপতির উত্তেজনায় সেখানে এক মুদি দোকান করেন। দোকানে বিশেষ লাভ হতে লাগলো এ অবস্থায় তিনি বিয়ে করেন। তাঁর পত্নীর নাম সুলক্ষণা। বিয়ের পর তিনি সুলতানপুরে পৃথক ঘর নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। এ সময়ে তাঁর দু টি ছেলে জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীচন্দ্র, কনিষ্ঠ লক্ষ্মীদাস।

দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকালে ধর্মভাবের প্রবল বেগ তার মনকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে তিনি অনায়াসে সংসারের মায়া ত্যাগ করে ২৭ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসি হলেন। নানক সন্ন্যাসির বেশে নানাস্থান পর্যটন করতে লাগলেন। সর্বত্রই ধর্মের বাহ্যভাব দর্শনে তাঁর মন অতিশয় ক্ষুণ্ন হতে লাগলো। তিনি একদিন মক্কা নগরিতে মসজিদের দিকে চরণ রেখে শায়িত ছিলেন, জনৈক মোল্লা তথায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে অধার্মিক বলে তিরস্কার করেন। নানক বিনীতভাবে তাঁকে বললেন, "যেদিক পরমেশ্বর নেই সে দিকে পা সরিয়ে রাখুন"। মোল্লা তাঁর সে কথায় আর কোন উত্তর করতে পারলেন না।

নানক নানা দেশ ভ্রমণ করে কোথাও অকপট ধর্মের পরমানন্দ লাভে পরিতৃপ্ত না হয়ে বিষণ্নভাবে স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন। পরিশেষে তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মে যে, ধর্মের জন্য নানাস্থান পরিভ্রমণ করা বৃথা, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করলেই যে সংসারের মায়া হতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এ ভ্রান্তিমাত্র, ধর্মোপার্জনের জন্য গৃহস্থাশ্রমের উপকারিতা আছে।

এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নানক গৃহি হতে ইচ্ছা পোষণ করেন এবং গুরুদাসপুর জেলার ইরাবতি নদীতটে করতাল পুরে বাড়ি নির্মাণ করে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করেন। নানক গৃহস্থাশ্রমে থেকে অবশিষ্ট জীবন কায়মনোবাক্যে

ঈশ্বরোপসানায় অতিবাহিত করেন। তাঁর সাধুব্যবহার দেখে এবং সদুপদেশ শুনে মুগ্ধ হয়ে অনেকে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি শিষ্যগণকে ধর্মের বাহ্যভাব পরিহার করে সর্বান্তকরণে ধর্মাচরণ করতে উপদেশ দিতেন। উপযুক্ত পাত্রে যথাসাধ্য দান করে নানকের মতে পরম ধর্ম। আদিগ্রন্থ নামক নানকের উপদেশাবলি শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র।

এ মহাত্মা ১৬৩৯ সালে ৭০ বছর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

নারদ

ব্রহ্মার মানসছেলে । তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সর্বদা হরিনাম গান করে সর্বত্র ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন। ব্রহ্মা তাঁকে সৃষ্টিকার্যের ভারার্পণ করলে তিনি তা অস্বীকার করেন। তজ্জন্য ব্রহ্মার অভিসম্পাতে নারদকে গন্ধর্বযোনি ও মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। নারদ প্রথমত ব্রহ্মার নিকট কিঞ্চিৎ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে বিষ্ণুর সভায় তুম্বুরু নামক মুণির গান শুনে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শি হবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন এবং বিষ্ণুর আদেশক্রমে উলুকেশ্বরের নিকট অতিশয় যত্নসহকারে গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা করেন। পরিশেষে ভগবান কৃষ্ণের নিকট গানযোগের উপদেশ পেয়ে ব্রহ্মানন্দলাভে পরিতৃপ্ত হন।

নারদসংহিতা নামক সঙ্গীতশাস্ত্র, স্মৃতি ও নারদিয় পুরাণ এ সমস্ত নারদপ্রণীত বলে প্রসিদ্ধ।

নারায়ণ

ঋষিদ্বয়। ধর্মরাজের স্ত্রী মূর্তির গর্ভে তাঁদের জন্ম হয়। বিষ্ণুর অংশে তাঁরা জন্ম লাভ করেন। দু ভাইয়ের শরিরমাত্র ভিন্ন কিন্তু শারিরিক ও মানসিক ভাব সমস্তই সম্পূর্ণরূপ অভিন্ন ছিল।

তাঁরা বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি করে অতি কঠোর তপস্যা করেন। দেবগণ এঁদের তপস্যায় ভীত হয়ে তপোভঙ্গ নিমিত্ত কামদেবের সাথে অপ্সরাদেরকে এঁদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদের গর্ব খর্ব করার জন্য রমণিরত্ন উর্বশিকে সৃষ্টি করে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন।

দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে নারায়ণ কৃষ্ণার্জুন রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

নচিকেতা

তিনি রাজা বাজশ্রবার ছেলে। বাজশ্রবার অন্য নাম গৌতম। বাজশ্রবা স্বর্গে গমনের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের সমস্ত ধনরত্ন দান করেন। এ যজ্ঞের সময় নচিকেতা বালক ছিলেন। নচিকেতা যজ্ঞের বিরাট দানসামগ্রি

দেখে বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও যখন তিনি দেখলেন যে, বাবা বৃদ্ধ গো দান করছেন তখন তিনি বাবাকে বললেন যে, কোন ঋত্বিককে দক্ষিণাস্বরূপ নচিকেতাকে তিনি দান করুন। রাজা পুত্রের এক কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাই ছেলে তিন বার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি আমাকে কার হাতে সমর্পণ করবেন? বাবা রেগে গিয়ে উত্তর দিলেন– তোমাকে আমি যমের হাতে দান করলাম। প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য রাজা নচিকেতাকে যমের প্রাসাদে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনরাত উপবাসে অবস্থান করলেন। যম সে সময় ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে এসে যম দেখলেন যে, নচিকেতা তিন রাত উপবাসে আছেন। তখন তিনি নচিকেতাকে বললেন– তুমি তিন দিন অনাহারে আমার গৃহে আছ; সে জন্য তুমি আমার কাছ থেকে তিনটি বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা তখন এ তিনটি বর প্রার্থনা করলেন– (১) আমি কিরূপভাবে যমালয়ে বাস করছি, এ চিন্তায় আমার বাবা খুব ভাবিত আছেন। বাবার এ চিন্তা নিবৃত্ত হোক এবং তিনি আমার উপর পূর্বের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকুন। (২) স্বর্গলোকে যারা আগমন করবে, তারা যেনো পৃথিবীবাসি জীবের মতো ক্ষুৎপিপাসা, জরা, মৃত্যু ও শোকগ্রস্ত না হয়ে সুখে বাস করে। এ দু বরই যম নচিকেতাকে দান করলেন। (৩) এবার নচিকেতা মানুষের মৃত্যুর পর যে কেহ বলে জীবাত্মা আছে, কেহ বলে জীবাত্মা নাই– এ সন্দেহ দূর করার জন্য যমের কাছ হতে তৃতীয় বর চাইলেন। তখন যম নানারকম ঐশ্বর্যদানের প্রলোভন দেখিয়ে নচিকেতাকে এ প্রশ্ন থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন; কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই নিবৃত্ত হরেন না। তখন যম সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন। (কঠোপনিষৎ)

মহাভারতে নচিকেতার কাহিনি এরূপ– নচিকেতা উদ্দালক ঋষির ছেলে। একদিন উদ্দালক ভুলক্রমে নদীতীরে কুশপুষ্পাদি ফেলে এসেছিলেন। গৃহে ফিরে এসে ছেলে নচিকেতাকে তা' আনতে বললেন। নচিকেতা নদীতীরে গিয়ে দেখলেন যে, সমস্তই নদীস্রোতে ভেসে গিয়েছে। ছেলেকে রিক্তহাতে ফিরে আসতে দেখে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বাবা রেগে গিয়ে শাপ দিলেন, "তুমি এখনই যম-দর্শন করো।" এ অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করামাত্র নচিকেতা মৃত অবস্থায় ভূপতিত হলেন। তখন উদ্দালক পুত্রের এ আকস্মিক মৃত্যুতে বিলাপ করতে লাগলেন। একদিন ও একরাত নচিকেতার মৃতদেহ কুশানের উপরেই পড়ে রইল। পরদিন প্রভাতে হঠাৎ মৃতদেহ প্রাণসঞ্চার হতে দেখে উদ্দালক ছেলেকে সম্বোধন করে বললেন– তুমি নিজের প্রভাবে দেবলোক দর্শন করেছো, তোমার দেহ মানবদেহ নয়। নচিকেতা বাবাকে জানালেন যে, পিতৃশাপে দেহত্যাগ করে

যমরাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তিনি যমরাজকে দেখলেন এবং কোথায় তাঁকে যেতে হবে এ বিষয়ে তিনি যমরাজকে প্রশ্ন করলেন। যমরাজ বললেন– তোমার বাবা 'তোমার যম-দর্শন হোক' বলে শাপ দিয়েছিলেন; তোমার যম-দর্শন হয়েছে, এবার তুমি গৃহে ফিরে যাও। তবে তুমি আমার অতিথি; তুমি যদি কিছু প্রার্থনা করো, তা আমি পূর্ণ করবো। নচিকেতা তখন যমের কাছে পুণ্যোপার্জিত উৎকৃষ্ট লোকসকল দেখতে চাইলে। যমের আদেশে দিব্যরথে আরোহণ করে নচিকেতা পুণ্যলোকের সমস্ত স্থান দেখে ফিরে এলেন। তিনি দেখলেন যে, যত রকম পুণ্যস্থান আছে, তার মধ্যে ধেনুদানকারিরাই সব চেয়ে পুণ্যস্থান লাভ করে। তাই যম নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন যে, গোদানই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। (মহাভারত– অনুশাসন)

নিত্যানন্দ

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের খ্যাতিমান নায়ক। রাঢ়দেশের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে তাঁর জন্ম। হাড়াইপণ্ডিত নামের এক ব্রাহ্মণ তাঁর বাবা। মার নাম পদ্মাবতি দেবি। নিত্যানন্দকে সকলেই নিতাই বলতো। নিতাই বাল্যকাল হতেই অতিশয় শান্ত-প্রকৃতি ও ধর্মানুরাগি ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে মাধবেন্দ্রপুরিতে এক সন্ন্যাসির সঙ্গে নানা তীর্থ স্থান পর্যটন করেন। বোম্বাই প্রদেশের পাণ্ডারপুর তীর্থে লক্ষ্মীপতি সাধুর নিকট নিতাই মন্ত্রগ্রহণ করেন। ক্রমশ তিনি একজন অবধুত রূপে পরিগণিত হন।

সেকালে গৌরাঙ্গের বিষয় অবগত হয়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গিয়ে গৌরাঙ্গের ধর্মভাবে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে মিলিতভাবে নবদ্বীপে থাকতে লাগলেন।

সে সময়ে নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দু জন দুর্বৃত্ত পাষণ্ড ছিলো। তারা মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে পথে পথে ভ্রমণ করতো এবং নিরীহ বৈষ্ণবদেরকে দেখলেই তাদের প্রতি অত্যাচার করতো। পরে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের প্রেমে তাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয় এবং শেষে ভক্তিপরায়ণ পরম বৈষ্ণব হয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

চৈতন্য লীলাচলে গমন করলে নিত্যানন্দ তাঁর আদেশানুসারে বঙ্গদেশ থেকে হরিনাম প্রচার করতে লাগলেন। ভাগীরথী তীরে পাণিহাটি গ্রামে তিনি অনেক দিন থেকে সন্নিহিত অনেক স্থানে হরিনাম প্রচার করেন। সে কালে সাতগ্রামের সুবর্ণবণিকেরা তাঁর শিষ্য হন। ক্রমশ বঙ্গদেশের সমস্ত সুবর্ণবণিক সমাজ নিত্যানন্দের শিষ্য শ্রেণিভূক্ত হয়েছিলেন।

পরে গোবর্ধন নামক ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসির বেশ পরিত্যাগ করে গৃহির বেশ ধারণ করেন। নবদ্বীপ গিয়ে চৈতন্যের মা শচিদেবির

নিকট পুত্রবৎ অবস্থান করতে লাগলেন। শেষে নিত্যানন্দ সংসারি বৈষ্ণব হতে অভিলাষি হয়ে নবদ্বীপের নিকটবর্তি শালি গ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাস দু মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর বীরভদ্র নামে এক ছেলে এবং গঙ্গা নামে এক মেয়ে জন্মে। চৈতন্যের দেহত্যাগের পর নিত্যানন্দ মানবলীলা সংবরণ করেন। কিঞ্চিদাধিক চারশ বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ বর্তমান ছিলেন।

নিশুম্ভ

নিশুম্ভ একটি দানব। এ দানব কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দণুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাইর নাম শুম্ভ ও কনিষ্ঠ ভাইর নাম নমুচি। তাঁরা অত্যন্ত অত্যাচারি ছিল। স্বর্গ অধিকার করতে গিয়ে নমুচি ইন্দ্রের হাতে নিহত হন। কনিষ্ঠের মৃত্যুতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ রেগে গিয়ে স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। দেবতাদের বিতাড়িত করে নিজেরা স্বর্গ অধিকার করেন ও পরাজিত দেবতাদের পৃথিবীতে নির্বাসিত করেন। এরপর মহিষাসুরের মন্ত্রি রক্তবীজের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলে তারা জানতে পারেন যে, বিন্ধ্যা পর্বতে কৌশিকি দেবির হাতে মহিষাসুর নিহত হয়েছেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ দূতমুখে বলে পাঠান; এ দু ভাইর মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করুন। দেবি দূতকে বললেন, যে ব্যক্তি তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করবে, তাঁকেই তিনি বিয়ে করবেন। তারা দেবির হাতে নিহত হলো।

নীল

বানর বিশেষ। সুগ্রীবের সখা। বহু সহস্র বানরসহ তিনি সীতার খোঁজ করেন। সেতুবন্ধনের সময় এ বানর রামকে সাহায্য করেন। পাথর দিয়ে তিনি কন্যাকুমারি হতে ত্রিনকোমালি পর্যন্ত সেতুবন্ধ নির্মাণ করেন।

নীলকণ্ঠ

পুরাকালে দেবতা ও অসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হলে, দেবতারা দিন দিন শক্তিহীন হতে লাগলেন; শেষে অসুরদের হাতে স্বর্গরাজ্য যাবার উপক্রম হলো। তখন দেবতারা প্রথমে ব্রহ্মা ও পরে বিষ্ণুর কাছে উপদেশ নিতে গেলেন। বিষ্ণু বললেন যে, অসুরদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে সমুদ্রমন্থন করতে হবে। মন্দরপর্বত হবে মন্থনদণ্ড, সর্পরাজ বাসুকি হবে মন্থনের রজ্জু। সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠবে, তা পান করলে দেবতার অমর হবে। অমৃতপানের আগে দেবতাদের মানুষের মতো মৃত্যু হতো। সমুদ্রমন্থনকার্যে অসুরদের সাহায্য দরকার ছিল; কারণ, দেবতাদের চেয়ে তারা অধিক শক্তিশলি ও পরিশ্রমি ছিল। ইন্দ্র অসুরদের কাছে

এ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলে অসুররাজ বলি এতে সম্মত হলো; কিন্তু তারা অমৃতের অংশ দাবী করলো। ইন্দ্র অংশ দিতে সম্মত হলে মন্থনকার্য আরম্ভ হলো। বিষ্ণুর উপদেশে প্রথমে সমুদ্রের উপরে ওষধি গাছ-গাছড়া ছড়িয়ে দেয়া হলো। মন্থনকার্যে বিঘ্ন হওয়াতে বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করে মন্থনদণ্ডরূপ মন্দরপর্বতকে ভাসমান রেখে দিলেন। মন্থন করতে করতে সমুদ্রজল ও গাছ-গাছড়া মিশ্রিত হয়ে একপ্রকার ভীষণ বিষ উৎপন্ন হলো। এ বিষের জন্য অনেক দেবতা ও অসুর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন সকলেই মহাদেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য অজর অমর মহাদেব এ বিষ পান করে সকলকে রক্ষা করলেন; কিন্তু এ বিষের ক্রিয়ায় তাঁর গলা নীলবর্ণে পরিণত হলো। এ জন্য মহাদেবকে নীলকণ্ঠ বলা হয়। (মহাভারত)

নীললোহিত

শিব; যাঁর কণ্ঠ নীল-রঙ এবং জটাজাল লোহিতরঙ; বা যিনি এক কল্পে নীলরঙ ও অপর কল্পে লোহিতরঙ।

পিতা

মিথিলার ধার্মিক রাজা। এ বংশে নিমি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। একদা ধর্মাত্মা রাজা নিমি বশিষ্টকে ত্যাগ করে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এতে বশিষ্ঠ রেগে গিয়ে তাঁকে শাপ দেন। তখন ঋষিরা গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দিয়ে নিমির দেহ পূজা করে মন্থন করেন। সে মথিত দেহ হতে এক ছেলে জন্মায়। সে জন্য এ পুত্রের নাম হয় মিথি। তাঁর অন্য নাম পিতা। বিচেতন দেহ থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর আর এক নাম হয় বৈদেহ। এ মিথি থেকে আরম্ভ করে তাঁর অধস্তন সকল পুরুষ পিতা নামে খ্যাত হন। রামায়ণে বর্ণিত আছে, মিথির ছেলে পিতাই প্রথম পিতা। মিথি রাজার নাম হতে রাজ্যের নাম হয় মিথিলা।

রামায়ণে দু জনকের নাম পাওয়া যায়। একজন মিথির ছেলে ও উদাবসুর বাবা এবং অন্যজন হ্রস্বরোমার ছেলে ও সীতার বাবা। (রামায়ণ-আদি)

মিথিলার রাজা পিতা সীতার বাবারূপে পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। পিতা যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের রেখা থেকে যে আলোকসামান্যা রূপবতি মেয়ে পান, তাঁকেই সীতা নামে নামাঙ্কিত করে মেয়েরূপে পালন করেন। সীতা বিয়েযোগ্যা হলে পিতা তাঁকে বীর্য্যশুল্কা করবেন বলে স্থির করেন। সাংকাস্যার রাজা সুধন্বা সীতাকে প্রার্থনা করেন, কিন্তু পিতা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে মিথিলা অবরোধ করেন। সীরধ্বজ যুদ্ধে সুধন্বাকে নিহত করে আপন ভ্রাতা কুশধ্বজকে

তাঁর রাজ্য দেন। হরধনু ভঙ্গকারির হাতে সীতাকে অর্পণ করবেন, জনকের এ পণ ছিল। রামাচন্দ্র এ হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন। সীরধ্বজের অপর মেয়ে উর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের ও কুশধ্বজের দু মেয়ে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিয়ে হয়।

পঞ্চচূড়া

একজন অপ্সরা বা স্বর্গবেশ্যা।

পঞ্চপাণ্ডব

যুধিষ্ঠির, ভিম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

পঞ্চবট

১. অশ্বথ, ২.বিল্ব, ৩. বট, ৪. অশোক, ৫. আমলকি এ পাঁচটি পবিত্র বৃক্ষকে পঞ্চবট বলে।

পঞ্চবটিবন

গোদাবরি নদীর উৎসস্থানের নিকটের অরণ্য। ১. অশথ, ২. বেল, ৩. বট, ৪. অশোক ও ৫. আমলকি– এ পাঁচটি পবিত্র বৃক্ষের সমন্বয় স্থান বলে এর নাম পঞ্চবাট। এখানে রাম নির্বাসন কালে কয়েক বছর অবস্থান করেন। এখান থেকে সীতা অপহৃতা হন।

পবন

বায়ুর অন্য নাম। একবার তিনি রাজা কুশনাভের শতমেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁদের সঙ্গ কামনা করেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃত হলে তিনি এঁদের বিকলাঙ্গ করে দেন। পরে কম্পিল্যনগরের রাজা ব্রহ্মদত্ত এ শতমেয়েদের বিয়ে করেন। সুমেরু পর্বতে বানররাজ কেশরি রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা হতে পবনরাজের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। (রামায়ণ– আদি) তৃতীয় পাণ্ডব ভিমও পবনদেবের অংশে কুন্তির গর্ভে জন্মলাভ করেন। (মহাভারত)

পরশুরাম

তিনি অলৌকিক বীরত্ব প্রভাবে ভগবানের ষষ্ঠ বা মতান্তরে ষোড়শ অবতার বলে কীর্তিত। তার বাবার নাম জমদগ্নি, মার নাম রেণুকা। রেণুকা একদিন স্নান করতে গিয়ে নদীতে গেলে সেখানে গন্ধর্বদের জলক্রীড়া দেখে তার মন কলুষিত

হয়। জমদগ্নি তা জেনে তাঁর শিরচ্ছেদ করতে আদেশ করলে পরশুরাম বাবার আদেশ অপরিহার্য বোধে মার মস্তক ছেদন করেন। পরে বাবা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর গ্রহণে অনুরোধ করায় তিনি মার পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন এবং তদনুসারে রেণুকা পুনর্জীবিত হন।

এক সময়ে রাজা কার্তবীর্য সসৈন্যে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে জমদগ্নি নিজ কামধেনুর সাহায্যে সে বহুসংখ্যক লোকের সুচারু আতিথ্য সম্পাদন করেন। রাজা তা দেখে বিস্মিত হয়ে ঐ কামধেনু নেয়ার জন্য মুণির নিকট আবেদন করলে মুণি রাজার প্রার্থনায় অসম্মত হন। সে সূত্রে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় রাজা জমদগ্নিকে হত্যা করে কামধেনু নিয়ে প্রস্থান করেন।

পরশুরাম সেকালে তীর্থপর্যটন গিয়ে পুষ্করতীর্থে তপস্যায় রত ছিলেন। সেখান হতে এসে পিতৃশোকে অভিভূত হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করবেন। অনন্তর তপস্যায় সন্তুষ্ট করে মহাদেবের নিকট হতে অস্ত্রশিক্ষা করে প্রথমে কার্তবীর্যকে হত্যা করে পরে ক্রমশ প্রচুর সংখ্যক ক্ষত্রিয় বীরের প্রাণ সংহার করেন।

চন্দ্রসেনরাজাকে হত্যা করে তার মহিষির প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন দেখে মহিষি নিতান্ত ভীত হয়ে দাল্‌ভ্য মুণির শরণাপন্ন হন। মুণি রাজ্ঞির গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে তার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার কার্য করবেন না এবং ক্ষত্রিয়ের শিক্ষণিয় ধনূবিদ্যা শিক্ষা দিবেন না এমন অঙ্গিকার করলে পরাশুরাম রাজমহিষিকে অভয়দান করেন। চন্দ্রসেনের সে ছেলে হতে কায়স্থের উৎপত্তি হয়।

শনির দৃষ্টিপাতে গণেশের মুণ্ড ছিন্ন হলে বিষ্ণু হস্তিমুণ্ড এনে গণেশের গলদেশে যোজিত করেন। পরে একদিন পরশুরামের সাথে গণেশের বিবাদ উপস্থিত হলে পরশুরাম রেগে কুঠারাঘাতে তার একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন।

পরশুরাম সমস্ত পৃথিবী জয় করে মহা সমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হলে গুরু কশ্যপকে দক্ষিণা স্বরূপ সমস্ত পৃথিবী দান করে তপস্যানিমিত্ত মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করতে লাগলেন।

দশরথি রাম সীতার পরিণয়শুল্করূপ হরশরাসম ভঙ্গ করে জানকিকে বিয়ে করেন। রামের এ অলৌকিক বীরত্বপ্রদর্শন পরশুরামের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। বিয়ের পর ছেলেদের সাথে দশরথের অযোধ্যাপ্রত্যাবর্তন কালে পরশুরাম তাঁদের নিকট উপস্থিত হন। দশরথ তাঁকে দেখে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে নানা স্তুতিবাক্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। রাম নির্ভীকচিত্তে তার সাথে কথোপকথন করলে

পরশুরাম তাঁকে নিজ সুদৃঢ় ধনুক দিয়ে তাতে বাণ যোজনা করতে বলেন। রাম অবলীলাক্রমে ধনুকে বাণ যোজনা করে পরশুরামের তপ প্রভাবে ইচ্ছানুযায়ি স্বর্গগমন পথ রুদ্ধ করেন। পরশুরাম হতদর্প হয়ে ম্লানমুখে মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন।

মহারথ ভিষ্ম ও দ্রোণ উভয়েই পরশুরামের শিষ্য। একদিন কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা মেয়ে অম্বা ভিষ্ম কর্তৃক স্বয়ম্বরসভা হতে অপহৃত ও পরিশেষে পরিত্যক্ত হলে অম্বা পরশুরামের শরণাপন্ন হন। পরশুরাম অম্বাকে গ্রহণের জন্য ভিষ্মকে অনুরোধ করলে ভিষ্ম তার অনুরোধ রক্ষা না করায় গুরুশিষ্যে তুমুল সংগ্রাম হয়। ২৩ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তকারি পরশুরামের শিষ্য ভিষ্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

বীরাগ্রগণ্য কর্ণও পরশুরামের শিষ্য। কিন্তু কর্ণ শিষ্য হবার আগে পরশুরামের নিকট নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন। একদিন পরশুরাম কর্ণের উরুতে মাথা রেখে ঘুমান। দৈবযোগে একটি দংশকীট সে সময় কর্ণের উরুতে দংশন করছিল। গরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে কর্ণ সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। ক্রমে উরুদেশনিঃসৃত রক্তের ছোঁয়ায় পরশুরামের ঘুম ভাঙ্গে। তিনি জেগে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনেন এবং কর্ণের অসামান্য সহিষ্ণুতাগুণে তাকে ক্ষত্রিয় বলে সন্দেহ করেন। পরে কর্ণ আত্মপরিচয় দিলে তিনি তাকে এ বলে অভিসাপ করেন যে– "তোমার মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্র স্মৃতিপথে আসবে না এবং অন্য মহাস্ত্র সকল নিস্তেজ হবে।"

পরাবসু

মহর্ষি রৈভ্যের অর্বাবসু ও পরাবসু নামে দু ছেলে ছিলো। রৈভ্যের কাছে ভরদ্বাজ নামে তাঁর এক বন্ধু বাস করতেন। ভরদ্বাজের ছেলে যবক্রীত গভীর তপস্যা করে ইন্দ্রের নিকট হতে বেদজ্ঞান লাভ করেন। এ জ্ঞানলাভের পর যবক্রীত দাম্ভিক ও ক্ষুদ্রমনা হয়ে পড়েন এবং মহানন্দে ঋসিদের অনিষ্টসাধন করতে থাকেন। একদিন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে যবক্রীত পরাবসুর রূপবতি স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ভজনা করতে বলেন। পরাবসুর স্ত্রী ভীত হয়ে 'তাই হবে' বলে পলায়ন করে। যবক্রীতের এ ব্যবহারে রৈভ্য রেগে গিয়ে তাঁর দু লম্বমান জটা ছিন্ন করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে, এক রূপবতি নারী ও এক ভিষণাকৃতি রাক্ষসের সৃষ্টি হয়। রৈভ্য এদের যবক্রীতকে হত্যা করার আদেশ দেন। উক্ত নারী যবক্রীতের কমণ্ডলু অপহরণ করে এবং রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্রীতকে নিহত করে। এরূপে পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে ভরদ্বজ সন্ত্রস্ত ও ক্রুদ্ধ রৈভ্যকে অভিসম্পাত দেন যে, তিনি শিঘ্রই তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে পরাবসু দ্বারা নিহত হবেন। এ অভিশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ পুত্রের সৎকার করে নিজেও অগ্নিতে প্রানবিসর্জন দেন।

একদা অর্বাবসু ও পরাবসু এক যজ্ঞে রাজা বৃহদদ্যুম্নকে সাহায্য করছিলেন। সে সময় একদিন রাত্রে পরাবসু আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকালে বনমধ্যে কৃষ্ণাজিনধারি বাবাকে দেখে হরিণ মনে করে আত্মরক্ষা করার জন্য বাবাকে বধ করেন। পিতৃহত্যার পর পরাবসু জ্যেষ্ঠ ভাই অর্বাবসুকে এ সংবাদ দিয়ে বলেন যে, তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর হয়ে ব্রহ্মহত্যার জন্য এখনই প্রায়শ্চিত্ত করুন। তিনি একাকিই রাজা বৃহদদ্যুম্নের যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। তখন পরাবসু রাজাকে জানালেন যে, তাঁর ভাইই ব্রহ্মহত্যাকারি, সে কারণ তাঁকে যজ্ঞে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিলে রাজাকে বললেন যে, তাঁর ভাই পরাবসুই ব্রহ্মহত্যা করেছে। প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি তাঁর ভাইকে পাপমুক্ত করেছেন। কিন্তু তথাপি রাজা অর্বাবসুকে বিতাড়িত করলেন। তখন অর্বাবসু অরণ্যে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন। উপাসনার ফলে সূর্য ও দেবতারা প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এঁদের বরে রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীত পুনর্জীবিত হলেন এবং পরাবসুর পাপ দূর হলো।

পশুপতি

পশু অর্থাৎ সমস্ত জীবের পতি। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ব্রহ্মা একটি ছেলে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; যার ফলে রুদ্রের জন্ম হয়। এ ছেলে কাঁদতে কাঁদতে একটি নাম প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁর নাম 'রুদ্র' রাখেন। কিন্তু এ ছেলে এর পরেও সাতবার কেঁদেছিলেন বলে সাটি নাম প্রাপ্ত হন– ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভিম, উগ্র ও মহাদেব। এ নামগুলি রুদ্র বা শিবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পাণ্ডু

তিনি চন্দ্রবংশিয় শান্তনুছেলে বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ ছেলে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। শ্বশ্রূ সত্যবতির অনুরোধে অম্বালিকা শয়নগৃহে প্রবেশ করে ব্যাসের মূর্তি দেখে ভীতিতে পাণ্ডুরঙা হয়ে যান। মার দোষজাত এ পুত্রের রঙ সে কারণ পাণ্ডুর হয়। এবং তিনি পাণ্ডু নামে খ্যাত হন। তিনি বিখ্যাত ধনুর্ধর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভাই ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ও কনিষ্ঠ বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভজাত বলে পাণ্ডুই রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তিকে তিনি স্বয়ংবর-সভায় লাভ করেন। ভিষ্ম মদ্ররাজ শল্যের বোন মাদ্রির সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে দেন। পাণ্ডু নানা দেশ জয় করে প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করেন এবং পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একদা বনমধ্যে হরিণাকালে সংগমরত এক হরিণমিথুনকে পাণ্ডু পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করেন। কিমিন্দম মুনি হরিণরূপে ছেলেকামনায় তখন হরিণি-সংগম করছিলেন। তিনি 'সে

অবস্থায় বলেন, "আমি লোকলজ্জার ভয়ে হরিণরূপ ধারণপূর্বক মৃগি-সংগমে রত ছিলাম। তুমি আমাকে উক্ত অতৃপ্ত অবস্থাতেই বধ করলে। এতে তোমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ না হলেও আমার অভিশাপে স্ত্রী-সংগমকালে তুমিও অতৃপ্ত অবস্থায় দেহত্যাগ করবে।" এ অভিসম্পাতের ফলে ছেলেজন্ম অসম্ভব বিবেচনায় পাণ্ডু কুন্তি ও মাদ্রিকে নিয়ে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক বনবাসি হন। বনবাসকালে একদা কয়েকজন ব্রহ্মর্ষির ইঙ্গিতে তিনি পিতৃঋণ হতে মুক্ত হাবার জন্য কুন্তিকে ক্ষেত্রজ ছেলে উৎপাদনে অনুরোধ করেন। কুন্তি তাঁকে দুর্বাসার কাছ হতে প্রাপ্ত মন্ত্রের কথা জানান। তখন পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে তিনি ক্রমান্বয়ে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির, ভিম ও অর্জুনকে লাভ করেন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তি মাদ্রিকে ঐ মন্ত শিক্ষা দিলে তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন। একদা বসন্তকালে নির্জনে মাদ্রিকে দেখে পাণ্ডু কামার্ত হয়ে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে সবলে সহবাস করেন এবং ঐ সহবাসকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মাদ্রিও পাণ্ডুর সহগমন কামনায় প্রাণত্যাগ করেন। (মহাভারত– আদি)

পার্বতি

তিনি হিমালয় ও মেনকার মেয়ে এবং মহাদেবের স্ত্রী। দক্ষযজ্ঞে সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও উপস্থিত হলে বাবা দক্ষ দ্বারা ভর্ৎসিতা হন। যজ্ঞসভায় পতিনিন্দা সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে সতী দেহত্যাগ করে পর্বতরাজ হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তপস্যা দ্বারা পুনরায় মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। পর্বতরাজ হিমালয়ের মেয়ে বলে তাঁর নাম হয় পার্বতি।

পিনাকি

মহাদেব। এগারো তনুর অন্যতম।

পিনাকপানি

মহাদেবের অন্য নাম। শিবের ধনু ও বাদ্যযন্ত্র পিনাক নামে খ্যাত। এর আকার ধনুকের মতো। এটি স্থিতিস্থাপক ও গুণবিশিষ্ট একটি যষ্টি। এর দু দিক তন্তুদ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। মহাদেব যুদ্ধকালে তা দ্বারা শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে তা বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন। এ জন্য মহাদেবের নাম পিনাকপানি।

পুণ্ড্রদেশ

উত্তরবঙ্গ।

পদ্মিনি

চিতোরের প্রসিদ্ধ রাজপুতমহিলা। তিনি চিলোনপতি হামিরশঙ্খের মেয়ে এবং ভিমসিংহের স্ত্রী। তার ন্যায় রূপবতি ও গুণবতি রমণি সংসারে অতি বিরল। দিল্লিপতি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তার রূপবর্ণনায় মোহিত হয়ে তাঁকে অপহরণ করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। পরে দুর্দান্ত আক্রমণ অনিবার্য দেখে পদ্মিনি প্রভৃতি চিতোররমণিগণ ধর্ষিত হওয়া অপেক্ষা অগ্নি দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা সুখকর মনে করে অম্লানবদনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং ভস্ম হন।

পাণিনি

ব্যাকরণসূত্রকার মুণি তার প্রণীত ব্যাকরণকে পাণিনিয় ব্যাকরণ বলে। পাঞ্জাব প্রদেশস্থ শালাতুর গ্রামে তার জন্ম। তার মার নাম দাক্ষী। পাটলিপুত্রনিবাসি বর্ষ উপাধ্যায়ের অনেক শিষ্য ছিলেন, পাণিনি তাঁর অন্যতম শিষ্য। তিনি নানা কষ্ট সহ্য করে বহুদিন গুরুসেবা করলেন, অথচ অধ্যায়নের কোন ফল লাভ হলো না দেখে বর্ষপণ্ডিতের স্ত্রী তাঁকে তপস্যা করতে বলেন। পাণিনি তপস্যার জন্য হিমালয়ে গমন করে মহাদেবের আরাধনা করেন এবং মহাদেবের প্রসাদে এক অভিনব ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রাপ্ত হয়ে তাতে কৃতবিদ্য হন। এ বাংলা ব্যাকরণের মূল শাস্ত্র।

পিতৃহৃদয়

ঐশ্বর্যশালি লঙ্কায় বিক্রমশালি সম্রাট পুত্রশোকাতুর রাবণের বেদনার্ত হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি। যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যাগত দূতের মুখে বীরছেলে বীরবাহুর হত্যার বর্ণনা শুনে রাজা রাবণ বীরগর্বে গর্বিত হয়ে পুত্রের মৃতদেহ দেখার যে আত্মগৌরব লাভ করার সুযোগ আছে তা ম্লান হয়ে যায় পিতৃহৃদয়ের স্নেহাকাঙ্ক্ষার মধ্যে। সন্তানের প্রতি স্নেহার্ত হৃদয়ের আবেগ মধুর যে ভালবাসা তার কাছে আর কোন গৌরব প্রাধান্য পেতে পারে না। সেখানে হৃদয় হলো ফুলের মতো কোমল। মৃত্যুশোকের বজ্র আঘাত যদি সেখানে নিপতিত হয় তাহলে তা যে কত তীব্র হয়ে ওঠে তা রাবণের বেদনার্ত হাহাকার থেকে অনুধাব্য। অন্তর্যামী বিধাতার পক্ষেই সে বেদনার স্বরূপ যথার্থ অনুভূত হতে পারে। রাজা রাবণ তাঁর শত শক্তি সামর্থের হার মানিয়েছেন ছেলেস্নেহ কাতর হৃদয়ের আবেগের কাছে। রাবণের মাঝে শুধু আছে বেদনার নির্মম হাহাকার।

পুরাণ

বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা, ঋষি, দেবতা, দৈত্য প্রভৃতির বংশবিবরণ এবং বিভিন্ন বংশিয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা ও মন্বন্তর– এ পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। এ পাঁচটি লক্ষণ ভিন্ন পুরাণে জীবের উৎপত্তি, জীবিকা, অবতারের দ্বারা দুষ্টের বিনাশ ও ধর্মরক্ষা, জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ব্রহ্ম নিরূপণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত। প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব, ভৌগোলিক বিবরণ, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাধনা এতে লিপিবদ্ধ। পুরাণে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায়। পুরাণ আঠারো ভাগে বিভক্ত। পুরাণের উদ্দেশ্য পাঁচ বিষয় বর্ণনা হলেও এক একখানি পুরাণে এক একটি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুলস্ত্য

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ– এ সাত জন ব্রহ্মার মানসছেলে। পুলস্ত্য ব্রহ্মার কর্ণ হতে জাত অন্যতম মানসছেলে। সপ্তর্ষির মধ্যে তিনি একজন। তিনি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কাহিনি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। পুলস্ত্যের ছেলে বিশ্বশ্রবা। তিনি ব্রহ্মার নিকট হতে ব্রহ্মপুরান প্রাপ্ত হন এবং তা পরাশরকে জ্ঞাত করান। পরাশরই এ পুরাণ সর্বসাধারণে প্রচার করেন। সুমেরু পর্বতের নিকট তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমপ্রান্তে তপোনিরত থাকাকালিন অপ্সরা ও মুনিকন্যাদের নৃত্য-গীতি তাঁর তপোভঙ্গ হতো। সে কারণ পুলস্ত্য বিরক্ত হয়ে এক অদ্ভুত অভিশাপ দেন। তিনি বলেন, যে নারী এ স্থানে এসে তাঁর নেত্রপথে পতিত হবে, সে গর্ভবতি হবে। দৈবক্রমে তৃণবিন্দুর মেয়ে হবির্ভূ একদা নির্ভয়ে আশ্রমে এসে পুলস্ত্যের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে তাঁর বেদপাঠ শ্রবণকালে গর্ভবতি হন। তখন পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর অনুরোধে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁরই গর্ভে বিশ্বশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। এ বিশ্বশ্রবা মুনি রাবণাদির বাবা। কথিত আছে, সমস্ত রাক্ষস পুলস্ত্য হতে জন্মগ্রহণ করে বলে পৌলস্ত্য নামে খ্যাত।

পুরুষোত্তম

পুরুসের মধ্যে উত্তম। পুরুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ-বিষ্ণু। কৃষ্ণও পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন।

পুষ্পক

চতুর্লোকপাল কুবেরের আকাশচারি সর্বগতি রথ। ব্রহ্মা কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ অপূর্ব পুষ্পকরথ দান করেন। হংসচালিত মহাবেগশালি এ বিমানে

রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ এবং প্রাণময় তুরঙ্গ শোভিত ছিল। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত বক্র। এতে পুষা খচিত ছিল। পদ্মপরাগ মণ্ডিত ও শুণ্ডে পদ্মপত্র শোভিত হস্তি ছিল। কোথাও বা পদ্মের উপর কমলা পদ্মহাতে বিরাজমান। এ রথ আরোহিদের ইচ্ছা অনুসারে ইচ্ছানুরাগ স্থানে চালিত হোত। রাতচর ভূতগণ এ পুষ্পক বহন করতো। এ রথ দেবশিল্পি বিশ্বকর্মা নির্মিত। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে এ পুষ্পকরথ অপহরণ করে নিয়ে আসেন। বহুদিন এ রথ তাঁর অধিকারে ছিল। রাম রাবণকে নিহত করলে এ রথ আবার কুবেরের করায়ত্ত হয়।

পুষ্পদন্ত

(১) একজন গন্ধর্ব ও শিবের বিশিষ্ট চরবিশেষ। একবার শিবের সঙ্গে পার্বতীর গোপনিয় কথোপকথন নিভৃতে শ্রবণকরতঃ তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করার জন্য তিনি মহাদেবের ক্রোধভাজন হন। এ অপরাধে তাঁকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং তিনি বররুচি নামে প্রসিদ্ধ হন। দুর্গার সখি জয়া তাঁর স্ত্রী।

(২) আট দিগ্‌গজের অন্যতম। উত্তর-পশ্চিম দিকের অধিপতি বায়ু এ পুষ্পদন্তের উপর অবস্থান করে ঐ দিক রক্ষা করেন।

(৩) পুষ্পদন্ত নামে একজন গন্ধর্ব ছিল। এর পুত্রের নাম মাল্যবান। (পদ্মপুরাণ)

পৃথ্বীরাজ

দিল্লিশ্বর। দিল্লিশ্বর অনঙ্গপালের দৌহিত্র। ১১৫৯ সালে তার জন্ম হয়। অনঙ্গপালের আর এক দৌহিত্র ছিলেন। তাঁর নাম জয়চাঁদ। দিল্লিশ্বরের ছেলে ছিলো না এজন্য তিনি পৃথ্বীরাজকে উত্তরাধিকারি করে দিল্লির সিংহাসন অর্পণ করেন। সে সূত্রে জয়চাঁদের সাথে পৃথ্বীরাজের বিদ্বেষভাব অতিশয় প্রবল হয়ে ওঠে। জয়চাঁদ কনৌজের অধিপতি ছিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজ অপেক্ষা নিজ গৌরব বৃদ্ধির জন্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং অন্যান্য নৃপতিগণের ন্যায় পৃথ্বীরাজকেও ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন। পৃথ্বীরাজ তাঁকে রাজসূয় যজ্ঞের অনধিকারি মনে করে যজ্ঞসভায় উপস্থিত হননি। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে দ্বারবানের বেশে ঐ প্রতিকৃতি স্থাপন করেন।

জয়চাঁদের সংযথা নামে রূপগুণবতি এক মেয়ে ছিলো। সে মেয়ে আগে হতে বীরবর পৃথ্বীরাজের ওপর অনুরক্তা ছিলেন। দিল্লিপতিও তার রূপগুণের প্রলোভনে তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহি হন। রাজসূয় যজ্ঞাবসানে জয়চাঁদ মেয়ের স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করেন। পৃথ্বীরাজ সংযথার মনোভাব জেনে ছিলেন। কিন্তু জয়চাঁদের

প্রতিকূলতা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক হলো মনে করে সংযথাকে বলপূর্বক অপহরণ করার সঙ্কল্প করেন এবং তদুপযোগি আয়োজন করে স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবে স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সংযথা স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে অন্যান্য নরপতিগণকে উপেক্ষা করে সভার দ্বারদেশে স্থাপিত পৃথ্বীরাজকের প্রতিমূর্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করেন। পৃথ্বীরাজ সংযথার অকপট অনুরাগের পরিচয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে ঘোড়ারোহণে দিল্লি অভিমুখে ধাবিত হলেন। জয়চাঁদ সসৈন্যে তার পশ্চাৎ ধাবন করলেন। পথিমধ্যে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ছদিন যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ সংযথাকে নিয়ে দিল্লিতে উপস্থিত হন এবং সেখানে মহাসমারোহে তাঁদের বিয়ে হয়।

জয়চাঁদ এভাবে পৃথ্বীরাজের নিকট অপমানিত হয়ে তাঁর দমনার্থ মুহম্মদ ঘোরির শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে দিল্লি আক্রমণ করতে অনুরোধ করেন। ১১৯২ সালে মুহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। টিরোরিনামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়, মুহম্মদ সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে যান। দু বৎসর পরে ঘোরি যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করে আবার দিল্লিপতির দমনার্থ ভারতে এসে কাগার নদীর তীরবর্তি থানেশ্বরে শিবিরসন্নিবেশ করলেন।

সেকালে পৃথ্বীরাজের অবস্থা এরূপ ঘটেছিলো যে, তিনি স্বদেশ বিদেশ নরপতিদেরকে পরাজিত করে নিজ আধিপত্য নিষ্কন্টক মনে করতেন, সুতরাং আগের মতো অবহিত চিত্তে রাজকার্য চালাতেন না। তাঁর অধিকাংশ সময়ই বিলাসিতায় কাটতো। তার সৌভাগ্যলক্ষ্মি এভাবে রন্ধ্রপথে প্রস্থান করার উপক্রম করছিলেন, ইত্যবসরে মুহম্মদ ঘোরি ঘোরতররূপে আক্রমণ করায় পৃথ্বীরাজ সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দি হয়েছিলেন। পরে তাঁর সর্বাঙ্গের চর্মচ্ছেদন করে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়।

পৃথু

ত্রেতাযুগে সূর্যবংশিয় পঞ্চম নৃপতি। ঋষিগণ বেণরাজার দক্ষিণকর মন্থন করেন। ঐ ডান হাত হতে পৃথুরাজার জন্ম হয়। ধরণীতলে তিনি আদি রাজা। তাঁর নামানুসারে ধরার নাম পৃথিবী হয়। তার দ্বারাই প্রথমে রাজ্যশাসন প্রণালি প্রবর্তিত হয়। দু দৈত্য ১. মধু ও ২. কৈটতের মেদ দ্বারা এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়।

প্রতাপাদিত্য

তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান রাজা ছিলেন। অমাত্য শঙ্কর ভট্টাচার্যের সহায়তায় বঙ্গে তাঁর স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হলে তদানিন্তন সম্রাট আকবর সে

সংবাদ পেয়ে তাকে দমনার্থ বাংলাদেশের নবাবকে আদেশ করেন। নবাব প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করে যুদ্ধে তার নিকট পরাজিত হন। এ ঘটনায় প্রতাপের অতীব যশোবৃদ্ধি হয়েছিল। গৌঢ়ের যশঅপহরণ করায় এর রাজধানি যশোহর নামে অভিহিত হয়।

কোন গুরুতর কারণবশত প্রতাপাদিত্য তার পিতৃব্য বসন্তরায়কে হত্যা করেন। বসন্তরায়ের ছেলে কচুরায় দিল্লি গিয়ে তদানিন্তন সম্রাট জাহাঙ্গিরের নিকট প্রতাপাদিত্যের সমুদয় রাজবিদ্রোহিতার বিষয় নিবেদন করেন এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে অনুরোধ করেন। জাহাঙ্গির প্রতাপের গৃহশত্রু কচুরায়কে পেয়ে যশোহর জয় করতে কৃতসংকল্প হন এবং কচুরায়ের সাথে মানসিংহকে বহুসৈন্য সুসজ্জিত করে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য মোগলসৈন্য দ্বারা পরাজিত ও বন্দি হন। বন্দি অবস্থায় জগন্নাথক্ষেত্রে তার প্রাণত্যাগ হয়। প্রতাপের রাজধানি এখন সুন্দরবনে পরিণত।

প্রদ্যুম্ন

রুক্মিনির গর্ভে কৃষ্ণের ঔরসজাত। তিনি পূর্বজন্মে কন্দর্প ছিলেন, হরকোপানলে ভস্মিভূত হয়ে প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর সপ্তম দিবসে সম্বর নামক দৈত্য তাকে অপহরণ করে আনয়ন করেন। স্ত্রী মায়াবতির তত্ত্বাবধানে থেকে বালক ক্রমশ বড় হতে লাগলেন। ক্রমে ১৬ বছর বয়সে প্রদ্যুম্ন মায়াবতির নিকট হতে নানাবিধ আসুরিক মায়া শিক্ষা করেছিলেন। মায়াবতির নিকট হতে সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত জেনে প্রদ্যুম্ন যুদ্ধে সম্বরকে বিনাশ করেন এবং মায়াবতির সাথে দ্বারকার মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হন। এ মায়াবতিই কামদেবের পূর্বস্ত্রী রতি, তিনি কন্দর্পভস্মের পর মহাদেবের আদেশানুসারে শম্বরগৃহে নিজ ভার্যারূপে অবস্থান করতেন। শম্বরকে হত্যার পর দ্বারকায় উপস্থিত হলে কৃষ্ণ তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করে মায়াবতির সাথে প্রদ্যুম্নের বিয়ে দেন।

পরে প্রদ্যুম্ন মামা রুক্মির মেয়ের স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলে বৈদভি তাঁকে বরমাল্য অর্পণ করে স্বামি রূপে বরণ করেন। তাঁর গর্ভে প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

বজ্রনাভ দৈত্যের অতিশয় উপদ্রব হলে প্রদ্যুম্ন নটদের সাথে বজ্রপুরে উপস্থিত হয়ে নিজ মেয়ে প্রভাবতিকে গান্ধর্ববিধানে বিয়ে করেন। দৈত্যগণ সমস্ত জেনে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে প্রদ্যুম্ন অসীম পরাক্রম প্রকাশে যুদ্ধ করে তাঁদেরকে সংবশে হত্যা করেন। প্রদ্যুম্ন একজন খ্যাতিমান বীর ছিলেন। শম্বরবধ তাঁর বিপুল বীরত্বের পরিচায়ক। অবশেষে যদুবংশের সময় তিনি নিহত হন।

প্রমথ

শিবের পারিষদ্ ও অনুচরবর্গ। এরা নৃত্য-গীতবিশারদ ও নানারূপ ধারি। কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে– মহাদেবের মুখনির্গত ফেনা হতে প্রমথদের উৎপত্তি। এরা মহাদেবের পার্শ্বচর ও পশ্চাৎ বিচরণকারি। এ শ্রেণির প্রমথরা মায়াবি এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত– একদল ভোগহীন, ধ্যানপরায়ণ যোগি, একদল কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া-বিষয়ের সহায়ক; আর একদল যুদ্ধে শত্রুদমনকারি; অন্য দল রুদ্র নামে মহাদেবের আদেশানুসারে স্বর্গে বসবাসকারি ও তাঁর সেবা ব্রতী।

প্রলয়

একটি কল্পের শেষে পৃথিবীর ধ্বংসকে প্রলয় বলে।

প্রমিলা

পত্নী প্রমিলার প্রতি মেঘনাদের অফুরন্ত প্রেমের অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে। কখনও সুনিদ্রায় রজনি অতিবাহিত হয়েছে। যুদ্ধযাত্রার আগে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে মেঘনাদকে। তারই প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে প্রভাতে। প্রমিলাকে সাথে নিয়ে তিনি মায়ের কাছে যাবেন। ঘুম থেকে ওঠানোর ব্যাপারটি প্রেমানুভূতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘুম থেকে জাগাতে হবে প্রমিলাকে। মেঘনাদের মনে হয়েছে বাইরের সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রমিলাকে জাগানোর আয়োজন করছে। পাখিরা ডাকাডাকিতে মুখর হয়ে উঠেছে। সে কুজনে জেগে উঠবে প্রমিলা। প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে প্রমিলা চোখ খুলুক এ কামনা করছেন মেঘনাদ। মেঘনাদের জীবনে প্রমিলা অফুরন্ত আনন্দের উৎস। তাঁকে চিরানন্দ বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রমিলার আনন্দালোকের প্রতিফলনকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেঘনাদের জীবন। সূর্যের আলো পেয়ে প্রকৃতি জেগে ওঠে। তেমনি প্রমিলার প্রেমালোকে দীপ্তিমান হন যুবরাজ মেঘনাদ। সূর্য না থাকলে প্রকৃতি যেমন আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, প্রমিলা না থাকলে মেঘনাদও তেমনি জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে বিবেচনা করেন। মেঘনাদের পাশে প্রমিলা অত্যুজ্জ্বল। মেঘনাদকে বীর করে তোলার পেছনে প্রমিলার অবদান অনস্বীকার্য।

প্রহ্লাদ

দৈত্যপতি। হিরণ্যকশিপুর ছেলে। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু বরাহ অবতারে হত্যা করেছিলেন বলে

হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুর সাথে অতিশয় শত্রুতা করতেন। শিক্ষার জন্য ছেলে প্রহ্লাদকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করলে শিক্ষক অতি যত্ন করে তাঁকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রহ্লাদ একান্ত হরিপরায়ণ, সুতরাং হরিনাম ছাড়া কোন বাক্যেই তিনি কর্ণপাত করতেন না। তাঁর অপকট হরিভক্তি দেখে নিজ সহচর বালকেরাও পরম সমাদরে হরিনাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ করলেন।

এ ঘটনায় দৈত্যরাজ অতিশয় রেগে প্রহ্লাদকে হত্যা করতে আদেশ দেন। রাজার আদেশে ঘাতকেরা খড়্গাঘাতে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি তদগতচিত্তে হরিনাম করতে আরম্ভ করেন, হরিনামের গুণে খড়্গ তার শরিরে প্রবেশ করতেই সমর্থ হয়নি। প্রহ্লাদকে হস্তি পদতলে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে, উত্তালতরঙ্গময় সাগরগর্ভে এবং পর্বত হতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পরিশেষে বিষ প্রয়োগেও প্রহ্লাদের জীবন নষ্ট হলো না দেখে হিরণ্যকশিপুর তাঁকে নিকটে আনয়ন করে নানাভাবে বুঝিয়ে হরিনাম ত্যাগ করতে বলেন। প্রহ্লাদ কিছুতেই তা স্বীকার করলেন না। তখন দৈত্যপতি ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর হরি কোথায়" প্রহ্লাদ স্থিরচিত্তে উত্তর করলেন, "তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।" পরে দৈত্যরাজ জলদ- গম্ভিরস্বরে আবার বললেন, "তোর হরি এ স্ফটিকস্তম্ভে আছে?" তিনি উত্তর করলেন, "অবশ্য আছেন" তখন দৈত্যপতি ক্রোধান্ধ হয়ে বজ্রমুষ্ঠিপ্রহারে যেমন স্ফটিক স্তম্ভ চূর্ণ করলেন, অমনি তা হতে বিচিত্র ভিষণ নরসিংহমূর্তি বের হয়ে হিরণ্যকশিপুরে হত্যা করলেন।

প্রিয়ম্বদা

শকুন্তলার সখি।

ফলবতি

ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা জাবালি মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে রম্ভার এক মেয়ে হয়। জাবালি তাকে পালন করেন। এ মেয়ের নাম ফলবতি।

বক

ঋষ্যশৃঙ্গ রাক্ষসের অলম্বুষ ও বক নামে দু ছেলে ছিল। বকরাক্ষস একচক্রা গ্রামে বাস করতো ও গ্রামবাসিদের ওপর ভিষণ অত্যাচার করতো। শেষে গ্রামবাসিরা অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য রাক্ষসের সঙ্গে এক শর্তে আবদ্ধ হয়। সে শর্তটি ছিলো– প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে গ্রামের এক এক পরিবার থেকে এক একটি মানুষ, প্রচুর অন্ন ও দুটি মহিষকে উক্ত রাক্ষসের খাদ্যরূপে প্রেরণ করতে হবে এবং এরই পরিবর্তে বকরাক্ষস দেশরক্ষা করবে। জতুগৃহদাহ হতে পরিত্রাণ পেয়ে

পাণ্ডবেরা একচক্রা নামক এ গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নেন। ঘটনাক্রমে সে সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হওয়ায় তাঁর গৃহে ভিষণ আতঙ্ক ও ক্রন্দনের রোল ওঠে। কুন্তি এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন এবং ব্রাহ্মণের পরিবর্তে খাদ্যদ্রব্যসহ ভিমকে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করেন। ভিম সেখানে উপস্থিত হয়ে ভিষণ যুদ্ধে বকরাক্ষসকে নিহত করে সমস্ত গ্রামে শান্তি স্থাপন করেন। (মহাভারত– আদি)

বরুণ

ঋষিদের তিনি একজন প্রধান দেবতা। তিনি দশ দিকপালের অন্যতম ও একজন লোকপাল এবং জলের দেবতা নামে প্রখ্যাত। সূর্য তাঁর নেত্র, সুবর্ণময় তাঁর রথ ও প্রাসাদ। তাঁর বহু অনুচার ছিল। তিনি বারুণি নামে সুরা পান করতেন। এ সুরা সমুদ্রমন্থন হতে উত্থিত হয়। বেদে বরুণ সহস্যলোচন বলে কথিত আছেন।

বেদে বহু স্থলে মিত্র ও বরুণ একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজিত হন। মিত্র ছিলেন আলোকের দেবতা। বরুণ অর্থাৎ আবরণ বা আবৃত করা। আবরণকারি আকাশকে আর্যরা বরুণ নামে পূজা করতেন। ঋকবেদে ঋষিরা আকাশকে সমুদ্রের সঙ্গে কল্পনা করে জলময় মনে করতেন। এ জন্য ঋকবেদ আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতেও বরুণের অবস্থিতি কল্পনা করেন। বরুণ সূর্যের গমনের পথ বিস্তার করে থাকেন। তাঁর শত-সহস্র ওষধি আছে, অর্থাৎ তিনি যমের ন্যায় পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা। তিনি ধনাধিকারি, জলবিন্দুর মতো শ্বেতরঙ গৌর মৃগের মতো বলবান। তিনি বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেছেন। ঋষিরা প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্যপরম্পরা দেখে বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদিকে স্বতন্ত্র কল্পনা করেছিলেন; কিন্তু পরে এঁদের ঐক্য দেখে ঈশ্বরের একত্ব অনুভব করেন। এ একত্বের জন্য মিত্র ও বরুণের নাম পার্থক্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক কাজ সম্পাদন করলেও মূলে এক ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নয়।

মহাভারতে কথিত আছে– তিনি কর্দম ঋষির ছেলে ও পুষ্করের বাবা। প্রায় একই সময়ে উর্বশির কামনায় মিত্রাবরুণের এক কুম্ভমধ্যে শুক্রপাত হয়। এ তেজপূর্ণ শুক্র-নিক্ষিপ্ত কুম্ভ থেকে প্রথমে অগস্ত্য ও কিছুকাল পরে বশিষ্ঠের জন্ম হয়। খাণ্ডবদাহনের সময় অগ্নিকে সাহায্য করার জন্য বরুণ অর্জুনকে চন্দ্রপ্রদত্ত গাণ্ডিব ধনু, দুটি অক্ষয় তূণির ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকি নামে গদা প্রদান করেন। মহাভারতে আরও উল্লিখিত আছে যে, বরুণ চন্দ্রের মেয়ে ও উতথ্যের স্ত্রী ভদ্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যান। কিন্তু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েও ভদ্রাকে ফিরিয়ে না দেয়ায় মহর্ষি উতথ্য জলরাশি পান করে ফেলেন। তখন বরুণ ভীত হয়ে ভদ্রাকে প্রত্যর্পণ করেন।

বলরাম

কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভাই। বসুদেবের ঔরসে রোহিণির গর্ভে তার জন্ম। বলরাম সাক্ষাত অনন্ত, দেবকির সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করলে ঐ গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণির গর্ভে সঞ্চারিত করা হয়। বসুদেব কংসভয়ে ভীত হয়ে রোহিণি ও বলরামকে ব্রজধামে নন্দঘোষের আশ্রমে রেখেছিলেন।

বলরাম কৃষ্ণের সাথে মিলিত হয়ে বাল্যকাল কাটান। পরে উভয় ভাই মধুরায় নীত হলে কংসবধের সময় বলরাম কৃষ্ণের সাহায্য করে ছিলেন। শারিরিক বলে ও গদাযুদ্ধে বলরামের প্রতিপক্ষ কেউই ছিলেন না। লাঙ্গল তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল। ভিম ও দুর্যোধন তাঁর নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেননি। যদুবংশ ধ্বংস হলে বলরাম বনে গিয়ে যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করেন।

বল্লালসেন

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি বিজয় সেনের ছেলে। বিক্রমপুর তাঁর রাজধানি ছিলো। হুগলির অন্তর্গত সাতগ্রাম ও সেনবংশের রাজধানি বলে পরিচিত।

বল্লাল সেন শেষ বয়সে শিলবতি নামের এক অজ্ঞাতকুল রমণির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন এবং সে বিয়ের জন্য নিজ ছেলে লক্ষ্মণ সেনের সাথে তার বিশেষ মনোমালিন্য ঘটে। এরপর তিনি নবপরিনীতা স্ত্রী শিলবতিকে নিয়ে নবদ্বীপে বসতি করেন। পরে শিলবতি নিচবংশিয় ডোমের মেয়ে বলে জানাজানি হলে বল্লালসেন ভূগর্ভে একটি গৃহনির্মাণ ও তাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য বস্তুর সংস্থাপন করে তাতে শিলবতিকে প্রোথিত করেন।

বর্তমান নবদ্বীপের প্রায় দুক্রোশ উত্তরে একটি প্রকাণ্ড উচ্চস্থান আছে, সে স্থানে বল্লাল সেনের প্রাসাদ ছিলো। এটি "বল্লাল ঢিবি" নামে পরিচিত। সে ঢিবির নিকট একটি পুরাতন বিস্তীর্ণ দিঘির সামান্য চিহ্নমাত্র আছে। সে স্থানে একটি ক্ষুদ্র পল্লি গ্রাম আছে, একে বল্লাল দিঘি বলে। বল্লালসেন হতেই নবদ্বীপে রাজধানি স্থাপিত হয়।

বল্লালসেন ১০৬৬ সালে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহন করেন। শুদ্রবংশিয় নরোত্তম দাস তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রংপুর, কামরূপ, বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোটি, ত্রিপুরা, মিথিলা ও বারাণসি পর্যন্ত প্রদেশ সমূহে বল্লালের আধিপত্য বিস্তার হয়েছিল।

বল্লালসেন বঙ্গিয় ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। তদানিন্তন রাঢ়ি ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে আচার ভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি ন গুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরকে সর্বাপেক্ষা উন্নত মর্মে পদাভিষিক্ত করেছিলেন। নবগুণ এ– ১. আচারো, ২. বিনয়ো, ৩. বিদ্যা, ৪. প্রতিষ্ঠা, ৫. তীর্থদর্শনম, ৬. নিষ্ঠা, ৭. বৃত্তি, ৮. স্তপো, ৯. দানং, নবধা কুল লক্ষণম। "দান সাগর" নামে খ্যাতিমান গ্রন্থ বল্লালসেন কর্তৃক প্রণীত। তিনি ৪০ বছর রাজত্ব করে ১১০৬ সালে প্রাণত্যাগ করেন।

বভ্রুবাহন

মণিপুরের নরপতি। তিনি অর্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভসম্ভুত। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জুন যজ্ঞিয় ঘোড়া নিয়ে মণিপুরে উপস্থিত হলে বভ্রুবাহন তাকে বাবা বলে অভ্যর্থনা করেন। অর্জুন তাঁর সে অভ্যর্থনা ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুচিত বিচেনায় তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন। পরে বভ্রুবাহনের সাথে অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে অর্জুন পুত্রের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন।

বলি

বলি দৈত্যদের রাজা। তিনি বিরোচনের ছেলে, প্রহ্লাদের নাতি। বলি অজেয় ও অমর হয়ে স্বর্গের ও পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ইন্দ্রাদি দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তিনি ত্রিভুবনের রাজা হন। এর ফলে দেবগণ রাজ্যচ্যুত হয়ে বিষ্ণুর শরাণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু বামনরূপে কশ্যপের ছেলে হয়ে বলিকে ছলনা করার জন্য বলির যজ্ঞে উপস্থিত হন। এ যজ্ঞানুষ্ঠানে বলি প্রভূত দান করতে থাকলে বামন বলির কাছে মাত্র ত্রিপদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি এতে সম্মত হয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমি দান করলেন। বামন দু পা দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত অধিকার করে নাভি থেকে নির্গত তৃতীয় পা রাখার স্থান বলিকে নির্দেশ করতে বলেন। তখন বলি নিজের মাথা অবনত করে তার ওপর বামনকে তাঁর তৃতীয় পা রাখতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তৃতীয় পা বলির মাথায় রাখা মাত্র বলি বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। এমন সময় পিতামহ প্রহ্লাদ এসে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুকে বলির বন্ধন মোচনের জন্য অনুরোধ করলে তাঁর প্রার্থনায় বিষ্ণু বলির বন্ধন মোচন করলেন। তিনি বললেন– 'দেবতাদের দুষ্প্রাপ্য স্থান রসাতল তোমার (বলির) বাসের জন্য দান করলাম।' তাই বিষ্ণুর আদেশে বলিরাজ বন্ধু বান্ধবের সাথে পাতালে রাজত্ব করতে লাগলেন। ভক্ত বৎসল ভগবান বলির দ্বারে দৌবারিকের কার্য করেছিলেন।

বশিষ্ঠ

ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং সপ্তর্ষিগণের অন্যতম ঋষি। বশিষ্ঠের স্ত্রীর নাম অরুন্ধতি। অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের শত ছেলে জন্মে। কল্মাষপাদ নামক রাজা বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ ছেলে শক্তির অভিশাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়ে মুণির শত ছেলেকে ভক্ষণ করেন। বশিষ্ঠ তাঁকে শাপমুক্ত করেছিলেন। শক্তির ঔরসে নিজ স্ত্রী অদৃশন্তির গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়।

বসু

পুরুবংশের রাজা। তিনি চেদিরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর অপর নাম উপরিচর। বসু রাজার ঔরসে অদ্রিকা নামে মৎস্যরূপা অপ্সরার গর্ভে মৎস্য নামে ছেলে এবং মৎস্যগন্ধা নামে তাঁর মেয়ে জন্মে। এ মেয়েই ব্যাসদেবের মা সত্যবতি।

বসুদেব

যাদববিশেষ ও কৃষ্ণের বাবা। তাঁর বাবা যদুবংশিয় শূর ও মা ভোজকন্যা মহিষি। বসুদেবের স্ত্রীর নাম দেবকি। পৃথা বা কুন্তি তাঁর সহোদরা। বসুদেবের অন্য স্ত্রীর নাম রোহিণি। রোহিণির গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। দেবকির সঙ্গে তাঁর বিয়েকালে কংশ দৈববাণি শ্রবণ করেন যে, দেবকির অষ্টম সন্তান দ্বারা তিনি নিহত হবেন। সে জন্য কংশ বসুদেব ও দেবকিকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করেন। এর পর দেবকির গর্ভে এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করতে থাকে এবং কংশ দ্বারা তাঁরা নিহত হয়। সাতটি সন্তান নিহত হবার পর দেবকির অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জ ন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র বসুদেব ছেলেকে ঘোর অন্ধকার রাত্রে যমুনার অপর পারে নন্দের গৃহে তাঁর স্ত্রী বশোদার নিকট রেখে, তার অজ্ঞাতেই নন্দের সদ্যোজাতা মেয়েকে এনে দেবকির পাশে রেখে দেন। কংশ এ মেয়েকে পাষাণে নিক্ষেপ করতে গেলে, এ মেয়ে শূন্যে উত্থিত হয়ে কংশের বিনাশকারি জন্মগ্রহণ করেছে বলে আকাশবাণি করে অন্তর্ধান করেন। এ মেয়ে মহামায়া। পরে কৃষ্ণ ও বলরাম কংশের ধনুর্যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিনাশ করে বসুদেব ও দেবকিকে কারামুক্ত করেন। কৃষ্ণ মথুরার রাজা হলে বসুদেব স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেন। রোহিণির গর্ভে বসুদেবের সুভদ্রা নামে এক মেয়ে হয় যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগ করলে তিনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং উক্ত সময় অর্জুন উপস্থিত হলে তাঁকে কৃষ্ণের শেষ আদেশ জ্ঞাপন করে যোগারূঢ় অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

বাণভট্ট

তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং সর্ব শাস্ত্রবিশারদ প্রগাঢ় পণ্ডিত। তৎকৃত কাদম্বরি গ্রন্থের মুখবন্ধে তাঁর বংশপরিচয় এরূপ-বাৎস্যায়নগোত্রসম্ভূত কুবেরের ছেলে অর্থপতি, অর্থপতির ছেলে চিত্রভানু, চিত্রভানুর ছেলে বাণ। বাণভট্ট খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দিতে বর্তমান ছিলেন।

কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্ধন বা শ্রীহর্ষ ৬০৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বাণভট্ট তাঁরই সভাসদ ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর মাতঙ্গ, দিবাকর ও ময়ুরভট্ট প্রভৃতি সকলেই বাণভট্টের সমসাময়িক। বাণভট্ট ময়ুরভট্টের মেয়েকে বিয়ে করেন। কাদম্বরি, হর্ষচরিত ও চণ্ডিকা শতক গ্রন্থ তিনটি বাণভট্ট-প্রণীত। সংস্কৃত ভাষায় যতগুলো গদ্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কাদম্বরী সর্বোৎকৃষ্ট।

বাতাপি

দৈত্য। তাঁর ভাইয়ের নাম ইল্বল। তাঁরা উভয়ে প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠভাই হলাদের ছেলে। ইল্বল দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কোন এক জনপদের রাজা ছিল। বাতাপি মায়াবলে হরিণের রূপ ধারণ করতেন, ইল্বল তাঁর মাংস দ্বারা অতিথিদিগকে ভোজন করাতেন। পরে মৃতসঞ্জীবনি মন্ত্র বলে ইল্বল অতিথির উদরগত বাতাপিকে পুনর্জীবিত করলে ভোক্তগণ নিহত হতেন। এরূপে দুরাত্মা অসুর অনেকের প্রাণ বিনাশ করেন।

একদিন মহর্ষি অগস্ত্য ধনার্থী হয়ে ইল্বল রাজের নিকট উপস্থিত হন। ইল্বল বাতাপির মাংস দ্বারা তাঁর আতিথ্য সম্পাদন করেন। মুণি যোগবলে বাতাপিকে জীর্ণ করে বিনষ্ট করেন।

বামন

বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। প্রহ্লাদের পৌত্র দৈত্যরাজ বলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালি হয়ে দেবতাদের দেবলোক থেকে নির্বাসিত করলে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বলিকে দমন করে দেবতাদের উদ্ধার করার জন্য কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একবার বলি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে প্রচার করেন যে, এ যজ্ঞে তাঁর কাছে যে যা প্রার্থনা করবেন, তিনি তা-ই পূরণ করবেন। এক বামন যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে বলির কাছে মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন।

বাল্মীকি

বিশ্বের প্রথম কবি। তিনি বরুণের ছেলে এবং দশরথের সমবয়স্ক। অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অরণ্যের মধ্যে তমসা নদীর তীরে ছিলো তাঁর আশ্রম। যৌবনে তিনি ছিলেন দস্যু রত্নাকর। পথিকদের হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুট করতেন। একদিন নারদকে হত্যা করতে গেলে নারদ মুণি রত্নাকরকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি জন্য এ মহাপাপ করছেন? রত্নাকর উত্তর দেন, পরিজনের প্রতিপালনের জন্য। নারদ আবার প্রশ্ন করেন, সে পরিজনেরা কি এ পাপের ভার গ্রহণ করবেন? উত্তরে রত্নাকর বলেন, অবশ্যই করবেন। নারদ তখন সেখানে অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রত্নাকরকে বাড়ি গিয়ে সকলকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলেন। তিনি এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, তাঁরা কেউই তাঁর পাপের ভার গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। তখন রত্নাকরের চৈতন্য হয়। তিনি নারদের নিকট এ মহাপাপের প্রতিকার কি তা জিজ্ঞেস করায় নারদ কর্তৃক রাম-মন্ত্র জপ করার জন্য উপদেশ পান এবং ষাট হাজার বছর তপস্যা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তপস্যারত অবস্থায় তাঁর সর্বশরির বল্মীক বা উইপোকার ঢিবিতে আচ্ছন্ন হয়। এজন্য তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। এ ঘটনার পর একদিন নারদ মুণি তাঁকে রামের কাহিনি শুনিয়ে স্বর্গে গেলেন। একদিন বাল্মীকি তমসার তীরে ভ্রমণকালে দেখেন, বনে কামক্রীড়ারত এক ক্রৌঞ্চ মিথুনের ক্রৌঞ্চকে একজন শিকারি তীর মেরে হত্যা করলেন। এতে ক্রৌঞ্চি করুণ সুরে বিলাপ করতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে শোকাভিভূত বাল্মীকির মুখ থেকে একটি শ্লোক বের হয়। শ্লোকটি হলো–

'মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনা দেকমবধীঃ কামমোহিতম।'

এটাই আদি কবিতা। বাল্মীকির সকরুণ হৃদয়ে স্নান সমাপণ করে কুটিরে ফিরলে ব্রহ্মা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন– "মহর্ষি! অদ্য তোমার মুখ হতে যে অপূর্ব ছন্দোরচিতবাক্য নিঃসৃত হয়েছে এর নাম শ্লোক হলো, তুমি আজ হতে পৃথিবীতে আদিকবি বলে খ্যাতিলাভ করবে, এরূপ বাক্যে গ্রন্থ রচনা করো, অনন্ত শব্দার্থ তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে।" এ বলে কমলযোনি অন্তর্হিত হলে বাল্মীকি একদিন দেবর্ষি নারদকে এরূপ প্রশ্ন করেন যে– "মনুষ্য মধ্যে কোন মহাপুরুষ অশেষগুণ সম্পন্ন? তদুত্তরে নারদ মুখে দশরথ নন্দন রামের অনুপম গুণ শুনে তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হন এবং ভক্তিপূর্ণ অনুরাগসহকারে অমূল্য রত্ন স্বরূপ "রামায়ণ" গ্রন্থ প্রণয়ন করে কীতিকলেবরে চিরকালের জন্য অমরত্ব লাভ করেছেন।"

বালি

ইন্দ্রের ছেলে কিস্কিন্ধার অধিপতি কপিরাজ। তাঁর ভাই সুগ্রীব, স্ত্রীর নাম তারা। তারার গর্ভে তার অঙ্গদ নামে ছেলে জন্মে। অসাধারণ বলবীর্যে বালি তদানিন্তন বীরগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। একদিন মহাবীর রাবণ দিগ্বিজয়ার্ত এসে বালির নিকট বিশেষ রূপে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। বালি এক সময়ে দুন্দুভিনামক অসুরকে হত্যা করেন। পরে তাঁর ছেলে মায়াবি যুদ্ধের জন্য বালির নিকট উপস্থিত হলে কপিরাজ অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করে প্রবল বেগে তাঁর প্রতি ধাবিত হন। মায়াবি অসুরের ভয়ে পলায়ন করে এক পর্বতে গুহায় প্রবেশ করে। বালি সুগ্রীবকে ঐ গুহার দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করে স্বয়ং গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে এক বছর পরে অসুরকে হত্যা করে গুহা হতে বের হন। ইতোপূর্বে সুগ্রীব বালির প্রত্যাবর্তনে বহু দিন অতীত হওয়ায় তার মরণ নিশ্চিত করে কিস্কিন্ধায় এসে রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

বালি ভাইয়ের ব্যবহারে অতিশয় রেগে গিয়ে তাঁর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তাঁকে দেশ হতে দূর করেন। সুগ্রীব কতিপয় বন্ধুর সাথে ঋষ্যমুক পর্বতে অবস্থান করতে লাগলেন। রামের বনবাস কালে সীতা হরণের পর রাম সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রিবের সাথে মিত্রতা করেন। সুগ্রীব রামের সাহায্য পেয়ে বালির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সে যুদ্ধে রাম বালিকে হত্যা করেন।

বাসুদেব

কৃষ্ণের বাবা। তিনি যদুবংশিয় শুরসেনের ছেলে। তার দু স্ত্রী, ১. দেবকি ও ২. রোহিণি। দেবক রাজার মেয়ে দেবকির সাথে বিয়ের সময় দেবকির ভাই কংস দৈরবাণিতে অবগত হন যে, দেবকির অষ্টমগর্ভের সন্তান তার মৃত্যুর কারণ হবে। ঐ অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে কংসকে হত্যা করেন। বাসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিণির গর্ভে বলরাম নামে ছেলে এবং সুভদ্রানামে মেয়ে জন্মে। সুভদ্রার সাথে অর্জুনের বিয়ে হয়। যদুবংশ ধ্বংস হলে বসুদেব যোগ অবলম্বনে প্রাণ ত্যাগ করেন।

বিজয়সেন

বাংলার সেনবংশিয় প্রথম নরপতি। তিনি চন্দ্রবংশ সম্ভুত হেমন্ত সেনের ছেলে। তাঁর নাম যশোদেবি। বিজয়সেন দক্ষিণাপথ হতে এমে আগমন করে অসাধারণ বল বিক্রমে বঙ্গদেশ জয় করেন এবং গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করে একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেন তাঁর ছেলে।

বিদুর

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কাকা। ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্যপত্নী অম্বিকার দাসির গর্ভে তাঁর জন্ম। যে যমরাজ মাণ্ডব্য মুণির অভিশাপে পৃথিবীতে বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিদুর পাণ্ডবগণের একান্ত পক্ষপাতি ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র করতেন, বিদুর তাতে খুব কষ্ট পেতেন। তিনি বারণাবতে জতুগৃহ দাহ বিষয়ক দুরভিসন্ধি যুদ্ধিষ্ঠিরকে আগেই ম্লেচ্ছ ভাষায় জ্ঞাত করেছিলেন। দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণের বনগমণ কালে কুন্তি তাঁরই আশ্রয়ে থাকেন। বিদুর পরম ধার্মিক ছিলেন। ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দেয়া ব্যতীত তার অপর কোন বিশেষ কাজ ছিলো না। ভারতযুদ্ধের আগে কৃষ্ণ হস্তিনায় গমন করে দুর্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করে বিদুরের সামান্য খাবার গ্রহণ করেছিলেন।

বিদুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে ধৃতরাষ্ট্রের সাথে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের আশ্রয়ে ১৫ বছর বাস করেন। পরে বনে গিয়ে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেছিলেন।

বিদ্যাদেবি

বিদ্যাদেবি বলতে আমরা সরস্বতি দেবিকেই বুঝি এবং সাধারণ ভাবে তিনি আমাদের নিকট বীণাপাণি, বাগ্‌দেবি, শ্রদ্রা, হংসবাহনা প্রভৃতি নামে সবিশেষ পরিচিতা। এ সুপরিচিতা দেবি সরস্বতি জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিশ্বরি। এ দেবি নানাভাবে নানাস্থানে বহু রূপ, বহু বাহন ও বহু লীলা। দেবি কখনো দ্বিভুজা, কখনো চারহাত বিশিষ্ট, আবার প্রয়োজনবোধে কখনো বা ষোড়শভুজা। বিভিন্ন ধর্মাশাস্ত্রানুসারে এ দেবিকে সাধারণত নিম্নবর্ণিত ষোড়শ বিদ্যাদেবিরূপে দেখা যায়। বিদ্যাদেবিগণের সকলেরই মস্তকের উপর মন্দিরের মতো উঁচু মুকুট। সকলেই ললিত মুদ্রাসনে আসীন, একটি পা নিচু করে রাখা, আর একটি পা সম্মুখদিকে গুটানো। সকলেরই দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি বরমুদ্রায় স্থাপিত, বামহস্ত মোড়া এবং উঁচুতে তোলা।

(১) রোহিণি– সরস্বতির ষোড়শ নামের প্রথম নাম রোহিণি। তাঁর বাহন জলচৌকি। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ ও বাম হাতে চক্র। দেবির অপর নাম 'অজিতবলা'।

(২) প্রজ্ঞপ্তি– সরস্বতির দ্বিতীয় নাম প্রজ্ঞপ্তি। তাঁর বাহন হংস। দেবি ষষ্ঠভুজা। হাতে অসি, কুঠার, চন্দ্রহাস ও দর্পণ। দেবির অপর নাম 'দুরিতারি'।

(৩) বজ্রশৃঙ্খলা। এ চারহাত বিশিষ্ট দেবির বাহন হংস। হাতে পরিখ ও বৈষ্ণবাস্ত্র।

(৪) কুলিশাঙ্কুশা– সরস্বতির চতুর্থ নাম কুলিশাঙ্কুশা। তাঁর বাহন ঘোড়া। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ ও বাম হাতে ভূষণ্ডি। দেবির অন্যান্য নাম যথাক্রমে 'মনোবেগা', 'মনোগুপ্তি' ও 'শ্যামা'।

(৫) চক্রেশ্বরি– সরস্বতির পঞ্চম নাম চক্রেশ্বরি। তাঁর বাহন গরুড়। দেবি ষোড়শভুজা। উপর দক্ষিণ ও বাম হাতে শতঘ্নি এবং দশ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। দু হাত কোলে স্থির ও দু হাতে বরদান।

(৬) পুরুষদত্তা ভারতি– সরস্বতির ষষ্ঠ নাম পুরুষদত্তা ভারতি। তাঁর বাহন হস্তি। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দেবির দক্ষিণ হাতে চক্র ও বামহাতে শতঘ্নি। দেবির মুখমণ্ডল চৌকো পুরুষাকৃতি। দেহগঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কোমর সিংহের মতো সরু।

(৭) কালি-সরস্বতির সপ্তম নাম কালি। এ কালি দশমহাবিদ্যার কালি নন। তাঁর বাহন বৃষ। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ হাতে ত্রিশূল ও বাম হাতে শতঘ্নি। দেবির অপর নাম 'শান্তা'।

(৮) মহাকালি– সরস্বতির অষ্টম নাম মহাকালি। তিনিও দশমহাবিদ্যার মহাকালি নন। এ চারহাত বিশিষ্ট দেবির কোন বাহন নেই। তাঁর দক্ষিণ হাতে যষ্টি ও বাম হাতে শতঘ্নি। দেবির অপর নাম 'অজিতা' ও 'সুরতারকা'।

(৯) গৌরী– সরস্বতির নবম নাম গৌরী। তাঁর বাহন বৃষ। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ হাতে মঙ্গলগট ও বাম হাতে যষ্টি। দেবির মস্তকের মন্দিরাকৃতি মুকুটের বাম পার্শ্বে চন্দ্র। দেবির অপর নাম 'মানসী' ও 'অশোকা'।

(১০) গান্ধারি– সরস্বতির দশম নাম গান্ধারি। এ চারহাত বিশিষ্ট দেবির বাহন নেই। দক্ষিণ হাতে পরিখ ও বাম হাতে শির। দেবির অপর নাম 'চণ্ডা'।

(১১) সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা– সরস্বতির একদশ নাম সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা। তাঁর বাহন বৃষ। দেবি আটভুজা। দক্ষিণ হাতে অসি, ত্রিশূল, ভল্ল ও বৈষ্ণবাস্ত্র এবং বাম হাতে ব্রহ্মশির অস্ত্র, তীর ও পাশ। মস্তকে মন্দিরাকৃতি বিরাট মুকুট। মুকুটের চতুর্দিকে অরণ্য। দেবির অপর নাম 'জ্বালামালিনী' ও 'ভৃকুটি'।

(১২) মানবি– সরস্বতির বারো নাম মানবি। তাঁর বাহন সর্প। চারহাত বিশিষ্ট দেবির দু হাতে দর্পণ ও এক হাতে যষ্টি, অপর হস্ত বরমুদ্রায় স্থাপিত। দেবির অপর নাম 'অশোকা'।

(১৩) বৈরাট্যা– সরস্বতির ত্রয়োদশ নাম বৈরাট্যা। তাঁর বাহন সর্প। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দু হাতে বৈষ্ণবাস্ত্র ও সঙ্গে ভল্ল। দেবির অপর নাম 'বৈরোটি'।

(১৪) অচ্ছুপ্তা– সরস্বতির চতুর্দশ নাম অচ্ছুপ্তা। তাঁর বাহন হংস। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ হাতে ভল্ল ও বাম হাতে বিজয় ধনু। দেবির অপর নাম 'অনন্তবতি' ও 'অস্কশা'।

(১৫) মানসী– সরস্বতীর পঞ্চদশ নাম মানসী। তাঁর বাহন সিংহ। দেবি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ হাতে ভল্ল ও কুঠার এবং বাম হাতে দর্পণ ও বিজয়ধনু। দেবির অপর নাম 'কন্দর্পা'।

(১৬) মহামানবি– সরস্বতির ষোড়শ নাম মহামানবি। তাঁর বাহন ময়ূর। চারহাত বিশিষ্ট দেবির দক্ষিণ হাতে ভল্ল ও বাম হাতে চক্র। দেবির অপর নাম 'নির্বাণী'।

বিনতা

গরুড়ের মা। বিনতা ও কদ্রু উভয়ে দক্ষের মেয়ে এবং কশ্যপের স্ত্রী। কশ্যপের কৃপায় বিনতা দু টি ডিম প্রসব করেন এবং কদ্রু সহস্র ডিম প্রসব করেন। সহস্র ডিম হতে সর্পগণের জন্ম হয়। বিনতা প্রসূত ডিম দু টি হতে ফুটতে বিলম্ব হওয়ায় বিনতা এর একটি ভাংগেন। ঐ ভগ্নডিম হতে অরুণের উৎপত্তি হয়। অসময়ে ডিম ভেদ করায় অরুণের সর্বাবয়ব সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর উরুদ্বয় অসম্পূর্ণ ছিল, এজন্য তাঁকে অনুরু বলে। অরুণ সূর্যের সারথি কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিনতার অবশিষ্ট ডিমটি যথা সময়ে ফুটলে তা হতে মহাবীর গরুড়ের জন্ম হয়।

বিরূপাক্ষ

রাজা রাবণের অন্যতম অনুচর ও সেনাপতি। হনুমান লঙ্কার অনেক বন নষ্ট করলে রাবণ তাঁকে পরাজিত করার জন্য জেনারেল বিরূপাক্ষকে প্রেরণ করেন। হনুমানের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিশাখ

ইন্দ্র ও স্কন্দের মধ্যে এবার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উক্ত সময় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব হতে এক সুন্দর যুবার আবির্ভাব হয়। বজ্রের আঘাতে এর জন্ম হয়েছিল বলে এর নাম হয় বিশাখ। (মহাভারত– বন)

বিশল্যকরণি

ভেষজ উদ্ভিদ। গন্ধমাদন পর্বতের দক্ষিণ শিখরে এর জন্ম। এ নামের অর্থ শল্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করার অস্ত্র শস্ত্র। লোহা, পাষাণাদি উদ্ধার করতে এর অদ্ভুত শক্তি। শক্তিশেলে বিদ্ধ হলে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে বাঁচানোর জন্য রাম হনুমানকে এ

পর্বতে বিশল্যকরণি আনার জন্য পাঠিয়ে দেন। সে ঔষধ প্রয়োগের ফলে লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা হয়।

বিরাটরাজ

মৎস্য দেশের অধিপতি। তাঁর শ্যালক কীচকের বাহুবলে তিনি ত্রিগর্তের রাজ্য অধিকার করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম সুদেষ্ণা, পুত্রের নাম উত্তর, মেয়ে উত্তরা। পাণ্ডবগণ তাঁর আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাসের এক বছর অতিবাহিত করেন।

বিশাখদত্ত

তিনি মহারাজ পৃথুর ছেলে। সংস্কৃত ভাষায় "মুদ্রারাক্ষস" নামক প্রসিদ্ধ নাটক তার রচিত। স্মর্তব্য বিশাখা দত্তের বাবার নামে এ বসুধার নাম হয়েছে পৃথিবী।

বিশ্বকর্মা

দেবগণের খ্যাতিমান শিল্পি। তিনি প্রভাস নামক বায়ুর ঔরসে তাঁর স্ত্রী যোগসিদ্ধার গর্ভজাত। তাঁর মেয়ে সংজ্ঞার সাথে সূর্যের বিয়ে হয়।

বিশ্বামিত্র

ব্রাহ্মর্ষি। তিনি গাধিরাজের ছেলে। বিশ্বামিত্র একদিন বহু সেনা নিয়ে বশিষ্ঠের তপোবনে উপস্থিত হলে ঋষি শবলা নামে নিজের হোমধেনুর প্রভাবে তাঁর সমুচিত আতিথ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তা দেখে তিনি বিস্ময়াপন্ন হয়ে অলৌকিক প্রভাবশালিনী ঐ ধেনুটি নিতে উদ্যত হলে শবলা ঋষির আদেশে বহুসংখ্যক সেনা সৃষ্টি করেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে বিশ্বামিত্র পরাজিত হলে তাঁর ছেলেগণ বশিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হয়ে ঋষির কোপানলে ভস্মিভূত হয়। এভাবে বিশ্বামিত্র সেনা ও ছেলে হারিয়ে দুঃখিত মনে রাজ্যে ফিরে এসে অপর এক পুত্রের ওপর রাজ্যভার সমর্পন করে মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করেন। পরে মহাদেবের প্রসাদে সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য হয়ে পুনরায় বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র বিফল করে দেন। তখন বিশ্বামিত্র ক্ষতেজ অপেক্ষা ব্রহ্মতেজের শ্রেষ্ঠত্ব মনে করে ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য অতি কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র একদিন মেনকা অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। বিশ্বামিত্র মেনকার রূপলাবণ্যে মোহিত হলে তাঁর ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। এরূপ পুন পুন দুশ্চর বিঘ্ন অতিক্রম করে তপশ্চরণ দ্বারা তিনি ব্রহ্মার বরে প্রথমে রাজর্ষিত্ব, পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বিশ্বামিত্র তপোবলে অনেক

অদ্ভুত কীর্তি করে গেছেন। সূর্যবংশিয় রাজা ত্রিশঙ্কু সশরিরে স্বর্গে যেতে ইচ্ছুক হয়ে ঋষির শরণাপন্ন হলে ঋষি তাঁকে নিজ তপ প্রভাবে তাঁকে সশরিরে স্বর্গে পাঠান। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁর প্রতিকূলতাচরণ করলে তিনি নতুন নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করে সেখানে তাঁকে স্থাপন করেন।

অযোধ্যাধিপতি অম্বরিষ যজ্ঞ করতে চাইলে ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞিয় ঘোড়া অপহরণ করেন। রাজা যজ্ঞ বিঘ্ন শান্তির জন্য নরবলি দিতে উদ্যত হয়ে দরিদ্র ঋচীক মুণির মধ্যম ছেলে শুনঃশেফকে আনয়ন করেন। আসার সময় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের শরণাগত হলে তিনি তাঁকে অগ্নির স্তোত্র শিক্ষা দেন। সে স্তোত্র প্রভাবে অগ্নিদাহ হতে শুনঃশেফের জীবন রক্ষা হয়।

এভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষা এবং দাশরথি রামচন্দ্রকে আনয়ন করে তাড়কাবধ প্রভৃতি বিবিধ কার্য ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের অতুলকীর্তি ঘোষণা করছে। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রি মন্ত্র তাঁরই রচিত।

বিধিবাম

লঙ্কার অধিপতি বীর রাবণ বীরছেলে বীরবাহুর মৃত্যুকে বিধাতার অমোঘ নির্দেশ বলে বিবেচনা করে নিজের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ রামকে ধ্বংস করার জন্য নিজে যুদ্ধে যাবেন বলে রাবণের কাছে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাবণ যেসব অশুভ লক্ষণ দেখছেন তাতে তাঁর বীরছেলে মেঘনাদকে যুদ্ধে পাঠাতে হৃদয়ের সম্মতি পাচ্ছেন না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে শ্রেষ্ঠ বীর মেঘনাদের পক্ষে শত্রুপক্ষ ধ্বংস করা তেমন কঠিন ছিলো না। কিন্তু পুত্রের যুদ্ধে যাবার আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজা রাবণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখলেন যে চারদিকে অমঙ্গল আর প্রকৃতি বিরুদ্ধ নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে। শিলা জলে ভেসে রামের লঙ্কা আক্রমণের জন্য সেতু তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। আবার রামপক্ষের মৃত সৈনিকেরা দেবানুগ্রহে পুনর্জীবিত হবার পেছনে বিধাতার নির্দেশ রয়েছে। তা থেকে ধারণা হয়েছে যে তাঁর প্রতি বিধাতা বিরূপ। আর এ বিরূপতা যদি বিরাজমান থাকে তাহলে রাজা রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। এ প্রেক্ষিতে মেঘনাদকে যুদ্ধ যাত্রায় অনুমতি প্রদানে বিপর্যয়ের সম্মুখিন হতে হবে বলে রাবণ ধারণা করেন।

বিক্রমাদিত্য

উজ্জয়িনীর অধিপতি। তাঁর সময় হতে আমাদের দেশে একটি অব্দগণনা প্রচলিত আছে। তাঁর নাম সংবৎ। খ্রিস্ট জন্মের আগে বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হয়ে মালবদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নগরিতে রাজত্ব করেছেন। মহাকবি কালিদাস,

অমরসিংহ শঙ্কু, বেতালভট্ট ঘটর্কপর, বররুচি, বরাহমিহির ধন্বন্তরি, ক্ষপনক প্রভৃতি ন জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তার সভাসদ ছিলেন। এজন্য, বিক্রমাদিত্যের সভাকে নবরত্নের সভা বলতো। জটাধর নামক জনৈক অভিধান প্রণেতা প্রাচিন পণ্ডিতের অভিধান গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের "শকারি" "সাহসাঙ্ক" এ দুনামান্তর দেখা যায়। দক্ষিণাপথের নাসিক হতে খ্রিস্টের প্রথম শতাব্দিতে উৎকির্ণ একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। সে শিলালিপিতে "শকারি" নাম দেখতে পাওয়া যায়। এ দ্বারা বিক্রমাদিত্য খ্রিস্ট জন্মের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন এ অনুমান মিথ্যা নয়। ভোজয় কালিদাস প্রণীত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর অধিপতি ভর্তৃহরির কনিষ্ঠ। ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

বিক্রমাদিত্যের বড় ভাই শঙ্কু বাবার মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তৎকালে বিক্রমাদিত্য নানা দেশের রীতি-নীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী পর্যবেক্ষণের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। শঙ্কু বিক্রমাদিত্যকে বিনাশ করার জন্য চেষ্টা করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁকে বিনাশ করে রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

বিশ্রবা

মুণি। তিনি ব্রহ্মার ছেলে পুলস্ত্যের ঔরসজাত। তাঁর স্ত্রী ইলবিলার গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। বিশ্রবা লঙ্কা রাজ রাবণের বাবা।

বিভীষণ

রাবণের ছোট ভাই। রাক্ষস মেয়ে কৈকসির গর্ভে মুনিবর বিশ্বশ্রবার ঔরসে তাঁর জন্ম। তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রদানে উপস্থিত হলে তিনি "সকল অবস্থায় যেনো ধর্মে মতি থাকে" সে বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তাতে পরিতুষ্ট হয়ে এ বরের সাথে তাঁকে অমরত্ব প্রদান করেন।

রাবণ লঙ্কার অধিপতি হলে বিভীষণ সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি গন্ধর্বরাজ শৈলুষের মেয়ে সরমাকে বিয়ে করেন। বিভীষণ রাক্ষস বৃত্তির অনুসরণ না করে সর্বদা ধর্মকর্মে রত থাকতেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হলে বিভীষণ রাবণকে রামের সাথে মিত্রতা করতে এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে উপদেশ দেন। রাবণ তাতে অসম্মত হয়ে তাঁর অপমান করলে তিনি রামের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাম-রাবণের ভিষণ সংগ্রামে বিভীষণের সাহায্যে রাবণ নিহত হলে রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

বিষ্ণুশর্মা

বিষ্ণুশর্মা একজন অতি প্রাচিন গ্রন্থকার। কেউ কেউ মনে করেন চাণক্য ও বিষ্ণুশর্মা একই ব্যক্তি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। এ গ্রন্থকার অনুমান দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে জীবিত ছিলেন। তার প্রণীত 'পঞ্চতন্ত্র' খ্রিস্টের ৫ম শতাব্দীতে আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। কেউ বলেন তিনি মগধ প্রদেশের অধিবাসি ছিলেন। বস্তুত তিনি পঞ্চতন্ত্রের গল্পের মধ্যে যে সকল দেশ নদ-নদী পর্বত অরণ্যের নাম নির্দেশ করেছেন এর অধিকাংশই মগধের অন্তর্গত ও সন্নিহিত, সুতরাং তিনি মগধের অধিবাসি ছিলেন একথা অসঙ্গত নয়। বিষ্ণুশর্মা একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সে জন্যই পাটালিছেলে নগরের তদানীন্তন নরপতি সুদর্শন স্বীয় ছেলেগণের নীতিশিক্ষার জন্য তাকে নিযুক্ত করেন। তিনি পঞ্চতন্ত্রে গল্পচ্ছলে যে রাজনীতির আলোচনা করেছেন তা প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরও শিক্ষার বিষয়। হিতোপদেশ গ্রন্থও বিষ্ণুশর্মার রচিত।

বিষ্ণু

নারায়ণ, কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তির একতম এবং সৃষ্টির পালক। লোকরক্ষার জনব্য তিনি নানা অবতারে আবির্ভূত হয়ে মধুকৈটভ, হিরণ্যাদি লোকশত্রুকে বিনাশ করেছেন। তিনি ক্ষীরোদশায়ি। তাঁর শয্যা অনন্ত, স্ত্রী, লক্ষ্মী, ছেলে কামদেব, ধাম বৈকুণ্ঠ, বাহন গরুড়। তাঁর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, চক্র সুদর্শন, গদা কৌমদকি, ধনু শার্ঙ্গ, অসি নন্দক ও মণি কৌস্তভ। তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাদি দেবতারা বিপদের সময় তাঁর শরণাপন্ন হন।

প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দু স্ত্রী– লক্ষ্মী ও সরস্বতি। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহায্য করার জন্য ও দানবদলনের জন্য তিনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে তাঁর দশ অবতারের কথা লিখিত আছে; যথা– মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। তিন যুগে তিনি বহু দৈত্য-দানবকে বধ করেছেন; যেমন– মধু, ধেনুক, পুতনা, যমলার্জুন, কালনেমি, হয়গ্রিব, শটক, অরিষ্ট, কৈটভ, কংশ, কেশি, শাল্ব, বাণ, কালিয়, নরক, বলি, শিশুপাল প্রভৃতি। তাঁর চার হস্ত– এক হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, দ্বিতীয় হাতে সুদর্শন চক্র, তৃতীয় হাতে কৌমোদকি গদা এবং চতুর্থ হাতে পদ্ম। তাঁর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ ও অসির নাম নন্দক। তাঁর বক্ষে কৌস্তভ মণি বিলম্বিত এবং শ্রীবৎস নামে এক অদ্ভুত চিহ্ন

অঙ্কিত। তাঁর মণিবন্ধে স্যমন্তক মণি বর্তমান। বিষ্ণু ঋক্‌বেদের অনেক সূক্তে স্তুত হয়েছেন। কোন কোন স্থানে তিনি আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছেন, কোথাও বা তিনি সূর্যরশ্মির সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে বণিত হয়েছেন। তিনি সাতকিরণের সঙ্গে ভূ-পরিক্রম করেন। তিনি রক্ষক, ধর্ম ধারণ করেন। তিনি ইন্দ্রের সখা। তিনি ত্রিপদে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আর্যদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। তিনি সদগুণের আধার। সৃষ্ট জগতের পালনভার তাঁর উপর অর্পিত। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, বিশ্বব্যাপি ও প্রভু। প্রলয় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারি হয়ে তিনি শেষনাগের উপর শায়িত আছেন। তাঁর নাভি-উদ্ভূত পদ্ম হতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। জগৎ সৃষ্টিকালে মধু ও কৈটভ নামক দু দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ হতে তিনি মেদিনি সৃষ্টি করেন। মহাভারত ও পুরাণে বিষ্ণু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রজাপতি হিসাবে তাঁর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে সক্রিয় সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মা, যিনি নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে উত্থিত হয়েছেন; দ্বিতীয় বিষ্ণু, স্বয়ং রক্ষক হিসাবে অবতার, যথা– শ্রীকৃষ্ণ; তৃতীয় শিব বা রুদ্র, বিষ্ণুর কপাল-উদ্ভূত ধ্বংসের দেবতা।

বীরবাহু

লঙ্কার যুদ্ধে বীরছেলে বীরবাহুর অকাল মৃত্যু রাবণকে বেদনাহত করে তুলে। কোন সান্ত্বনা বাক্যই তাঁর মনকে প্রবোধ দিতে। মায়াময় বিশ্বে সুখ-দুঃখের অর্থহীনতা সম্পর্কে সচিব সারণ রাবণকে স্মরণ করিয়ে দেন। বজ্রাঘাতে পর্বত চূর্ণ হয়ে গেলেও পৃথিবীর ক্ষতি নেই– পরম শক্তিধর রাবণের কাছে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে সারণ আশা করেছিলেন। কিন্তু হৃদয় বলে যে একটি বিশেষ আবেগপ্রবণ বস্তু রয়েছে তা রাজা রাবণও উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই মন্ত্রি সারণের যুক্তির প্রেক্ষিতে রাবণ হৃদয় কুসুমের অকাল ছিন্নতার যুক্তিহীন বেদনার কথা বলেন। পদ্মফুল ছিঁড়ে নিলে তার মৃণাল জলে ডোবে। তেমনি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ফুল সন্তানকে যদি মৃত্যু অপহরণ করে নেয় তবে পিতৃহৃদয় বিকল হয়ে গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়। এ বেদনার কোন সান্ত্বনা নেই। পিতৃহৃদয়ের স্নেহপুষ্প হিসেবে সন্তানের যে মর্যাদা তা অনুভব করা বাবা রাবণের জন্য মোটেই কঠিন নয়। বীরত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে রাবণ যে কঠোরতম মানসিকতার অধিকারি, তা দুর্বল হয়ে পড়ে পিতৃহৃদয়ের আবেগ প্রবণতার মধ্যে। বীরত্বের চেয়ে পিতৃহৃদয়ের স্নেহের দাবি অনেক বেশি বলে সেখানে নিহত পুত্রের গভীর বেদনা অনুভব হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কোন যুক্তি রাবণের কাছে প্রাধান্য পায় নি। বরং প্রিয় বীরপুত্রের চির বিচ্ছেদ তাঁকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করে।

বীরভদ্র

মহাদেবের প্রিয় অনুচর। দক্ষমেয়ে সতী দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে শ্রবণে প্রাণ ত্যাগ করলে মহাদেব রাগে উত্তেজিত হয়ে নিজের যুথ থেকে প্রবল পরাক্রান্ত বীরভদ্রের জন্ম দেন। তাঁর মুখ অতি ভয়ঙ্কর, শরির অগ্নিগশিখায় ব্যাপ্ত। বহু হাতে বহু আয়ুর্ব। সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ, সহস্র মুদগরধারি, বাঘের চামড়া পড়া, ভিষণাকার অত্যুজ্জ্বলরূপ। তাঁর প্রকাণ্ড পেট। বিকট মুখ ও দির্ঘ দাঁত। তাঁর হাতে শূল, টঙ্কা ও গদা থাকতো। তাঁর মাথা অর্ধচন্দ্র শোভিত ও তাঁর চারদিকে অগ্নিশিখার মতো তেজপুঞ্জ নির্গত হতো। বীরভদ্র সানুচর দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হন। সে সঙ্গে দেবির ক্রোধসম্ভুত মহাকালিও বীরভদ্রের অনুগামিনী হলেন।

বুদ্ধ

তিনি পুরাণ শাস্ত্রমতে ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার। খ্রিস্ট জন্মের ৫৪০ বছর আগে বুদ্ধদেব কপিল বস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে তাঁর স্ত্রী মায়াদেবির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নামকরণ কালে তাঁর নাম 'সিদ্ধার্থ' রাখা হয়। যথাসময়ে সিদ্ধার্থের বিদ্যারম্ভ হলে তিনি ক্রমশ শিক্ষার উৎকর্ষ লাভ করতে লাগলেন এবং বাল্যাবধি অতিশয় শান্তস্বভাব ও চিন্তাশিল ছিলেন, নির্জনে বসে ঈশ্বর চিন্তা করতে তাঁর ভাল লাগতো। ক্রমে সিদ্ধার্থ যৌবন প্রাপ্ত হলেন, কিন্তু সাংসারিক কাজ বা বিষয় ভোগে তাঁর কিছু মাত্র আসক্তি ছিলো না।

তাঁর ভাব দেখে শুদ্ধোদন তাঁকে সংসারি হওয়ার জন্য তাঁর বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। পরে ১৯ বছর বয়সে দণ্ডপাণি শাক্যের মেয়ে গোপার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। উভয়ের রূপগুণে উভয়ে মোহিত হন। গোপার পতিসেবায় পরম প্রীত হয়ে সিদ্ধার্থ পূর্বভাব ভুলে নির্মল সুখভোগে জীবন যাপন করলে লাগলেন। কালক্রমে তাঁর মনে পূর্ববৎ চিন্তার উদয় হলো। তিনি নগর হতে বের হবার কালে বৃদ্ধ, শোকার্ত মৃত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে দেখলেই সংসারের অনিত্যতা মনে করতেন। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ অনিত্য সংসারে নিশ্চয়ই কোন নিত্য পদার্থ আছে। সে নিত্য পদার্থ প্রাপ্ত হলে মানব শান্তি লাভ করতে পারে। স্বয়ং মুক্ত হলে অপরকেও মুক্ত পথের পথিক করা যায়। এরূপ চিন্তায় তাঁর মন সবসময় আন্দোলিত হতে লাগলো। পতি পরায়ণা গোপা স্বামিকে অতীব চিন্তাকুল দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সিদ্ধার্থ একদিন রাতে গোপার নিকট সমস্ত মনোভাব প্রকাশ করে বললেন- "প্রিয়তম, আমার আর কিছুতেই সুখ নেই, তুমি আমার জীবনের মহৎ কাজে সহায়তা করে আনন্দ লাভ করো।" এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। গোপা তখন স্বামির অভীষ্ট কাজে যাতে বিঘ্ন না

হয় তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হয়ে নিজ সুখ বিসর্জন দিলেন। এ সময়ে সিদ্ধার্থের একটি ছেলে জন্মে। একদিন সিদ্ধার্থ বাবার নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করলে শুদ্ধোদন ছেলেকে রাজ্যভোগ করার জন্য নানা প্রকারে বুঝালেন। বাবার বাক্যাবসানে শাক্যসিংহ তাঁকে এ বলে উত্তর দিলেন যে, যদি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আক্রমণ না করে এবং পূর্ণ যৌবন চিরদিন থাকে তা হলে তিনি সংসারে থাকতে পারেন। রাজা এ সকল শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললেন– "চারটি বিষয় প্রার্থনা করলে তা আমার প্রদান করার ক্ষমতা নেই।" রাজকুমার তখন বাবার নিকট হতে বিদায় প্রার্থনা করলেন। রাজা শোকপূর্ণ হৃদয়ে ছেলেকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করে অগত্যা বিদায় দিলেন।

সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে নানাস্থান পর্যটন করে অনেক পণ্ডিত ও ঋষিগণের নিকট ধর্মতত্ত্ব অবগত হন। পরে কঠোর তপস্যায় রত হয়ে তাঁর 'সিদ্ধার্থ' নাম সার্থক করেন। তিনি আত্মার স্বরূপ অবগত হয়ে সুখ-দুঃখের নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ হলেন। বুদ্ধ নিজে মুক্ত হয়ে অপরকে মুক্ত পথের পথিক করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করার ইচ্ছায় তিনি বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক নবধর্ম প্রচার করেন। সদ্বৃত্তি দ্বারা আত্মার, উৎকর্ষ সাধন করাই এ ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতে জাতিভেদ নেই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই নবধর্মে দীক্ষিত হয়ে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করে সকলের ভক্তিভাজন হতে পারেন।

সেকালে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। এ অবস্থায় বুদ্ধ একবার কপিল বস্তুতে গিয়ে বাবাকে দেখা দেন। শুদ্ধোদন বহুকাল পর ছেলেমুখ দর্শনে সুখি হলেন। এ সময় বুদ্ধদেবের বৈমাত্র ভাই নন্দ এবং ছেলে রাহুল নবধর্মে দীক্ষিত হন। পরে বুদ্ধ আবার ধর্ম প্রচারে বের হয়ে ১৩ বছর পরে বাবার মৃত্যুকালে আবার কপিল বস্তু নগরে উপস্থিত হন। বাবার মৃত্যুর পর পুরস্ত্রীগণ তাঁর নিকট এসে ভিক্ষু হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে বুদ্ধ স্ত্রীভিক্ষুর দল গঠন করে গোপাকে তাঁর নেতৃত্বে নিয়োজিত করেন। এভাবে বুদ্ধ একান্ন বছর ধর্মপ্রচার করে ৮০ বছর বয়সে কুশিনগরে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ভক্ত ও শিষ্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে বুদ্ধ ক্ষীণস্বরে সকলকে বললেন– "আমার মৃত্যুর পর ধর্ম ও নিয়ম যেনো তোমাদের নেতা হয়"। পরে ক্ষণকাল চুপ থেকে বললেন– "ভিক্ষুগণ? এ আমার শেষ কথা যে মানবদেহ ও শক্তি উভয়ই ক্ষণভঙ্গুর, এ বাক্য মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করে পরিত্রাণের জন্য সচেষ্ট হবে।"

বৃন্দা

(১) অসুররাজ জলন্ধরের স্ত্রী ও কালনেমির মেয়ে। তিনি অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। ব্রহ্মার বরে জলন্ধর দেবগণের অজেয় হয়। ফলে, জলন্ধর দেবতাদের পরাস্ত করে দেবরাজ্য অধিকার করলে দেবতার মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন শিব দেবতাদের হিতের জন্য নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। জলন্ধরের বর ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী বৃন্দা নিষ্কলঙ্কচরিত্রা থাকবেন, ততদিন জলন্ধরও অপরাজেয় থাকবে। বৃন্দা এদিকে স্বামির মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন। ফলে, শিব জলন্ধরকে বিনাশ করতে অসমর্থ হন। তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে, বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। তখন জলন্ধর বিনষ্ট হয়। এ জন্য বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হলে, বিষ্ণু তাঁকে নিবৃত্ত করে পতির অনুগমন করতে বলেন। কারণ তাঁর চিতাভস্মে তুলসি, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র তরু উৎপন্ন হয়ে মানবের পূজনীয় হবে। বৃন্দা তুলসিরূপে বিষ্ণু প্রিয়া। দ্বাপরে তিনি রাধার সখি ছিলেন। কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন বৃন্দারই বন।

(২) বৃন্দা শ্রীরাধার সখি ও দূতি।

বৃন্দাবন

মথুরার তিন ক্রোশ দূরে যমুনার বাম তটে অবস্থিত নগর ও বন। স্বনামখ্যাত তীর্থ। কৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে দানবদের নিহত করেন। তারপর নন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি বলে বৃন্দাবন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।

বৃহন্নলা

বৃহন্নলার বেশধারি ক্লীবরূপি অর্জুন। অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থে স্বর্গবাস কালে যৌনাকাঙ্ক্ষি উর্বশিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উর্বশির অভিশাপে শিশ্নের ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন। অজ্ঞাত বাসের বৎসর অর্জুন ক্লীবরূপে এ নাম গ্রহণ করেন। বিরাট নগরে রাজকন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারির নৃত্যগীতাদির তিনি শিক্ষক হন। দুর্যোধনের বিরাট রাজ্যে গোঅপহরণকালে বৃহন্নলা উত্তরের সারথিরূপে যুদ্ধে যান।

বৃহস্পতি

তিনি সাত মুখ, সাত রশ্মি, মিষ্ট জিহ্বা, নীল পৃষ্ঠ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শতপত্রবিশিষ্ট। তিনি হিরণ্য ও লোহিতরঙ। লোহিতরঙ ঘোড়াগণ বৃহস্পতিকে রথে বহন করে।

বৃহস্পতি যজ্ঞপ্রাপক, রাক্ষস-নাশক, মেঘ-ভেদক ও স্বর্ণপ্রদায়ক। তিনি দেবগণের বাবা, অগ্নির ন্যায় ত্রিলোকবাসি। তিনি বন্ধনকারির বন্ধু। বৃহস্পতি অভিষ্টবর্ষী; তিনি দেবকামিদের ফল প্রদান করেন, সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন। তিনি প্রাণিদের চৈতন্য উৎপাদন করেন। তিনি যোদ্ধা, যুদ্ধে সাহায্যকর্তা ও জয়দাতা। তাঁর ধনুর জ্যা ঋত (সত্য)। তাঁর পরশু শাণিত করে দেন ত্বষ্টা। তিনি ঋতরথে আরোহন করে রাক্ষস ও শত্রুকে বিনাশ করেন এবং আলোক জয় করে অরুণাশ্ব দ্বারা বাহিত হন। বৃহস্পতি পুরোহিত। তাঁর উচ্চারিত শ্লোক স্বর্গে গমন করে। তিনি ছন্দের অধিকারি ও ইন্দ্রের ন্যায় সোমপায়ি। সোম-যাজ্ঞিকদের তিনি সহায় ও বন্ধু। ঋগবেদে বৃহস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদের কোন কোন মন্ত্রে তিনি একাকি এবং কোনটিতে ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারূপে স্তুত হয়েছেন। বেদের কোন কোন মন্ত্রে তিনি যজ্ঞ রক্ষাকর্তা, সর্বময় বাবা ও সর্বদেবতাস্বরূপ বিশেষণে বন্দিত হয়েছেন। তিনি দেবতাদের পুরোহিত। মন্ত্রের অধিপতি দেবরূপে তিনি খ্যাত। তাঁর হস্ত হতে দেবতারা যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। তিনি জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা। তাঁর আদেশেই চন্দ্র ও সূর্য বিকশিত। বেদের এ দেবতা পরবর্তী যুগে গ্রহাধিকারিরূপে দেখা দেন। তিনি বৃহস্পতি গ্রহের নেতা। কখনও স্বয়ং গ্রহরূপে কীর্তিত হয়েছেন। তাঁর নীতিঘোষ নামে রথ আছে। এ রথ আটটি ঘোড়াদ্বারা চালিত।

পৌরাণিক যুগে বৃহস্পতি ঋষিরূপে খ্যাত হন। বৃহস্পতি মহর্ষি অঙ্গিরার ছেলে। তিনি ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক এবং নবগ্রহের মধ্যে পঞ্চমগ্রহ। তাঁর জন্ম-বিবরণ এরূপ– অঙ্গিরা নিজের আশ্রমে কঠোর তপস্যা করে অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বি হয়ে উঠেছিলেন। এ সময় অগ্নি জলের মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যায় রত হন। অঙ্গিরার প্রভাবে তাঁর এ হীন অবস্থা হওয়ার জন্য অগ্নি অনুতপ্ত হন, কিন্তু নিজের এ দুর্গতির কোন কারণ খুঁজে পান না। তাঁর মনে হয় তপস্যার ফলে তাঁর তেজ নষ্ট হয়েছে; বোধ হয় ব্রহ্মা অন্য একটি অগ্নির সৃষ্টি করেছেন। এরূপ চিন্তা করার সময় অগ্নিতুল্য ঋষি অঙ্গিরা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আপনার তেজ আপনি শিঘ্রই প্রকাশ করে জগতের মঙ্গল করুন। অন্ধকার দূর করার জন্যে বিধাতা আপনাকেই সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্ধকার দূর করতে আপনিই একমাত্র অধিকারি।" অগ্নি বললেন, "আমার কীর্তি বিনষ্টপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি অগ্নিত্ব ত্যাগ করেছি। আপনি প্রথম অগ্নি হন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হব।" অঙ্গিরা বললেন, "আপনার এ অগ্নিত্বের অধিকার আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আবার অগ্নিতেজ গ্রহণ করে আমাকে এক ছেলে-সন্তান দান করুন।" সন্তুষ্ট হয়ে অগ্নি নিজের পূর্বতেজ আবার গ্রহণ করলেন। এর ফলে অঙ্গির

বৃহস্পতি নামে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরুপদে বৃত হন। চন্দ্র বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করলে তিনি দেবগণের শরণাপন্ন হন। চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণে বিমুখ হলে দেবগণ তাঁকে আক্রমণে করেন। রুদ্র ও সমস্ত দৈত্যদানব চন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেন। ফলে, দেব-দানবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হওয়ায় বৃহস্পতি ব্রহ্মার কাছে নিজের দুরবস্থা জ্ঞাপন করলেন। তখন ব্রহ্মা চন্দ্রের কাছ হতে তারাকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিকে সমর্পণ করলেন। এ সময়ে তারা গর্ভবতি ছিলেন। বৃহস্পতি ও চন্দ্র দুজনেই গর্ভজাত ছেলেকে আপন ছেলে বলে দাবি করলেন। তখন ব্রহ্মা আবার মধ্যস্থ হয়ে তারাকে পুত্রের প্রকৃত বাবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা স্বীকার করলেন যে, চন্দ্রই এ পুত্রের বাবা। এ পুত্রের নাম বুধ।

বিশ্বরাজ্য লাভের আশায় দেবতা ও অসুরে দির্ঘকাল যুদ্ধ চলছিলো। সে সময় দেবতারা বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরোহিত পদে বরণ করেন এবং অসুরদের পুরোহিত হন শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্য সঞ্জীবনি বিদ্যার বলে যুদ্ধে নিহত অসুরদের পুনর্জীবিত করতেন। বৃহস্পতির এ বিদ্যা অজ্ঞাত থাকায় মৃত দেবতাদের তিনি পুনর্জীবিত করতে পারতেন না। এ অসুবিধার জন্য বৃহস্পতি তাঁর জ্যেষ্ঠছেলে কচকে সঞ্জীবনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য শুক্রাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দেন। কচ ঐ বিদ্যা শিক্ষা করে এলে দেবগণ তাঁর কাছে থেকে সে বিদ্যা শিক্ষা করেন। (মহাভারত) বৈবস্বত মন্বন্তরে চতুর্থ দ্বাপরে দেবগুরু বৃহস্পতি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করে বেদ বিভাগ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

বেদ

আর্যশাস্ত্রের মূল। কেউ বলেন বেদ ঈশ্বর সৃষ্ট। কেউ কেউ বা একে ঋষি প্রণীত বলে নির্দেশ করেন। মীমাংসকগণ বলেন, "বেদ অপৌরুষের ও নিত্য"। বেদের সংখ্যানির্দেশে ও মতভেদ লক্ষিত হয়। কেউ বলেন "তিন বেদ" কেউ বা "চার বেদ" বলে থাকেন। অমর কোষাকার অমরসিংহ ভবভূতি প্রভৃতি তিন বেদ বললেও 'শতপথব্রাহ্মণের' উক্তি অনুসারে আমরা চারবেদই দেখতে পাই। বেদের ন্যায় পূজ্য শাস্ত্র সনাতন জগতে আর দ্বিতীয় নেই। এটি আদিমতম গ্রন্থ।

বেদ প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত যথা– ১. মন্ত্র ও ২. ব্রাহ্মণ। মন্ত্রাংশ ছন্দোবদ্ধ ও ব্রাহ্মণাংশ গদ্যে রচিত। মন্ত্রাংশ আবার চারভাগে বিভক্ত যথা– ১. ঋগ্বেদ, ২. শামবেদ, ৩. যজুর্বেদ ও ৪. অথর্ববেদ। আর ১. ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ২. কৌষীতকীব্রাহ্মণ, ৩. শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৪. গোপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি ও আরণ্যক এবং উপনিষৎসমূহ নিয়ে ব্রাহ্মণাংশ নির্মিত।

ঋগ্বেদ-ঋগ্বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রভেদে চার প্রকার। ঋগ্বেদে ১০টি মণ্ডল আছে। প্রথম মণ্ডলে ২৪ অনুবাক ও ১৯১টি সূক্ত আছে। দ্বিতীয় ৪টি, অনুবাক ৪৩টি সূক্ত আছে। তৃতীয়ে ৫ টি অনুবাক ৬২টি সুক্ত আছে। চতুর্থে ৫টি অনুবাক ৫৮টি সূক্ত আছে। পঞ্চমে ৬টি অনুবাক ৮৭টি সূক্ত রয়েছে। ষষ্ঠে ৬টি অনুবাক ৭৫টি সূক্ত আছে। সপ্তমে ৬টি অনুবাক ১০৪টি সূক্ত আছে। অষ্টমে ১৪টি অনুবাক ১০৩টি সূক্ত রয়েছে। নবমে ৭টি অনুবাক ১১৪টি সূক্ত বিদ্যমান। দশমে ১২টি অনুবাক ও ১৯১টি সূক্ত আছে।

ঋগ্বদের চর্চা, শ্রাবক চাতক, শ্রবণিয়পার, ক্রমপার, ক্রমজঠা, ক্রমরথ, ক্রমশট ও ক্রমদণ্ড নামক আটটি ভেদ আছে। এদের চারটির পারায়ণ আছে। আশ্বলায়নি, সাঙ্খ্যায়নি, শাকলা, বাস্কলা ও মাণ্ডুকা এ পাঁচটি শাখা আছে। কেউ কেউ এর একুশটি শাখা আছে মর্মে বলে থাকেন।

ঋকসংহিতার পারায়ণ দু প্রকার। ১. প্রকৃতিরূপ ও ২. বিকৃতিরূপ। প্রকৃতিরূপ দু প্রকার– ১. রূঢ় ও ২. যোগ। বিকৃতিরূপ আট প্রকার যথা– ১. জটা, ২. মালা, ৩, শিখা, ৪. লেখা, ৫. ধ্বজ, ৬. দণ্ড, ৭. রথ ও ৮ ঘন।

ঋক্সংহিতার কোন কোন স্থানে ৩৩ জন দেবতা কোথাও বা ৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে। ঋক্সংহিতায় যে সকল দেবতার স্তবকরা হয়েছে তন্মধ্যে অগ্নি ও ইন্দ্রই প্রধান। ব্রাহ্মণ মাত্রের উচ্চার্য গায়ত্রি ঋক্সংহিতার একটি ঋক্। ধর্ম শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও মূল ঋক্সংহিতাই দেখতে পাওয়া যায়।

বেদব্যাস

বেদের বিভাগ কর্তা মুণি। তিনি পরাশরের ঔরসে সত্যবতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। যমুনার একটি দ্বীপে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁর নাম দ্বৈপায়ন বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রাখা হয়। অরুনির গর্ভে তাঁর খ্যাতিমান ছেলে শুকদেবের জন্ম হয়। ব্যাসদেব তিন বছর কাল সতত উদ্যোগি হয়ে মহাভারত রচনা করেন। ব্যাস মহাভারত লিখার জন্য লেখকের অনুসন্ধান করায় ব্রহ্মার আদেশে গণেশ তাঁর লেখকের কাজে নিযুক্ত হতে অঙ্গীকার করে বলেন যে– "আমি লিখতে প্রবৃত্ত হলে আমার লেখনি বিরত হবে না।" তা শুনে ব্যাসদেবও তাঁকে অনবগত হয়ে কোন শ্লোক লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেন। বিষয় স্থির করতে বিলম্ব হলে মুণির ২/১টি দুর্জ্ঞেয় শ্লোক রচনা করতেন। এরই নাম ব্যাসকুট বা গ্রন্থগ্রন্থি। গণেশের তা বুঝে লিখতে বিলম্ব হলে ব্যাসদেব সেকালের মধ্যে বহু শ্লোক রচনা করতেন। অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসদেব প্রণীত বলে প্রসিদ্ধ।

দেবান্ত

ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপক শাস্ত্র। বেদের পূর্বভাগ মন্ত্র, ঋক্, যজুঃ ও সামন্। ঐ পূর্বভাগের দর্শন পূর্বমীমাংসা। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগই পূর্ব-পূর্বমীমাংসা ভিত্তি। ব্রাহ্মণের শেষভাগ আরণ্যক ও আরণ্যকের শেষভাগ উপনিষদ। উপনিষদ ভাগকে বেদান্ত বলে। এতে বেদের চরম বস্তু আছে বলে এর নাম বেদান্ত। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্ম নির্ণয়মূলক যে সব গভীর চিন্তা আছে, তাদের সমন্বয় স্থাপন করাই উত্তর-মীমাংসার উদ্দেশ্য। জীবব্রহ্ম নিরূপণান্তক সূত্রই ব্রহ্মসূত্র। বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা।

বেণ

বেন একজন নৃপতি। অঙ্গরাজের ঔরসে সুনিথার গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। বেণ রাজা নিজ রাজ্যে ঘোষণা করে বলি দান ও দেবার্চনা করতে নিষেধ করায় ব্রাহ্মণগণ রেগে মন্ত্রপুত কুশ দ্বারা তাঁকে বিনাশ করেন। পরে ব্রাহ্মণের তাঁর মৃতদেহের দক্ষিণ বাহু ঘর্ষণ করায় সেখান হতে পৃথুরাজার উৎপত্তি হয়।

বৈকুণ্ঠ

বিষ্ণুর এক নাম। "আমি কুণ্ঠিত না হয়ে জলের সঙ্গে পৃথিবীর, বায়ুর সঙ্গে আকাশের এবং তেজের সঙ্গে বায়ুর মিলন করেছি বলে পাণ্ডবেরা আমাকে বৈকুণ্ঠ বলে নির্দেশ করেন।" (কালি সিংহের মহাভারত)

পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিষ্ণু শুক্রের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী বৈকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠবাসি দেবগণের সঙ্গে আপন অংশে বৈকুণ্ঠ নামে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীর ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

ব্যোমকেশ

মহাদেব। ব্যোম (আকাশ) কেশ যাঁহার। স্বর্গ হতে গঙ্গাবতরণকালে শিবের জটসমূহ আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সে জন্য মহাদেবের আর এক নাম ব্যোমকেশ।

ব্যোমাসুর

ময়দানবের মহামায়াবি ছেলে। এ অসুর পর্বতের সানুদেশে ক্রীড়ারত গোপবালকদের চুরি করে পর্বতগুহায় বন্দি করে রাখত। কৃষ্ণ তা জানতে পেরে তাকে পশুর মতো হত্যা করেন।

ব্রহ্ম

অব্যয়, অব্যক্ত, চিরন্তন, সর্বসৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপক, স্বয়ম্ভূ। তিনি নামচিহ্নের অতীত, তিনি স্মৃতি ও সৃষ্টির কর্তা, তিনি স্বীয় সহিমায় অদ্বিতীয়। তিনি অদৃশ্য, আদি ও অন্তহীন। অসীম ও অনন্ত, সমস্ত সামগ্রি তাঁর থেকে সৃষ্ট ও সমস্তই এঁতে বিলীন হয়। তিনি কালের ও সীমার অতীত।

ব্রহ্মদত্ত

(১) পবিত্রপরায়ণ এক রাজা। একদা কালরূপি গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর গৃহে অতিথি হন। রাজা গৌতমের জন্য যে আহার্য প্রদান করেন, তাতে মাংসমিশ্রিত ছিল। এতে গৌতম রেগে গিয়ে ব্রহ্মদত্তকে 'গৃধ্র হও' বলে শাপ দেন। রাজা অনেক ক্ষমাভিক্ষা করলে গৌতম বললেন, "ইক্ষাকুবংশের রাজা রাম তোমাকে স্পর্শ করলে তুমি মুক্তিলাভ করবে।" ব্রহ্মদত্ত গৃধ্র হয়ে বাস করতে লাগলেন। রামের রাজত্বকালে এ গৃধ্র অযোধ্যার রাজোদ্যানে এক উলূকের বাসা অধিকার করে বাস করতে লাগল। উলূক রামের কাছে এর জন্য অভিযোগ করলে, রাম বিবাদস্থলে উপস্থিত হয়ে উলূককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এ বাসা কত দিনের?" সে বললে, "এ পৃথিবীতে যতদিন বৃক্ষের জন্ম হয়েছে, ততদিন এ বাসা নির্মিত হয়েছে।" গৃধ্র বললে, "পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে থেকে আমি এ গৃহে বাস করছি।" দু জনের কথা শুনে রাম বুঝলেন, সৃষ্টির নিয়মানুসারে মানুষের আগে বৃক্ষের জন্ম। তাই এ বাসার প্রকৃত অধিকারি উলূক। গৃধ্র একজন অপহরণকারি। রাম গৃধ্রকে দণ্ড দিতে গেলে দৈববাণি হলো, "গৃধ্র গৌতম শাপে দগ্ধ হয়েছে; একে স্পর্শ করে শাপমুক্ত করুন।" রামের স্পর্শে গৃধ্র দিব্যরূপ প্রাপ্ত হলো। (রামায়ণ)

(২) ব্রহ্ম দত্ত কাম্পিল্য নগরের ধর্মপরায়ণ রাজা। তিনি পবনদের দ্বারা অভিশপ্ত মহারাজ কুশনাভের একশত মেয়ের পাণিগ্রহণ করে তাদের পাপমুক্ত করেন। (কুশনাভ)

(৩) ব্রহ্ম দত্ত শ্রীকৃষ্ণের এক বন্ধু। নিকুম্ভ নামক এক মায়াবি অসুর তাঁর কন্যাকে অপহরণ করে এবং যুদ্ধে এঁকে নিহত করে।

ব্রহ্মা

মহাপ্রলয়ের শেষে এ জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিলো, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সে অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সে জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হলো। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ডমধ্যে,

ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর অণ্ড দু ভাগে বিভক্ত হলে এক ভাগ আকাশে, অন্য ভাগ ভূ-মণ্ডলে পরিণত হয়। এরপর ব্রহ্মা ১. মরিচি, ২. অত্রি, ৩. অঙ্গিরা, ৪. পুলস্ত্য, ৫. পুলহ, ৬. ক্রতু, ৭, বশিষ্ঠ, ৮. ভৃগু, ৯. দক্ষ, ১০. নারদ– এ দশজন প্রজাপতিকে মন থেকে উৎপন্ন করেন। এ সকল প্রজাপতি থেকে সকল প্রাণির উদ্ভব হয়। সরস্বতি ব্রহ্মার স্ত্রী, দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দু মেয়ে; ব্রহ্মার চার মুখ, চার মাথা! তাঁর রং রক্তরঙ। ব্রহ্মার বাহন হাস।

ব্রাহ্মণ

(১) প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার একটি করে ব্রাহ্মণ ছিলো। ব্রাহ্মণ ভাগ সংহিতা হতে বিভিন্ন। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া-প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগ সাধারণত গদ্যে রচিত; কিন্তু কোন কোন স্থানে গাথা বা পদ্যময় অংশও আছে। এ ব্রাহ্মণের শেষ অংশের নাম 'আরণ্যক' এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষৎ। আরণ্যকগুলি গার্হস্থাশ্রমের শেষে নিভৃত অরণ্যে পাঠ্য ছিলো বলে এ নাম প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে তিনটি বিষয় আছে– (১) যজ্ঞ প্রণালী; (২) অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা, (৩) উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ত্ব।

(২) চতুর্বর্ণের মধ্যে আদি ও প্রধান রঙ।

ভগবানের অবতার

লোকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভগবান এগারো ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত– এ ষোড়শকলা বিশিষ্ট পুরুষরূপে কথিত দেহ ধারণ করেন।

ভগবানের প্রথম অবতার সে দেবতাত্মা ব্রাহ্মণরূপ যিনি কৌমার নামক সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আবির্ভূত হন এবং দুশ্চর, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেন। দ্বিতীয় অবতার হলেন বরাহ। বিশ্ব পরিপালনের জন্য যজ্ঞেশ্বর মহাদেব রসাতলগতা ধরণীকে উদ্ধার করার জন্য শুকর দেহ ধারণ করেন। তৃতীয় হলো ঋষি-সৃষ্টি। দেবর্ষি নারদের রূপ ধরে ভগবান নৈষ্কর্ম বিধানকারি বৈষ্ণবতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। চতুর্থ হলো ধর্মকলা সৃষ্টি। নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়ে আসুচি নামক ঋষিকে কালগতিতে নষ্টপ্রায় চতুর্বিংশতি সাংখ্যদর্শন বলেছিলেন। ষষ্ঠ অবতারে অনসূয়ার প্রার্থিত গর্ভে অদ্রিমুনির ছেলে দত্তাত্রেয় রূপে জন্ম গ্রহণ করে অলর্ক ও প্রহলাদাদিকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দেন। সপ্তম অবতারে রুচির ঔরসে আকৃতির গর্ভে 'যজ্ঞ' নাম নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। অষ্টম অবতারে রাজা নাভির ঔরসে মরুদেবির গর্ভে ঋষভ নাম দিয়ে

ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। নবম অবতারে তিনি রাজা। ঋষিরা তাঁকে প্রার্থনা করেছিলেন বলে নাম হ'ল পৃথু। দশম অবতারে তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করেন। এগারো অবতারে বিষ্ণু-কূর্ম-রূপে নিজের পিঠে মন্দার পর্বতকে ধারণ করেন। ত্রয়োদশ অবতারে তিনি হলেন সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত মোহিনি যিনি ললনারূপে অসুরদের মোহবিমুগ্ধ করে দেবতাদের অমৃতপান করিয়েছিলেন। চতুর্দশ অবতারে শ্রীভগবান নরসিংহ রূপ ধারণ করে দৈত্যরাজ মহাগর্বী হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। পঞ্চদশ অবতারে ভগবান বামণরূপে দৈত্যরাজ বলিকে দমন করেন। ষোড়শ অবতারে তিনি পরশুরাম রূপে আবির্ভূত হয়ে ব্রাহ্মণদ্বেষি ক্ষত্রিয় রাজাদের ওপর রেগে গিয়ে একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। সপ্তদশ অবতারে তিনি পরাশরের ঔরসে সত্যবতির গর্ভে ব্যাসদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বেদরূপ মহীরুহকে খণ্ড খণ্ড করে (বেদকে চার ভাগে ভাগ করে) তিনি বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। অষ্টাদশ অবতারে দেবতাদের কার্যসাধনের জন্য। এ জন্মে ভগবান অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রাণি কৌশল্যার ছেলে শ্রীরামচন্দ্র। এ কোন বিংশ ও বিংশ অবতার ক্রমে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিবংশে (যদুবংশ) জন্ম নিয়ে ভগবান পৃথিবীর ভার অপহরণ করেন। একবিংশ অবতারে তিনি বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করে অহিংসা প্রচার করেন। কলির শেষে দ্বাবিংশ অবতারে তিনি, ব্রাহ্মণ বিষ্ণ যশার ছেলেরূপে জন্মগ্রহণ করে 'কল্কি' নাম ধারণ করবেন। (শ্রীমদভাগবত)

ভগদত্ত

তিনি প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুরের ছেলে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের আধিপত্য অমান্য করার জন্য অর্জুনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কর দান করে তিনি পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরবপক্ষ অবলম্বন করে বারো দিনের যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করার মানসে পিতৃদত্ত অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সে অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করাতে তা বৈজয়ন্তীমালা হয়ে তাঁর বক্ষলগ্ন হয়। তখন পরমাস্ত্রহীন ভগদত্তকে অর্জুন অর্ধচন্দ্র বাণে বধ করেন। (মহাভারত)

ভগীরথ

সূর্য বংশের দিলীপ রাজার ছেলে। কপিল মুণির কোপানলে তাঁর পিতৃপুরুষগণ ভস্মিভূত হলে ভগীরথ তাঁদের উদ্ধার করতে গোকর্ণ তীর্থে গিয়ে বহুদিন কঠোর তপস্যা করেন। এবং তপস্যায় সন্তুষ্ট করে গঙ্গাদেবিকে পৃথিবীতে এনে তাঁর পবিত্র জলস্পর্শে নিজ পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার সাধন করেন।

(১) তিনি সূর্যবংশিয় রাজা দশরথ ও তাঁর স্ত্রী কৈকেয়ির ছেলে ও রামের বৈমাত্রের ভাই। অপুত্রক রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞশেষে স্বয়ং অগ্নিদেব অগ্নিকুণ্ড হতে উঠে দশরথের হাতে পায়স দেন। দশরথ সে পায়স স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এ পায়স ভোজন করে কৌশল্যা রামকে, কৈকেয়ি ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে জন্মদান করেন। কৈকেয়ির বরের ফলে যখন জ্যেষ্ঠছেলে রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে প্রেরিত হন, তখন ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। কৈকেয়ি নিজ ছেলে ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্যই রামকে বনবাসে পাঠান; কিন্তু ভরত মাকে হতাশ করেন এবং তাঁকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। তিনি মৃত বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেই রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে চিত্রকূট পর্বতে যান; কিন্তু রাম বনবাসকাল পূর্ণ না হলে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হন। তখন ভরত রামের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁর পাদুকাযুগল সিংহাসনে স্থাপন করে রামের নামে তাঁর দাস হয়ে নন্দিগ্রামে অবস্থানপূর্বক রাজ্যশাসন করতে থাকেন। বনবাসান্তে ফিরে এলে ভরত রামের চরণে তাঁর সে পাদুকাযুগল স্থাপন করে তাঁর হাতে রাজ্যভার তুলে দেন। ভরত পিতারাজার ভাই কুশধ্বজের মেয়ে মাণ্ডবিকে বিয়ে করেন। মাণ্ডবির গর্ভে ভরতের দু ছেলে হয়। তাদের নাম ১. তক্ষ ও ২. পুষ্কল। ভরত এ দু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধনদের উত্তরস্থিত গন্ধর্বদেশ জয় করেন এবং এ দেশ দু ভাগে বিভক্ত করে দু ছেলেকে দেন। তক্ষ যে রাজ্যের রাজা হন, সে রাজ্যের নাম তক্ষশিলা এবং পুষ্কল যে রাজ্যের রাজা হন, তার নাম পুষ্কলবতি। ভরত রামের ন্যায় সরযুসলিলে আত্মবিসর্জন করেন। (রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত)

(২) নাট্যশাস্ত্র-প্রনেতা। ভারতের প্রাচিন নাট্যকলার পরিচয় তাঁর গ্রন্থে আছে।

(৩) চন্দ্রবংশিয় রাজা। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে কণ্বমুনির আশ্রমে তাঁর জন্ম হয়। তিনি নিজে রাজা হয়ে সকল নৃপতিদের পরাজিত করে সার্বভৌমত্ব লাভ করেন। তিনি যমুনাতীরে একশত, সরস্বতি তীরে তিনশত এবং গঙ্গাতীরে চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পরে আবার সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এতদব্যতীত অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উকথ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র বাজপেয় যজ্ঞও তিনি সম্পন্ন করেন। বিদর্ভরাজের তিন মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বৃহস্পতি ছেলে ভরদ্বাজ তাঁর দ্বারাই পালিত হন। তিনি প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, এবং সমস্ত ভারতবর্ষ নিজের শাসনাধীনে আনেন।

তাঁরই নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। ভরতের নবম বংশধর কুরু, তাঁর চতুর্দশ বংশধর শান্তনু এবং শান্তনুর ছেলে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ ছেলেদের বংশধরগণ পাণ্ডব ও কৌরব নামে খ্যাত।

(৪) ঋষভদেবের ছেলে। তিনি বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রাজা হয়ে তিনি বিশ্বরূপের মেয়ে পাঁচজনাকে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি ছেলে হয়। রাজা ছেলেদের রাজ্যভাগ করে দিয়ে তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। বনবাসকালে একদিন এক আসন্নপ্রসবা হরিণী জলপান করতে এসে এক সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে পদস্খলিত হয়ে ভূপতিত হয় এবং গর্ভপাতের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। ভরত এ মাতৃহীন মৃগের ছায়ায় আবদ্ধ হয়ে তপস্যা ত্যাগ করেন এবং এ মৃগের চিন্তা করতে করতে দেহত্যঅগ করেন। পরজন্মে তিনি মৃহজন্ম লাভ করেন এবং জন্মান্তরে ব্রাহ্মণকুমার রূপে আবির্ভূত হন। তিনি লোকসঙ্গ থেকে বিবর্জিত হয়ে জড়বৎ বাস করতেন বলে তাঁর নাম হয় 'জড়ভরত'।

ভরদ্বাজ

বৃহস্পতির ছেলে। তিনি মুণি। ভরদ্বাজমুণি তপস্যার জন্য হিমালয় প্রদেশে গেলে সেখানে অপ্সরা ঘৃতাচিকে দেখে তাঁর মন বিচলিত হয়। পরে ঘৃতাচির গর্ভে তাঁর খ্যাতিমান ছেলে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়।

ভানুমতি

(১) ভানুমতি কুরুরাজ দুর্যোধনের স্ত্রী। তাঁর গর্ভে লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মণা নামে ছেলে ও মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।

(২) ভানুমতি যদুবংশিয় ভানুর মেয়ে। এঁকে অপহরণ করার ফলে নিকুম্ভ দৈত্য কৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন দ্বারা নিহত হন। পরে কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব এঁকে বিয়ে করেন।

ভাস্করাচার্য

তিনি একজন প্রসিদ্ধ গণিত শাস্ত্রজ্ঞ। ১০৩৬ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বীজ্জল বীড় নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। ছত্রিশ বছর বয়সের সময় ভাস্করাচার্য "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভাস্করের মেয়ে লীলাবতির নামে তাঁর পাটীগণিত রচিত হয়।

ভিম

মধ্যম পাণ্ডব। পবনদেবের ঔরসে কুন্তির গর্ভজাত। ভিম অতিশয় বলশালি ছিলেন। বাল্যকালে খেলার সময় কোন বালকই ভিমের সমকক্ষ হতো না। এ সময় হতেই ভিমের প্রতি দুর্যোধনের হিংসার উদ্রেক হয়। তাঁকে বিনাশ করার জন্য দুর্যোধন দু বার বিষ প্রয়োগ করেন এবং এক সময় হাত বেঁধে নদীতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর কিছুতেই কোনরূপ অনিষ্ট হয়নি। ভিম ভাইদের সাথে কৃপাচার্যের ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা এবং বলরামের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। দ্রৌপদির গর্ভে তাঁর সুতসোম নামে এক ছেলে হয়। তাঁর ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ জন্মে। হিড়িম্ব, বক কিম্মি ও জটাসুর প্রভৃতি রাক্ষসগণ এবং জরাসন্ধ ভিমের হাতে নিহত হয়। অজ্ঞাতবাসকালে ভিম বল্লব নামে খ্যাত হয়ে সুপকারের কাজ করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষস্থল ভেদ করে রক্ত পান এবং পরিশেষে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ভিমের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কাজ। সর্বজনবিদিত কিচকবধ ভিমের গুপ্তলীলা। ভিম খুব খেতে পারতেন। এবং গদাযুদ্ধে তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিলো।

ভিমসেন

মধ্যম পাণ্ডব ভিম। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ দ্বিতীয় ছেলে। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তি বায়ুকে আহ্বান করে তাঁর কাছে এক বলবান ছেলে প্রার্থনা করেন। কুন্তির গর্ভে ও বায়ুর ঔরসে ভিমের জন্ম। হনুমান তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। ভিমের আকৃতি বিরাট এবং দৈহিক শক্তিও অপরিমিত। দাড়িগোঁফ ছিলো না বলে কর্ণ তাঁকে মাকন্দ বলে পরিহাস করতেন। তিনি গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয়। অতিরিক্ত ভোজনপটু বলে তাঁর অপর নাম বকোদর। বিপদের সময় দ্রৌপদি তাঁর ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতেন।

ভিষ্ম

তিনি চন্দ্রবংশের শান্তনু রাজার ছেলে। পূর্বজন্মে আটবসুর অন্যতম বসু ছিলেন। পরে শাপগ্রস্ত হয়ে গঙ্গার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নামকরণ কালে তাঁর 'দেবব্রত' রাখা হয়। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং পরশুরামের নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। ভিষ্ম শৌর্যে-বীর্যে অদ্বিতীয় বীর পুরুষ ছিলেন।

(১) তিনি এক ব্রাহ্মণের ছেলে। একদিন তাঁর বাবা মতঙ্গকে যজ্ঞের উপকরণ আনতে বলেন। মতঙ্গ একটি অল্পবয়স্ক গর্দভ-যোজিত রথে যাত্রা করলেন। কিন্তু এ গর্দভ মার কাছে রথ নিয়ে চলল। তখন মতঙ্গ রেগে গিয়ে গর্দভের নাসিকায় বার বার কশাঘাত করতে লাগলেন। সন্তান গর্দভের নাসিকায় ক্ষত দৃষ্টি মা গর্দভি বললে, এক চণ্ডাল তোমাকে কশাঘাত করে চালিত করেছে, ব্রাহ্মণ কখনও এমন নিষ্ঠুর হয় না, এ পাপি নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছে। শিশুর প্রতি এর কোন দয়ামায় নেই। তখন মতঙ্গ রথ থেকে নেমে গর্দভীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে চণ্ডাল বলা হলো কেনো? তাঁর মা কি কোনক্রমে দূষিত হয়েছিলেন? গর্দভি উত্তর দিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণির গর্ভে ও এক শূদ্র নাপিত্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছ। সে জন্য তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়েছে, তুমি চণ্ডাল। এ কথা শুনে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশায় মতঙ্গ সহস্রাধিক বৎসর কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র বার বার এসে মতঙ্গকে বললেন, তুমি অন্য বর চাও, চণ্ডাল হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, ব্রাহ্মণত্ব তোমার পক্ষে দুর্ল। তিনি হতাশ হয়ে আবার তপস্যা আরম্ভ করে সমস্ত শরির এক অঙ্গুলির উপর ভর করে তপস্যা করতে লাগলেন। এর ফলে তিনি একেবারে শীর্ণ ও জীর্ণ হয়ে গেলেন। মাটিতে পড়ে মরার মতো অবস্থা হলে ইন্দ্র তাকে তুলে ধরলেন, কিন্তু প্রার্থিত বর দিলেন না। পরে তাঁর অনুনয়বিনয়ে ইন্দ্র এঁকে পাখির মতো যত্রতত্র বিচরণ করার ক্ষমতা ও ইচ্ছামতো দেহ পরিবর্তন করার শক্তি ও পৃথিবীতে সম্মান পেয়ে খ্যাতিমান হবেন বলে বর দান করলেন।

(২) পম্পা নদীর পশ্চিম তীরে ঋষ্যমূক পর্বতের নিকট মতঙ্গমুনির আশ্রম ছিল। এ রমণির স্থানের নাম ছিল মতঙ্গবন। এখানে সকলে কাম্য ফল লাভে কৃতার্থ হত। ধর্মশিলা শবরি মতঙ্গমুনির কৃপায় এখানে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পান। সীতার অন্বেষণ করতে গিয়ে রাম মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। বানররাজ বালী দ্বারা দুন্দুর্ভি নামক অসুর নিহত হয়ে এক যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হলে দুন্দুভির মুখনির্গত রক্তবিন্দু বায়ু চালিত হয়ে মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হয়। মতঙ্গ তা জানতে পেরে অভিশাপ দেন, ঋষ্যমূক পর্বতে প্রবেশ করলেই বালির মৃত্যু হবে। এ জন্যই বালির ভাই সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে বালি আসতে পারবে না জেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মৎস্যদেশ

মৎস্যদেশের অবস্থান সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। মহাভারত অনুসারে বিরাটরাজের রাজধানি মৎস্য। কাহারো কাহারো মতে বর্তমান জয়পুরের নিকটবর্তী স্থানকে মৎস্যদেশ বলা হত।

মদন

ব্রহ্মা যে সময়ে দক্ষ প্রজাপতিদের সৃষ্টি করে মরিচি প্রভৃতি মানসছেলে সৃষ্টি করেন, সে সময় তাঁর মতো হতে এক পরমাসুন্দরি নারীর আবির্ভাব হয়। এ নারীর নাম সন্ধ্যা। এ সন্ধ্যাই সন্ধ্যাকালে পূজিতা হয়ে থাকেন। কিন্তু এঁকে দেখে ব্রহ্মা, দক্ষ, মরিচি প্রভৃতি ভাবতে লাগলেন, এ সৃষ্টির মধ্যে নারীকে নিয়ে তাঁর কি করবেন এবং কেই বা এঁকে গ্রহণ করবেন। তখন ব্রহ্মা মন হতে এক সুন্দর পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। এ পুরুষের সৌন্দর্য দেখে সকলেই মোহিত হয়ে গেলেন। এ পুরুষ কম্বুগ্রীব, মীনকেতু ও মকরবাহন। এঁকে পুষ্পময় পাঁচশরে ও কুসুমকার্মুকে শোভিত দেখে সকলেই বিস্মিত হলেন। এ পুরুষ ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলেন, কোন কার্যে তিনি নিযুক্ত হবেন।তাঁর অনুরূপ নাম ও স্ত্রী নির্দেশ করা হোক। ব্রহ্মা বললেন– তুমি এ অপরূপ সুন্দর মূর্তিতে ও পুষ্পময় পাঁচশরে স্ত্রীপুরুষকে মোহিত কর। দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ, পশু তোমার বশবর্তী হবে। এমন কি আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তোমার বশবর্তী হব। তুমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে সৃষ্টিলীলার সহায়তা কর। তুমি পুষ্পবাণ দিয়ে সকলের মনে মত্ততা ও আনন্দ সৃষ্টি করবে। তুমি দেবতাদের চিত্ত মথিত করেছ, এ জন্য তোমার নাম 'মন্মথ', তুমি অসাধারণ কামরূপি, সে জন্য তোমার নাম কাম, সমস্ত লোককে তুমি মত্ত করবে, সে জন্য তোমার নাম মদন, তুমি মহাদেবের দর্প চূর্ণ বরবে, সে জন্য তোমার নাম কন্দর্প। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে তোমার অবস্থিতি হবে। তারপর মদন তাঁর কুসুম শরাসন ও পুষ্পময় পাঁচশর প্রথমে ব্রহ্মার উপর নিক্ষেপ করে তাঁর শক্তির পরীক্ষা করতে চাইলেন। সন্ধ্যার সম্মুখে ব্রহ্মার উপর এ শর নিক্ষেপ করাতে ব্রহ্মা কমামোহিত হয়ে পড়লেন। কামশরে বিদ্ধ সন্ধ্যা হতে চতুঃষষ্টি কলা উৎপন্ন হলো।

ব্রহ্মার কামাতুর ভাব দেখে মহাদেব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ছেলেবধু ও মেয়ে, মাতৃতুল্যের প্রতি কামাসক্ত হওয়া ব্রহ্মার পক্ষে পাপকার্য– কারণ তিনি বেদের নিয়ামক। মহাদেবের এ তিরস্কারে ব্রহ্মার দুঃখিত হয়ে মদনকে অভিশাপ দিলেন : তোমার জন্য আমি অপমানিত হয়েছি, এ অপরাধে তুমি মহাদেবের অগ্নিবাণে দগ্ধ হবে। অভিশাপ শুনে মদন ব্রহ্মার কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা বললেন, মহাদেবের কেওাধানলে ভস্মিভূত হলেও তাঁর

অনুগ্রহেই তোমার পুনর্জন্ম হবে। বিবাহের সময় মহাদেব মদনের শরির দান করবেন।

এরপর দক্ষ মদনকে তাঁর দেহজাত মেয়ে রতিকে বিয়ে করতে বললেন। তখন মদন রতিকে বিয়ে করলেন।

তারপর দেবতাদের প্ররোচনায় মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর নয়নের অগ্নিবাণে ভস্মিভূত হলেন। মহাদেবের সঙ্গে পার্বতির বিয়ে হলে মদন পুনরায় শাপমুক্ত হয়ে নিজ শরির প্রাপ্ত হন। (কালিকাপুরাণ)

মধুছন্দা

সতীর অন্যতমা সহচরি।

মধুমতি

মধুদৈত্যের মেয়ে ও ইক্ষাকুবংশিয় রাজা হর্যশ্বের স্ত্রী। মধুমতির গর্ভে যদু নামে এক ছেলে জন্ম গ্রহণ করে। এ যদুর নাম অনুসারেই তাঁর বংশের নাম হয়। ইক্ষাকুবংশ হতেই যদু বংশের উদ্ভব হয়েছে। (হরিবংশ)

মনসা

সর্পগণের দেবি। তিনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মা এবং বাসুকির বোন। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রি দেবিরূপে জৎপাদন করেন; সে জন্য তিনি মনসা এবং এঁকে কশ্যপের মানসী মেয়ে বলা হয়। পুরাকালে মানুষরা সর্বদা সর্পভয়ে ভীত থাকত; কারণ, নাগরা যাকে দংশন করতো, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হোত। তখন ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করে এ সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রিরূপে মনসাকে সৃষ্টি করলেন। কুমারি অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান এবং তাঁর কাছ থেকে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি সবই শিক্ষা করে সিদ্ধা হন। পরে দেবতা, মনু, মুনি, নাগ, মানুষ সকলেই মনসাদেবির পূজা করতে থাকেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

জরৎকারু নামে এক মুনির সঙ্গে কশ্যপ তাঁর বিয়ে দেন। একদা জরৎকারু মনসার উরুতে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যাকালে উপস্থিতিতে সন্ধ্যা-বন্দনা না করায় স্বামির ধর্মলোপ হবে– এ ভয়ে ভীত হয়ে মনসা স্বামির নিদ্রাভঙ্গ করলেন। হঠাৎ তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করায় মনসার উপর জরৎকারু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে জরৎকারু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। মনসা তাঁর ইষ্টগুরু মহাদেব ও বাবা কশ্যপকে স্মরণ করলে তাঁরা জরৎকারুর সম্মুখে এলেন। স্ত্রীকে ত্যাগ করার কারণ শুনে তাঁরা বললেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হলে

স্বধর্ম পালনের জন্য পুত্রোৎপাদন করে ত্যাগ করাই উচিত। পুত্রোৎপাদন না করলে তপস্যার ফল হয় না এবং তপোভঙ্গ হয়। তখন জরৎকারু মনসার নাভি স্পর্শ করলেন। ফলে এ গর্ভে এক তেজস্বি ও তপস্বি পুত্রের জন্ম হলো। এরপর জরৎকারু তপস্যার্থ স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এ পুত্রের নাম হলো আস্তি ক। 'অস্তি' অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে তাঁর নাম হলো আস্তিক।

মহাভারতে আছে– বাসুকির জরৎকারু নামে এক বোন ছিল। জরৎকারু বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, বাসুকি বহু খোঁজের পর মহর্ষি জরৎকারুকে পেয়ে তাঁর হাতে বোনকে সমর্পণ করলেন। স্ত্রী ও স্বামি একই নামধারি হলেন। মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীকে বললেন, তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কিছু করবে না, যদি কর তবে তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাব। একদিন মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীর ক্রোড়ে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হলো। পাছে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এ ভয়ে স্ত্রী স্বামি জরৎকারুকে জাগিয়ে সন্দ্যাবন্দনার কথা জানিয়ে দিলেন। মহর্ষি বললেন, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে স্ত্রী তাঁকে অবমাননা করেছেন; তাই তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেলেন, তাঁর গর্ভে এক তেজস্ব বেদজ্ঞ ছেলে আছে।

যথাকালে জরৎকারুর গর্ভে মহাতেজস্বি এক ছেলে জন্মগ্রহণ করল। মহর্ষি জরৎকারু চলে যাবার সময় তাঁর স্ত্রীকে গর্ভস্থ ছেলেকে লক্ষ্য করে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন, সে জন্য তাঁর পুত্রের নাম হলো আস্তিক।

এ দেবি অত্যন্ত সুন্দরি বলে তাঁর নাম জগৎগৌরী। শিবের শিষ্যা বলে শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবি; জনমে-জয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরি; বিষ অপহরণকারিণি বলে বিষহরি; মহাদেবের কাছে হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোহিনী, কশ্যপের মানসী মেয়ে বলে মনসা।

মন্থরা

রাজা দশরথের দ্বিতীয়া স্ত্রী ভরতমা কৈকেয়ির বাপের বাড়ি থেকে আগত কুব্জাদাসি। তিনি বিকৃতাকার। বক্রদেহা, ঈর্ষাপরায়ণা, কুটবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। কুমন্ত্রণাদানে নিপুর্ণা হলেও, কৈকেয়ির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী পরিচারিকা। দশরথ জ্যেষ্ঠ ছেলে রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে রাজ্যভার দেয়া স্থির করলে দাসি মন্থরা কৈকেয়িকে নানা প্রকারে উত্তেজিত করে এবং তাঁর ছেলে ভরতকে রামের পরিবর্তে রাজা করার জন্য দশরথের কাছে দাবি করতে বলেন। মন্থরা কৈকেয়িকে আর স্মরণ করিয়ে দেন যে, শম্বর অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দশরথ ক্ষত-বিক্ষত দেহে অচেতন হয়ে পড়লে, কৈকেয়ি তাঁকে রণস্থল থেকে এনে সেবাযত্ন করে তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে দশরথ তাঁকে দু টি বর দিতে

স্বধর্ম পালনের জন্য পুত্রোৎপাদন করে ত্যাগ করাই উচিত। পুত্রোৎপাদন না করলে তপস্যার ফল হয় না এবং তপোভঙ্গ হয়। তখন জরৎকারু মনসার নাভি স্পর্শ করলেন। ফলে এ গর্ভে এক তেজস্বি ও তপস্বি পুত্রের জন্ম হলো। এরপর জরৎকারু তপস্যার্থ স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। এ পুত্রের নাম হলো আস্তি ক। 'অস্তি' অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে তাঁর নাম হলো আস্তিক।

মহাভারতে আছে– বাসুকির জরৎকারু নামে এক বোন ছিল। জরৎকারু বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, বাসুকি বহু খোঁজের পর মহর্ষি জরৎকারুকে পেয়ে তাঁর হাতে বোনকে সমর্পণ করলেন। স্ত্রী ও স্বামি একই নামধারি হলেন। মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীকে বললেন, তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কিছু করবে না, যদি কর তবে তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাব। একদিন মহর্ষি জরৎকারু স্ত্রীর ক্রোড়ে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হলো। পাছে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এ ভয়ে স্ত্রী স্বামি জরৎকারুকে জাগিয়ে সন্দ্যাবন্দনার কথা জানিয়ে দিলেন। মহর্ষি বললেন, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে স্ত্রী তাঁকে অবমাননা করেছেন; তাই তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেলেন, তাঁর গর্ভে এক তেজস্ব বেদজ্ঞ ছেলে আছে।

যথাকালে জরৎকারুর গর্ভে মহাতেজস্বি এক ছেলে জন্মগ্রহণ করল। মহর্ষি জরৎকারু চলে যাবার সময় তাঁর স্ত্রীকে গর্ভস্থ ছেলেকে লক্ষ্য করে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন, সে জন্য তাঁর পুত্রের নাম হলো আস্তিক।

এ দেবি অত্যন্ত সুন্দরি বলে তাঁর নাম জগৎগৌরী। শিবের শিষ্যা বলে শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবি; জনমে-জয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরি; বিষ অপহরণকারিণি বলে বিষহরি; মহাদেবের কাছে হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোহিনী, কশ্যপের মানসী মেয়ে বলে মনসা।

মন্থরা

রাজা দশরথের দ্বিতীয়া স্ত্রী ভরতমা কৈকেয়ির বাপের বাড়ি থেকে আগত কুব্জাদাসি। তিনি বিকৃতাকার। বক্রদেহা, ঈর্ষাপরায়ণা, কুটবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। কুমন্ত্রণাদানে নিপুর্ণা হলেও, কৈকেয়ির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী পরিচারিকা। দশরথ জ্যেষ্ঠ ছেলে রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে রাজ্যভার দেয়া স্থির করলে দাসি মন্থরা কৈকেয়িকে নানা প্রকারে উত্তেজিত করে এবং তাঁর ছেলে ভরতকে রামের পরিবর্তে রাজা করার জন্য দশরথের কাছে দাবি করতে বলেন। মন্থরা কৈকেয়িকে আর স্মরণ করিয়ে দেন যে, শম্বর অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দশরথ ক্ষত-বিক্ষত দেহে অচেতন হয়ে পড়লে, কৈকেয়ি তাঁকে রণস্থল থেকে এনে সেবাযত্ন করে তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে দশরথ তাঁকে দু টি বর দিতে

চান। তাঁকে কৈকেয়ি বলেন যে, পরে ইচ্ছা মতো সময়ে তিনি বর চেয়ে নেবেন। এখন সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বলে মন্থরা কৈকেয়িকে এক বরে রামের চৌদ্দ বছর বনবাস ও অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক চাইতে বলে। সত্যরক্ষার্থে রাজা দশরথ এ বর দিতে বাধ্য হন।

মন্দকিনি

স্বর্গগঙ্গা। গঙ্গার যে প্রধান ধারা স্বর্গে গমন করে তাঁর নাম মন্দাকিনি। এই ধারা বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মলোক হয়ে স্বর্গে এসেছে।

মরুৎ

(১) ক্ষীরোদ সমুদ্র হতে উত্থিত অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, তাতে কশ্যপের স্ত্রী দিতির ছেলেরা দেবতাদের হাতে নিহত হলে, স্বামি কশ্যপের নিকট দিতি ইন্দ্রহন্তা অজেয় অবধ্য এক ছেলে কামনা করেন। কশ্যপ বললেন, তুমি যদি সহস্র বৎসর শচি হযে থাকতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রহন্তা ছেলে জন্মাবে– এ বলে হস্ত দ্বারা দিতিকে স্পর্শ করে তাঁর সর্বাঙ্গে তাত বুলিয়ে তিনি তপস্যা করতে চলে গেলেন। দিতি কুশপ্লব নামক স্থানে ছেলে লাভের জন্য দারুণ তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন এবং ইন্দ্রও নানারূপে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। এভাবে ন শত নব্বই বৎসর গত হলে দিতি প্রীত হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তোমার বিনাশের জন্য যে ছেলে প্রার্থনা করেছিলাম, আর দশ বৎসর পরে তোমার সে ভাইকে দেখবে এবং তার সঙ্গে নির্বিবাদে ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ হয়ে তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগ করবে। একদা মধ্যাহ্ন কালে দিতি শয্যার মাথার দিকে পা এবং পায়ের দিকে মাথা রেখে নিদ্রিত ছিলেন। এ জন্য ইন্দ্র তাঁকে অশুচি মনে করেন ও তাঁর শরিরের মধ্যে প্রবেশ করে বজ্রাঘাতে দিতির গর্ভ সাত খণ্ডে বিভক্ত করলেন। তখন গর্ভস্থ শিশু ক্রন্দন করে উঠরে ইন্দ্র 'মা রুদ' (কেঁদো না) বলে তাকে কাটতে থাকেন এবং দিতিও জাগরিত হয়ে ইন্দ্রকে আঘাত করতে নিষেধ করায় ইন্দ্র বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, দিতি মাথার দিকে পা রেখে অশুচি হয়ে শুয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁর ভাবী হত্যাকারিকে সাত খণ্ডে বিভক্ত করেন। দুঃখিত হয়ে তখন দিতি বলেন যে, তাঁর এ সাত ছেলে দিব্যরূপে মরুৎ নামে সাতলোকে বিচরণ করুক। ইন্দ্র মা রুদ বলেছিলেন বলে এঁদের নাম মরুৎ হল। (রামায়ণ)

(২) ঋকবেদে মরুদগণের সংখ্যা সাত। এ সংখ্যা উল্লেখের সময় সপ্তমে সাত– সাত সাত জন মরুতের উল্লেখ থাকায় পুরাণে সাত-সাতে ৪৯ জন মরুৎ হয়েছেন। ঋকবেদের এক স্থানে তেষট্টি জন মরুতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মরুৎরা ঋকবেদের প্রধান দেবতা। তাঁরা ৩৩টি সূক্তে স্তুত হয়েছেন। অপর দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, পুষার সঙ্গে আরো ৯টি সূক্তে এঁদের স্তুতি আছে। মরুদগণের বাবা-মা রুদ্র ও পৃশ্নি (সম্ভবত বিচিত্ররঙমেঘ)। পৃথিবী ও সমুদ্রের এবং রুদ্রের ছেলে বলে তাঁরা রুদ্র নামে অভিহিত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই মহোদর, সমবয়সি। তাঁরা দেবি রোদসিকে (রোদসি-অর্থে আকাশ, বিদ্যুৎ) বিদুন্ময় রথে বহন করেন। রোদসি মরুদগণের স্ত্রী। মরুদগণ ইন্দ্রাণির সাহায়ক ও বন্ধু এবং সরস্বতির সখা। তাঁরা বসুগণের সঙ্গে এক রথে ভ্রমণ করেন।

মরুদগণের উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎ বিজড়িত দেহ। এঁদের বাবা রুদ্রের মতো এঁদের হাতে কুঠার ও ধনুর্বাণ। তাঁরা বৃষের মতো গর্জন করায় পৃথিবী কম্পিত হয়, বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, বন বিমর্দিত হয়। মরুদগণের প্রাধন কাজ– বৃষ্টিপাত করে সূর্যের চোখ আবৃত করে রাখা। মরুদগণ ইন্দ্রের সখা ও অনুচর। তাঁরা গান ও স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করেন। ইন্দ্র তাঁর সকল কার্য মরুদগণ সাহায্যেই সম্পন্ন করেন। (বেদ)

মহাকাল

(১) শিবের অন্য নাম। এ নামে শিব ধ্বংসের দেবতা।

(২) এলিফ্যান্টা গুহায় শিবের মহাকাল মূর্তি আছে। এ মূর্তিতে শিবের আটটি হস্ত দেখা যায়।

(৩) শিবের 'গণ'কদের অধিপতি।

মহাদেব

ত্রিপুর ধ্বংসের সময় শিব দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করেন। এর ফলে তার বল অন্য সকল দেবতাদের অপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও মহাদেব সংহার কর্তারূপে সাধারণত কীর্তিত হয়ে থাকেন। বেদে মহাদেব বা শিবের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু 'রুদ্র' নাম নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। বেদের এ রুদ্রই পরবর্তীকালে শিব বা মহাদেবে পরিণত হয়ে ত্রিমূর্তির মধ্যে গণ্য হয়েছেন। (রুদ্র দেখুন)। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র পিতশূল, তাঁর ধনুকের নাম পিনাক। তাঁর বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র পাশুপত, যা তিনি অর্জুনকে দান করেছিলেন। প্রলয়কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংসকার্যে নিযুক্ত হন। তিনি ত্রিপুরাসুর বিনাশকারি বলে 'ত্রিপুরারি'।

বেদে রুদ্রের বর্ণনায় দেখা যায়– তিনি ভয়াবহ হিংস্র পশুর ন্যায় ধ্বংসকারি, তিনি বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ, তিনি বিদ্বান, জ্ঞানি এবং মর্ত্যেও

দেবগণের কর্মের স্রষ্টা ও সাক্ষি। তিনি বদান্য, সহজে সন্তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ। তিনি রেগে গিয়ে লোকদের হিংসা করে ও তাঁদের সম্পত্তি ধ্বংস করেন, বজ্রাঘাতে মানুষ ও পশু বধ করেন, রোগ আনয়ন করেন। এ সকল অপকার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁকে পূজা ও স্তুতি করা হয়। রুদ্র প্রসন্ন হলে বিপদ হতে উদ্ধার করেন, রোগ দূর করেন। রুদ্রের চরিত্রে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধবাদি গুণের সমাবেশ দেখা যায়। রুদ্র একাধারে রুদ্র (ভয়ানক) ও শিব (মঙ্গলময়)। এ শিব বিশেষণও পরে রুদ্রের অন্য নাম হয়ে পৌরাণিক ত্রিদেবতার অন্যতম হয়েছিল। রুদ্র বা শিব পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিনাশ শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

মহাদেবের অন্য নাম রুদ্র বা মহাকাল, কারণ তিনি সর্বসংহারক। কিন্তু এ সংহার হতেই আবার তাঁর অভ্যুদয় হয়। সে জন্য শিব বা শঙ্কর নামে তিনি জননশক্তি। যা ধ্বংস হয়েছে তা পুনর্বার জন্মেছে– সে জন্য তিনি ঈশ্বর; সর্বশক্তিমান মহাদেব। সৃষ্টির রক্ষক হিসাবে তাঁর প্রতীক লিঙ্গ অর্থাৎ প্রজননের চিহ্ন। এ প্রতীকের সঙ্গে যোনি অর্থাৎ স্ত্রীশক্তি সংযুক্ত হয়ে তিনি সর্বত্র পূজিত হন। তিনি মহাযোগি, সর্বত্যাগি সন্ন্যাসি, কঠোর তপস্যা ও নির্গুণ ধ্যানের প্রতীকস্বরূপ। এ কঠোর তপস্যা ও ক্ষমতার অধিকারি। তিনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করেন। কৈলাস তাঁর আবাসভূমি। স্বয়ং যোগি, কিন্তু কুবের তাঁর ধনরক্ষক। জগন্মাতা পার্বতি তাঁর স্ত্রী। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতি তাঁর ছেলে-মেয়ে বলে খ্যাত। মহাযোগির বেশে তিনি দিগম্বর ধর্জটি। তাঁর দেহ ভস্মাবৃত ও জটাজুটধার। সংহার শক্তি প্রবল হলে তিনি বৈরব, ভিষণ সংহারক– ধ্বংসেই তাঁর আনন্দ। তিনি ভূতেশ্বর বা ভূতনাথরূপে সমস্ত প্রকার ভূতের অধিপতি। তিনি শ্মশানে সর্পজড়িত মস্তকে, গলদেশে কঙ্কাল মাল্য ভূষিত হয়ে অনুচরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। উত্তেজক দ্রব্য পানের পর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নৃত্যে রত হন। এ নৃত্যের নাম 'তাণ্ডব'। অন্যমতে, বিশ্বধ্বংসের সময়কার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। তিনি নৃত্যকলারও উদ্ভাবক বলে তাঁর নাম 'নটরাজ'। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের বর্ণনা এরূপ– তাঁর ললাটে তৃতীয় নয়ন, তাঁর ওপর অর্ধচন্দ্র, মাথায় জটা, পরিধানে রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রাচর্ম, উত্তরিয় কৃষসার হরিণচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবীত, হাতে নানাবিধ অস্ত্র। বাহন নন্দি সর্বদা তাঁর সহচর। তাঁর হাতে সর্বদা ডমরু ও দুর্জনের শাস্তির জন্য মুদগর। পার্বতির সঙ্গে বিবাহের জন্য মদন যখন তাঁকে প্রলুব্ধ করে তপস্যার ভঙ্গের চেষ্টা করেছিলেন, তখন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে তিনি ভস্ম হন। প্রলয়কালে তাঁর এ তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে পৃথিবী

ধ্বংস হয় বলে বর্ণিত আছে। বর্ণিত আছে, তিনি মহর্ষি অত্রির কাছে যোগশিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সহায়তায় তিনি জলন্ধরকে বধ করেন। তিনি পরম ভক্ত অসুর বাণকে রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হওয়ায় বাণকে রক্ষা করতে অসমর্থ হন। সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র হতে ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হওয়ায় ভীত দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হলে জগতের হিতার্থে ব্রহ্মা মহাদেবকে এ বিষ পান করতে বলেন। মহাদেব সম্মত হয়ে বিষ পান করে তাঁর কণ্ঠে তা ধারণ করেন। বিষের তেজে কণ্ঠ নীল রঙ হয়ে যায়; কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। এ জন্যই তাঁর এক নাম নীলকণ্ঠ। অতি সহজে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ঈপ্সিত বর প্রদান করেন বলে তাঁর অন্য নাম আশুতোষ। কেবলমাত্র বিল্বপত্রদানেই এঁকে তুষ্ট করা যায়। তাঁর বরের প্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি অসুররা অত্যাচারি হয়ে শেষে ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতির হাতে নিহত হয়। বিশ্বামিত্র তাঁর দয়ায় অস্ত্রলাভ করেন। পরশুরাম তাঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্রলাভ করে অজেয় হন। ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে তাচ্ছিল্য করে অসম্মানসূচক কথা বলেছিলেন বলে মহাদেব ব্রহ্মার একটি মস্তক কর্তন করেন। সে হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তিনি কিরাতবেশে তাঁর সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ করে প্রসন্ন হন এবং তাঁকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন। প্রজাপতি দক্ষের মেয়ে সতীকে মহাদেব বিয়ে করেন। ভৃগুযজ্ঞে মহাদেব শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন নি বলে ক্রুদ্ধ দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও এ যজ্ঞে উপস্থিত হন। সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ শিবনিন্দা করায় সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। এ সংবাদ পেয়ে মহাদেব সেখানে এসে ক্রোধে জটা ছিন্ন করলে শিবজটা হতে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। আর তাঁর নিশ্বাস-বায়ু হতে কোটি কোটি ভূতপরিবৃতা মহাকালির আবির্ভাব হোল। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু শিবনিন্দার পাপে তাঁর মুণ্ডে ছাগমুণ্ড যোগ করে দেন। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে শিব যখন নৃত্য করছিলেন, তখন সুদর্শনচক্র দ্বারা বিষ্ণু ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। ৫২ খণ্ডে বিভক্ত সতীদেহ যে যে স্থানে পতিত হয়েছিল, সে সেস্থানে ৫২টি পীঠস্থান বা পরম তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এরপর সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তখন মহাদেবও কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা জানতে পারেন যে, মহাদেবের ঔরসে যে ছেলে জন্মাবে সে ছেলেই তারকাকে বধ করবে। সে জন্য পার্বতি ও মহাদেবের মিলন

করতে এসে মদন মহাদেবের কোপে ভস্মিভূত হন। তারপর পার্বতি ও মহাদেবের মিলন হলে মদন পুনর্জীবন লাভ করেন। পার্বতির ছেলে কার্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করে তারকাসুর বধ করেন। শিবের দু ছেলে কার্তিকেয় ও গণেশ এবং তিন স্ত্রী সতী, পার্বতি ও গঙ্গা।

মহাদেবের তৃতীয় নেত্র উদ্ভবের আর একটি কারণ উল্লিখিত আছে। পার্বতি একবার পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের দু নেত্র হস্তদ্বারা আবৃত করেন। এতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত হয় এবং আলোকবিহীন পৃথিবীর সমস্ত মানব বিনষ্ট লোকদের রক্ষা করার জন্য তিনি ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন। এ নেত্রের তীব্র জ্যোতিতে হিমালয় দগ্ধ হয়ে যায়; পরে পার্বতীর প্রীতির জন্যে তিনি হিমালয়কে আবার পূর্বের ন্যায় রমণিয় করেন।

একবার নারদের গর্ব খর্ব করার জন্যে রাগরাগিণীগণ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকেন। নারদ কারণ জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, নারদের সুরহীন সঙ্গীত চর্চার জন্যই তাঁদের এ দুর্দশা। মহদেব সুললিত কণ্ঠে গান করলে তাঁরা আবার পূর্বরূপ ফিরে পাবেন। তখন নারদ বহু স্তুতি করে মহাদেবকে গান করতে সম্মত করান; কিন্তু গান শোনবার উপযুক্ত শ্রোতা না পেলে মহাদেব গাইতে অস্বীকার করেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শ্রোতা হন। মহাদেবের গান শুনে বিষ্ণু কমণ্ডলুর মধ্যে রক্ষা করেন। বিষ্ণুর এ বিগলিত অংশই গঙ্গা। পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করার সময় গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করতে পারবেন না জেনে শিবকে স্তুতি করে গঙ্গাকে ধারণ করার জন্যে সম্মত করা হয়। গঙ্গা শিবকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করায় শিব রেগে গিয়ে গঙ্গাকে আপন জটার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। ভগীরথের পুনর্বার স্তুতিতে শিব গঙ্গাকে জটা হতে মুক্ত করেন।

তারকাসুরের তিন ছেলে। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালি। এরা কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে বর পায়, তারা তিন জনে তিনটি কামগামী নগরে বাস করবে এবং কেহই তা বিনষ্ট করতে পারবে না। সহস্র বৎসর পরে এরা তিন জনে একত্র মিলিত হলে এদের ত্রিপুর এক হয়ে যাবে; তখন যদি কেহ এক বাণে সম্মিলিত ত্রিপুর ভেদ করতে পারে তবেই ত্রিপুর বিনষ্ট হবে। ময়দানব স্বর্গে, অন্তরীক্ষেও পৃথিবীতে তিন পুর নির্মাণ করে দেন। সেখানে দেবতা দ্বারা বিতাড়িত দৈত্যগণ আশ্রয় নেয় এবং ত্রিলোকের উপর নানা উৎপীড়ন সুরু করে। এরা ব্রহ্মার বরে অজেয় হওয়ায় দেবতারা এদের বধ করতে না পেরে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব তাঁর অর্ধ তেজ দেবগণকে দান করে ত্রিপুর ধ্বংস করতে বলেন। দেবতারা তাঁর তেজ ধারণে অসমর্থ জানিয়ে মহাদেবকেই তাঁদের

অর্ধতেজ নিয়ে শত্রু ধ্বংস করতে অনুরোধ করেন। শিব দেবগণের অর্ধতেজ গ্রহণের ফলে তাঁর শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। বিশ্বকর্মা পৃথিবী, দেবি, মন্দরপর্বত, দিগবিদিক, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি দিয়ে রথ নির্মাণ করেন। চাঁদ ও সূর্য চক্র হন। ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের ঘোড়া হন; সুমেরু ধ্বজ ও মেঘ পতাকা হন। সংবৎসর ধনু ও কালরাত জ্যা এবং বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র বাণ হন। ব্রহ্মা সারথি হন। ত্রিপুর অভিমুখে যাত্রা করলে বিষ্ণু, অগ্নি চন্দ্র, ব্রহ্মা ও রুদ্রের ভারে রথ ভূমিতে বসে যায়। তখন বিষ্ণু বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষরূপে রথ ভূমি হতে উত্তোলন করেন। মহাদেব বৃষরূপি নারায়ণ ও অশ্বের পৃষ্ঠে চরণ রেখে ধনুতে জ্যা রোপণ করে পাশাপত অস্ত্র যোজনা করে অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় দানবদের তিন পুর একত্র হতেই মহাদেব বাণ নিক্ষেপ করেন এবং ত্রিপুর দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হয়। এ জন্য মহাদেবের অপর নাম ত্রিপুরারি।

রামায়ণে মহাদেব একজন প্রধান দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু এখানে তিনি পরম দেবতা না হয়ে ব্যক্তিগত দেবতা হিসাবে গৃহীত হয়েছেন। এখানে তিনি বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র দ্বারা পূজিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি রামচন্দ্রের দেবত্ব স্বীকার করেছেন। কুবেরকে পরাস্ত করে রাবণ কৈলাসে উপস্থিত হলে তাঁর রথের গতি রুদ্ধ হয়। মহাদেবের অনুচর নন্দী এসে রাবণকে বলেন, এস্থান শিবের বাসস্থান এবং সকরের অগম্য। রাবণ তাতে রেগে গিয়ে ভুজবরে কৈলাস উত্তোলন করতে থাকেন। পর্বত কম্পিত হওয়ায় পার্বতী সভয়ে শিবকে আলিঙ্গন করেন। তখন মহাদেব পায়ের অঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণের বাহু নিপীড়িত করলে রাবণ ত্রিলোক কম্পিত করে গর্জন করে ওঠেন। তখন মন্ত্রিগণের পরামর্শে শিবের স্তুতি করায় সহস্র বৎসর পরে শিব রাবণের হস্ত মুক্ত করেন এবং রাবনের বীরত্বে প্রীত হয়ে বলেন, দারুণ রব করার জন্যে তোমার নাম 'রাবণ' হবে। রাবণ মহাদেবের কাছে অজেয় অস্ত্র প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে চন্দ্রহাস নামে এক খড়গ দান করেন। মহাভারতেও মহাদেব বিষ্ণু ও কৃষ্ণ দ্বারা পূজিত হয়েছেন। মহাভারতে লিখিত আছে, ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই মহাদেবকে পূজা করেন। মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে নানা উল্লেখ দেখা যায়। এ দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরোধের মধ্যে এক সমন্বয় স্থাপন করার চেষ্টা দেখা যায়। শিব ও বিষ্ণু যে একই দেবতা, তা প্রমাণ করার চেষ্টা আছে; কিন্তু পরবর্তী কালে পুরাণের সময় মহাদেব কিংবা বিষ্ণু যে অন্য সমস্ত দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এ ভাব নানা প্রকারে প্রচারিত হয়। হরিবংশে লিখিত আছে, শিব কিংবা বিষ্ণু দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মহাদেব ধূম্ররূপি বলে তিনি দুর্জটি, মানুষের নিয়ত মঙ্গল কামনা করে বিবিধ কর্মের দ্বারা তাদের উন্নত করেন বলে তিনি শিব। পশুদের অধিপতি ও পালনকর্তা বলে তিনি পশুপতি।

মহাপ্রলয়

প্রত্যেক কল্পের শেষে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন সপ্তলোক এবং তাহাদের অধিবাসি দেবগণ, ঋষিগণ, এমন কি ব্রহ্মা নিজেও এ মহাপ্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

মহাপুরাণ

বিষ্ণু পুরাণ ও ভগবৎ পুরাণকে মহাপুরাণ বলা হয়।

মহাবিদ্যা

কালি, তারা, ষোড়শি, ভুবনেশ্বরি, ভৈরবি, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতি বগলা, মাতঙ্গি ও কমলা– এ দশজন মহাবিদ্যা (দশ মহাবিদ্যা)

মহাভারত

ভারতীয মহাবংশচরিত ও কুরু-পাণ্ডবীয় যুদ্ধ-বর্ণনাত্মক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কৃত মহাকাব্য। তা অষ্টাদশ পর্বে সম্পূর্ণ : ১. আদি, ২. সভা, ৩. জন, ৪. বিরাট, ৫. উদযোগ, ৬. ভিষ্ম, ৭. দ্রোণ, ৮. কর্ণ, ৯. শল্য, ১০. সৌপ্তিক, ১১. স্ত্রী, ১২. শান্তি, ১৩. অনুশাসন, ১৪. অশ্বমেধিক, ১৫. আশ্রমবাসিক, ১৬. মৌষল, ১৭. মহাপ্রস্থান, ও ১৮. স্বর্গারোহণ। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তিনি এরূপ পবিত্র কাব্য রচনা করবেন– যাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা. ইতিহাস ও পুরানেরপ্রকাশ, বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ এ দিন কালের নিরূপণ, জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র– এ চতুর্বর্ণের নানা পুরাণোক্ত আচারবিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও যুগপ্রমাণ, ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ন্যায়-শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম, পাশুপতধর্ম এবং যিনি যেকারণে দিব্য বা মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ, বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরি, দুর্গ, সেনার ব্যূহ-রচনাদি কৌশল ইত্যাদি কথিত হবে। অথচ যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন, সে পরম ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হবেন। এ মহাভরত পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত। আবার এ

অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে একশত পর্বাধ্যায় আছে। মহাভরতে এক লক্ষ শ্লোক আছে পৃথিবীর মধ্যে মহাভারত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাকাব্য। বর্ণিত আছে যে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর পৌত্রের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে ৩ বৎসরে এ মহাভারত রচনা করেন।

মহাভারতের রচনাকাল এরূপ প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কিছু অধিক বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন– মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে পঞ্চম অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা

দেবি দুর্গা মহাভাব আশ্রয় করেও শ্বেত ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে তাঁর এক নাম হয় মহাশ্বেতা। (দেবিপুরাণ)

মহিষাসুর

অসুর। রম্ভ নামে এক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করে তাঁর কাছ থেকে ত্রিলোকবিজয়ী এক বর প্রার্থনা করায় মহাদেব তাঁকে সে বর দান করেন। এ বরের প্রভাবে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে। কালক্রমে এ অসুর অতি দুর্দান্ত হয়ে ওঠেন এবং দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। বিতাড়িত দেবগণ বিষ্ণুর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করলে বিষ্ণু বলেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষ জাতীয় যে কোন জীবের অবধ্য হয়েছেন। সমস্ত দেবতার তেজ থেকে যদি কোন পরমাসুন্দরি নারীর উদ্ভব হয়, তবে তিনি মহিষাসুরকে হত্যা করতে সমর্থ হবেন। তখন দেবতাদের মিলিত প্রার্থনার ফলে দেবতাদের তেজ থেকে এক অপূর্ব লাবণ্যময়ি অষ্টাদশ হস্তা নারীর আবির্ভাব হয়। দেবগণ তাঁকে বিবিধ অস্ত্র দান করেন। মহিষাসুর এ দেবিকে বিয়ে করার জন্য দূত পাঠান। দূতকে তিরস্কৃত করে বিদায় দিলে মহিষাসুর দেবিকে শাস্তি দেবার জন্য সসৈন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দেবির সঙ্গে দির্ঘকালব্যাপি ঘোর যুদ্ধের পর দেবির হাতে মহিষাসুরের নিধন ঘটে।

মহিষাসুর তিনবার জন্মগ্রহণ করে। তিনবারই দেবি ত্রিবিধ রূপ ধারণ করে তাকে হত্যা করেন। মহিষাসুরকে হত্যা করার জন্য ভগবতি প্রথমে উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয়বারে ভদ্রকালি, তৃতীয়বারে দুর্গারূপ ধারণ করেছিলেন।

মহেশ্বর

মহাদেব। (এগারোতনু)

মাধবি

(১) রাজা যযাতির মেয়ে কোনসময় বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব বিশ্বামিত্রকে বার বার গুরুদক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করায় বিশ্বামিত্র ঈষৎ রেগে গিয়ে বলেন, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র একটি কর্স ও শ্যাম রঙ আট শত ঘোড়া তিনি গুরুদক্ষিণা চান। গালব বিপদে পড়ে বিষ্ণকে স্মরণ কররে তাঁর সখা গরুড় তাঁকে নিয়ে নানাদেশ ঘুরে অবশেষে রাজা যযাতির কাছে উপস্থিত হন। যযাতি গালবের প্রার্থনা পূরণ করতে অপারগ হয়ে নিজের মেয়ে মাধবিকে দান করেন এবং বলেন অন্য রাজারা এ মেয়ের শুল্কস্বরূপ গালবকে আট শত ঘোড়া দান করবেন। মাধবিকে নিয়ে গালব অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে উপস্থিত হলে হর্যশ্ব মাধবির গর্ভে বসুমনা নামে এক ছেলে উৎপাদন করে গালবকে দু শ ঘোড়া দেন। পরে এক ব্রহ্মজ্ঞ মুনির বরে মাধবি পুনর্বার কুমারি হয়ে রইলেন। এরপর গালব ক্রমে কাশিরাজ দিবোদাস ও ভোজরাজ উশীনরের কাছে মাধবিকে নিয়ে যান ও তাঁরা প্রত্যেকে দু শ করে ঘোড়া দিয়ে মাধবির গর্ভে যথাক্রমে প্রতর্দন ও শিবিকে উৎপাদন করেন। তখন গরুড় গালবকে বলেন, প্রাচীন কালে মহর্ষি ঋচীক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এরূপ সহস্র ঘোড়া দিয়ে তাঁর মেয়ে সত্যবতিকে বিয়ে করেছিলেন। এ সকল ঘোড়া আবার ঋচীক বরুণের কাছে পেয়েছিলেন। একদা গাধি ব্রাহ্মণদের সমস্ত ঘোড়া দান করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হর্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর, প্রত্যেকে দু শ করে ঘোড়া ক্রয় করেন। অবশিষ্ট চার শত ঘোড়া পথে অপহৃত হয়। সুতরাং ঘোড়া আর পাওয়া যাবে না। তখন গরুড়ের পরামর্শ অনুসারে গালব বিশ্বামিত্রকে ছ-শ ঘোড়া ও অবশিষ্ট দু শ-এর পরিবর্তে মাধবিকে দান করে বলেন, এ মেয়ে তিন জন রাজর্ষির ঔরসে তিনটি ধার্মিক ছেলে প্রসব করেছে; বিশ্বামিত্র ক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, পূর্বে এ মেয়েকে পেলে তিনি চারটি বংশধর ছেলে পেতেন। যথাকালে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মাধবির গর্ভে অষ্টক নামে এক ছেলে হলো। বিশ্বামিত্র তাকেই ধর্ম, অর্থ ও ঘোড়াগুলি দান করে মাধবিকে গালবের হাতে দিয়ে বনে গমন করলেন। গালব মাধবিকে যযাতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। যযাতি গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থ আশ্রমে মাধবির স্বয়ংবর সভা করলে মাধবি সকল রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে বনবাসে ধর্ম পালন করতে থাকেন; এমন সময় যযাতি স্বর্গে গমন করেন। বহু বর্ষ স্বর্গবাসের পর অতিরিক্ত অহঙ্কারের ফলে তিনি স্বর্গচ্যুত হয়ে সাধুজনের মধ্যে পতিত হওয়া স্থির করেন। তখন মাধবির চার ছেলে নৈমিষ্যারণ্যে যজ্ঞ করছিলেন; সে যজ্ঞ-ধূম অবলম্বন করে যযাতি সেখানে গমন করেন। সে সময় মাধবিও সেখানে এসে বাবাকে প্রণাম করেন ও তাঁর দৌহিত্রদের পরিচয় দেন গালবও অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হন প্রত্যেকেই

তাদের তপস্যার অংশ দিয়ে যযাতিকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। (মহাভারত–উদ্‌যোগ)

(২) রাজা ধর্মধ্বজের পত্নী। তুলসির মা।

মানসপুত্র

মন হতে উৎপন্ন ছেলে। ব্রহ্মার সাত কিংবা দশ জন মন হতে জাতছেলে। এ মানসছেলে হতেই পৃথিবীর মানবজাতির জন্ম এ দশ জন মানসছেলেকে প্রজাপতি বলা হয়; যেমন– মারিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা দক্ষ, ভৃগু এবং নারদ। কোন কোন মতে ৭ জন প্রজাপতি ছিলেন। এঁদের সপ্তর্ষি বলা হয়; শতপথব্রাহ্মণে এঁদের নাম এ রূপ– গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ এবং অত্রি। এ সপ্তর্ষিদের এখন আকাশে তারকারূপে দেখা যায়।

মারিচ

হিরণ্যকশিপুর বংশের সুন্দ অসুরের ঔরসে ও তাড়কা রাক্ষসির গর্ভে এর জন্ম হয়। এ রাবণের অনুচর। মারিচ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। তখন বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় দশরথ এ রাক্ষসকে বিনাশ করার জন্যে রামকে বনে পাঠিয়ে দেন। বিশ্বামিত্র সহ রাম বনে গমন করলে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মারিচ ভিষণ উৎপাত করতে থাকে। তখন রাম মানবাস্ত্র সন্ধান করে মারিচকে শত যোজন দূরে নিক্ষপে করেন। পরে রাম, সীতা লক্ষ্মণ বনে গমন করলে দণ্ডকারণ্যে হরিণরূপধারি দু রাক্ষসের সঙ্গে মারিচ ঋষি-হত্যা করে তাঁদের রক্তমাংস ভোজন করেন। এমন সময় রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে দেখে পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে মারিচ প্রতিশোধের ইচ্ছায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গি হরিণরূপে তাঁদের আক্রমণ করে। রাম তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলে মারিচ কোন মতে প্রাণরক্ষা করে; কিন্তু অপর দু রাক্ষস বিনষ্ট হয়। সে হতে মারিচ তপস্বিবেমে আশ্রমে নির্মাণ করে বাস করতে থাকে। সীতাঅপহরণ কালে রাবণ মায়াবি মারিচের সাহায্যপ্রার্থি হয়ে তাকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে বলেন। মারিচ রামের বিক্রম জেনে অসম্মত হন। রাবণ তাকে অর্ধরাজ্যের লোভ দেখান এবং অসম্মত হলে হত্যা করার ভয় দেখান। মারিচ অবশেষে রামের হাতেই মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতার অনুরোধে রাম তাকে ধরতে গেলে মারিচ রামকে ভুলিয়ে বহুদূরে নিয়ে যায়। তাকে ধরতে অসমর্থ হয়ে রাম শরাঘাতে তাকে বধ করেন। মৃত্যুকালে সে রামের স্বর অনুকরণ করে আর্তনাদ করেছিল। (রামায়ণ)

মৃত্যু

ব্রহ্মার ক্রোধজাত দেবি। প্রাণি সৃষ্টির পর ব্রহ্মার তাদের সংহারের উপায় ভাবতে থাকেন। তাঁর ক্রোধ হতে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সমস্ত জগৎ দগ্ধ হতে থাকে। তখন প্রজাদের রক্ষার্থ মহাদেব ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করলেন এবং ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী ভারার্ত হলে প্রাণি সংহারের জন্য অনুরোধ করার কোনো উপায় না দেখে ব্রহ্মা রেগে গিয়েছিলেন। মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাঁর নিজেরে দেহেই তাঁর ক্রোধাগ্নি ধারণ করলেন। তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার থেকে পিঙ্গলরঙা, রক্তনয়না, রক্তাননা স্বর্ণকুণ্ডলধারিণী মৃত্যুদেবি আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা তাঁকে সকল প্রাণি সংহারে নিয়োজিত করতে চান। মৃত্যু বলেন, তিনি নারী; সতুরাং তিনি এ ক্রূর কর্ম করতে পারবেন না। ব্রহ্মা তাঁকে আদেশ দিলেও তিনি অসম্মতা হয়ে ধেনুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে এলে মুত্যু তখন বলেন, তিনি সুস্থ প্রাণিকে বধ করতে চান না। তিনি স্বয়ং আর্ত ও ভীত হয়ে ব্রহ্মার নিকট অভয় প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলেন, এতে মৃত্যুর কোন অপরাধ হবে না। সনাতন ধর্মই তাঁকে পবিত্র রাখবেন। যম এবং ব্যাধি-সকলই তাঁকে সাহায্য করবেন। ব্রহ্মা ও দেবগণের বরে তিনি নিষ্পাপ ও খ্যাতিসম্পন্ন হবেন। মুত্যু তখন ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য করে বলেন যে, লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, দ্রোহ, মোহ, অলজ্জা ও পুরুষ আচরণ ইত্যাদি দোষ দেহে বিদ্ধ 'তথাস্তু' বলে বললেন, মৃত্যুর যে অশ্রুবিন্দু ব্রহ্মার হাতে পড়েছিল তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণি সংহার করবে, মৃত্যুর কোন অধর্ম হবে না। (মহাভারত–দ্রোণ)

মিনাক্ষি

কুবেরের মেয়ে। মাছের চোখের মতো তাঁর চোখ।

ময়

ময় ছিলেন এক মায়াবি দানব। তিনি দানবদের অদ্বিতীয় শিল্পি। অসুরগণের শিল্পকারি দৈত্য। হেমা নামের এক অপ্সরার গর্ভে তাঁর মন্দোদরি নামে মেয়ে জন্মে। রাবণের সাথে এ মেয়ের বিয়ে হয়। মায়াবি ও দুন্দুভি নামে তাঁর অপর দু টি ছেলে ছিলো। খাণ্ডববন দাহকালে ময়দানব ঐ বনে অবস্থান করছিলেন। দাহভয়ে পলায়নপর হলে কৃষ্ণ তাঁকে আক্রমণ করেন। পরে অর্জুনের শরণাগত হলে অর্জুন তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার বরে তিনি হিরন্ময় অরণ্য ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। দানব প্রত্যুপকার করতে ইচ্ছুক হয়ে কৃষ্ণের আদেশানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের সভা নির্মাণ করেন।

মহানন্দ

মগধাধিপতি নন্দবংশের শেষ নরপতি। মুরা নামের এক শূদ্রার গর্ভে মহানন্দের খ্যাতিমান ছেলে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। মহানন্দ বিনা দোষে তাঁর শকটার নামক মন্ত্রির অবমাননা করলে মন্ত্রি প্রতিহিংসা করার ইচ্ছায় চাণক্য পণ্ডিতকে কোন কার্যোপলক্ষে রাজবাটিতে উপস্থিত করেন। ঘটনাক্রমে চাণক্যও রাজার নিকট অপমানিত হয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছায় নানা কৌশল করে নন্দবংশ ধ্বংস ও চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

কামনায় মুণিদের আশ্রমে যোগসাধন করতে থাকেন। কালক্রমে মুণিরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ছেলে উৎপাদনের জন্য যজ্ঞারম্ভ করেন। মধ্যরাতে যজ্ঞ নিবৃত্ত হলে মুণিরা মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলসি বেদির ওপরে রেখে নিদ্রা যান। এরূপ স্থির ছিলো, এ কলসির জল যুবনাশ্বের স্ত্রী পান করলে ছেলে উৎপাদন হবে। রাজা যুবনাশ্ব পিপাসায় কাতর হয়ে এ মন্ত্রপূত জল নিজে পান করে ফেললেন। মুণিরা নিদ্রা থেকে উঠে দেখেন কলসি জলশূন্য। যুবনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনে মুণিরা বললেন– আপনার ছেলে জমের জন্যই তপঃসিদ্ধ জল রেখেছিলাম। জলপানের ফলে আপনিই ছেলে প্রসব করবেন। কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ থেকে মুক্তি পাবেন। শতবর্ষ পূর্ণ হলে যুবনাশ্বের পার্শ্ব ভেদ করে এক সূর্যতুল্য তেজস্বি ছেলে বের হলো। কিন্তু মাতৃস্তন অভাবে ছেলে কি পান করে জীবিত থাকবে– রাজা এ কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময় ইন্দ্র সেখানে এসে বললেন, এ বালক আমাকে ধারণ করবে অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকবে। এ কারণে তাঁর নাম হয় মান্ধাতা। ইন্দ্র তখন বালকের মুখে নিজের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন। বালক সে আঙ্গুল চুষতে লাগলো। মান্ধাতা পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী জয় করতে বের হলেন। সুমেরু পর্বতে রাবণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরস্পরের বলবীর্য সমান হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। অবশেষে মান্ধাতা স্বর্গরাজ্য জয় করতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে বলেন যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করার পর তিনি যেনো স্বর্গরাজ্য জয়ের চেষ্টা করেন। মধুর ছেলে লবনাসুর তাঁর আধিপত্য অস্বীকার করেন। তখন রাজা মান্ধাতা মধুর ছেলে লবণের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে লবণের হাতে নিহত হন। স্মর্তব্য লবণের বাবা মধু এবং কৈটভের মেদ হতে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই পৃথিবীর নাম মেদিনি।

মান্ধাতা

সূর্য বংশের নরপতি। যুবনাশ্ব রাজার বাম হাত ভেদ করে উৎপন্ন হন। মান্ধাতা একজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা। রাবণের সাথে তাঁর মিত্রতা ছিলো। তিনি পৃথিবী জয় করে স্বর্গ জয় করতে উদ্যত হলে দেবরাজ ইন্দ্রের কথানুসারে মধুবনে উপস্থিত হয়ে মধুর ছেলে লবণের সাথে যুদ্ধে নিহত হন।

মুচকুন্দ

মহারাজ মান্ধাতার ছেলে। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করে তাঁদের নিকট হতে এরূপ বর পান যে, তিনি যুদ্ধের ক্লান্তি দূর করার জন্য পর্বত গুহায় দির্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকবেন। যে ব্যক্তি তাঁর ঘুম ভাঙ্গবেন, সে তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে ভস্মিভূত হবে।

কৃষ্ণ কালযবনকে বিনাশ করার জন্য সে পর্বতে নিয়ে যান। পরে কৃষ্ণ লুকিয়ে থাকলে কালযবন তাঁর খোঁজ করতে করতে সে গর্তে ঢোকেন এবং সেখানে তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখে পা দিয়ে আঘাত করলে তিনি জেগে দৃষ্টিপাত করামাত্র ভস্ম হয়ে যান।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধ চণ্ডিকাব্য তাঁরই প্রণীত। বর্ধমানের অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার নাম হৃদয় মিশ্র। মুকুন্দরাম পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করে মেদিনিপুর জেলার অন্তপাতি আঁড়বা গ্রামের রাজা বাঁকুড়া দেবের নিকট উপস্থিত হন। রাজা তাঁর বিদ্যার পরিচয় পেয়ে নিজ পুত্রের শিক্ষক রূপে তাঁকে নিযুক্ত করেন। কবি চণ্ডিকাব্য প্রণয়ন করে কবিকঙ্কণ উপাধি পান। ১৫৭৩ সালের পর এবং ১৬০৩ সালের মধ্যে চণ্ডিকাব্য রচিত হয়।

মেঘনাদ

লংকার যুবরাজ মহাবীর মেঘনাদ। প্রধান মহিষি মন্দোদরির গর্ভে জন্ম গ্রহণকারি রাবণের জ্যেষ্ঠ ছেলে। জন্মের পর মেঘ গর্জনের মতো গম্ভির নাদ বা শব্দে ক্রন্দন করেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় মেঘনাদ। দেবি মহামায়ার পূজা করে মেঘনাদ মায়াবল লাভ করেন। তিনি ১. অগ্নিষ্টোম, ২. অশ্বমেধ, ৩. রাজসূয়, ৪. গোমেধ, ৫. বৈষ্ণব প্রভৃতি সাতযজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং দুঃসাধ্য মহেশ্বর যজ্ঞ করে তিনি পশুপতির নিকট হতে বর লাভ করেন। তিনি তপোবনে কামচারি আকাশগামি স্যন্দন, তামসি মায়া, অক্ষয় তূণির ও শত্রুনাশক অস্ত্রসমূহ লাভ করে দুর্ধর্ষ হন। দিগ্বিজয় করার সময় রাবণ ছেলেসহ ইন্দ্রকে জয় করার জন্য সুরধাম স্বর্গে যান; সে সময়ে মেঘনাদ ইন্দ্রছেলে জয়ন্তকে পরাজিত করেন এবং শিবের বরে মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে ইন্দ্রকে মায়াতে আচ্ছন্ন, শরজালে অবসন্ন এবং বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। অসহায় দেবতারা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রের মুক্তি ভিক্ষা করতে আসেন। ব্রহ্মা মহাবীর মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা দেন। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব প্রার্থনা

করেন। ব্রহ্মা সে বর দিতে অস্বীকার করে অন্য বর চাইতে বলায় ইন্দ্রজিৎ প্রার্থনা করেন যে, যখন তিনি যথাবিধি অগ্নির পূজা করে যুদ্ধযাত্রা করবেন, তখন তাঁর জন্য অগ্নি থেকে ঘোড়াসহ রথ উত্থিত হবে, সে রথে যতক্ষণ অবস্থান করবেন, ততক্ষণ তিনি যেনো অমর হন। অগ্নিপূজার জপ ও হোম অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধযাত্রা করলেই তিনি বধ্য হবেন। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ব্রহ্মা এ বরেই স্বীকৃত হন। রাম বানর সেনার সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশ করলে, ইন্দ্রজিৎ প্রথমেই অঙ্গদ এর হাতে পরাজিত হন। এতে তিনি রেগে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যান এবং রাম-লক্ষ্মণকে নাগ পাশে আবদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত গুরুড়ের কৃপায় তাঁরা রক্ষা পান। ইন্দ্রজিৎ আবার রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও হত্যা করেন; কিন্তু হনুমান ঔষধ এনে তাঁদের জীবিত করেন। এরপর তিনি যুদ্ধস্থলে মায়া-সীতা প্রদর্শন করে কৌশলে রামকে পরাজিত করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এ ছল-চাতুরি বুঝতে পারায় তাঁর কৌশল ব্যর্থ হয়। তখন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে অজেয় হওয়ার সংকল্প করেন; কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করেন। এ যজ্ঞের অন্যতম শর্ত হচ্ছে– যজ্ঞ আরম্ভ করে অসমাপ্ত রাখলে যজ্ঞকারির মৃত্যু অনিবার্য। লক্ষ্মণ এ সুযোগের আশ্রয় নিলেন। বিশ্বাসঘাতক খুল্লতাত বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পৌঁছেই কাপুরুষের মতো যজ্ঞরত মেঘনাদকে আক্রমণ করেন।

মেনকা

(১) মেনকা প্রসিদ্ধ অপ্সরি, শকুন্তলার মা। ইন্দ্রের আদেশে মেনকা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেন ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র তপস্যার জন্য গমন করেন এবং মেনকাও শিশু মেয়েকে নদীতীরে ত্যাগ করে প্রস্থান করেন।

(২) মেনকা মেনার অপর নাম।

মৈত্রেয়ি

যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। তাঁর অন্য স্ত্রীর নাম কাত্যায়নি। মৈত্রেয়ি ছিলেন ব্রহ্মবাদিনি। ব্রহ্মবিদ্যা অনুসরণ করে স্বামির পথ অবলম্বন করেছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী কাত্যায়নি ছিলেন সাধারণ গৃহিণির মতো সতীসাধ্বি; কিন্তু ধর্মচর্চায় লিপ্ত ছিলেন না। কাত্যায়নি কেবলমাত্র গার্হস্থ্য জীবনেই নিরৃত ছিলেন। মৈত্রেয়ি সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যারও অনুশীলন করতেন। তাঁর জ্ঞানার্জন স্পৃহা ছিল

অদম্য। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার আশ্রম ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। সংসার ত্যাগ করার পূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য দু স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে আমি এখন সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করছি। সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের অনুমতি পেলে আমি তোমাদের দু জনের মধ্যে আমার সমস্ত অর্থসম্পদ বণ্টন করে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে চলে যাব। মৈত্রেয়ির সমস্ত অন্ত র এতে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি স্বামিকে প্রশ্ন করলেন, "পৃথিবীর সমস্ত ধন ও অর্থ যদি আমার হয়, তবে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারবো?" "কথং তেন অমৃতা শ্যাম?" যাজ্ঞবল্ক উত্তর দিলেন, ধনি লোকের জীবন যেমন, তোমার জীবনও সে রকম হবে। বিত্ত দ্বারা কখনো অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বললেন– মানুষ পার্থিব ভোগসুখের ফেনপুঞ্জের সঙ্গে মিশে গেল তার অমৃতের মধুর আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না; কারণ, মানুষ মরণশিল। সে চির নিশ্চিত মৃত্যু এসে মানুষের সকল ভোগসুখের উপর যবনিকাপাত ঘটায়। তাই বিত্তদ্বারা কখনই অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই।

এ দার্শনিক সত্য উপলব্ধি করার পর মৈত্রেয়ি স্তব্ধ হয়ে ভাবলেন– বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই, মৃত্যু তাঁকে মুক্তি দান করবে না। তাঁর কাছে ধন তুচ্ছ, বিত্ত তুচ্ছ, তুচ্ছ এ গৃহসংসার যদি অমৃতত্বের সন্ধান না পাওয়া যায়; যে মোহজালে পতিত মানুষের পরম সত্য লাভ হয় না,– তাই ভেবে মোহের আকর্ষণ তিনি মুহূর্ত মধ্যে ত্যাগ করলেন। তারপর মৈত্রেয়ি স্বামির যাত্রাকালে জিজ্ঞাসা করলেন, "যে নাহং নাহমৃতা স্যাং; কিমহং তেন কুর্যাম্।" যাতে আমি অমৃত হব না, তা দিয়ে আমি কি করব? তাই তিনি স্বামিকে অমৃতের সন্ধান দিতে বললেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য সমস্তই ভুলে গেলেন– ব্রহ্মবাদিনি স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে তিনি স্ত্রীর কাছে এ অমৃতের, এ অমরত্বের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

মৈনাক পর্বত

হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ ছেলে এ মৈনাক। তিনি পার্বতীর বড় ভাই। মৈনাকের ও অন্যান্য পর্বতের পাখির মতো পাখা ছিল। ইন্দ্র একবার রেগে গিয়ে সকল পর্বতের পাখা কেটে দেন। মৈনাক পবনদেবের সাহায্যে সাগরে আশ্রয় নিয়ে ইন্দ্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান।

যক্ষ

(১) দেবযোনি বিশেষ। এরা কুবেরের অনুচর এবং ঘোর কৃষ্ণরঙ; মুখ বিকৃতাকার ও পিঙ্গলাক্ষ। বৃহৎ উদর, কেউ বা স্ফটিকরঙ, রক্তবেশ ও দির্ঘস্কন্ধ।

এদের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে, ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত থাকার সময় অতিশয় ক্ষুধার্ত হন এবং ক্রোধের বশে অন্ধকারের মধ্যেই প্রজা সৃষ্টি করতে থাকেন। এর ফলে অন্ধকারের মধ্যে বিকৃতরূপ ক্ষুধার্ত প্রজার সৃষ্টি হলো। তাদের মধ্যে কেহ ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে কয়েক জন প্রজা এ অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে। প্রজাদের মধ্যে যারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিলো, তারা হলো যক্ষ, আর যারা নিষেধ করেছিলো (রক্ষতাং) তারা হলো রাক্ষস। (পদ্ম পুরাণ)

অবশ্য, এদের জন্ম সম্বন্ধে আরো অন্য কাহিনি আছে। এরা বিশেষ কোন গুণসম্পন্ন না হলেও দোষশূন্য।

রামায়ণে বর্ণিত আছে– ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন। তারপর সে জল রক্ষার জন্যে প্রাণিদের সৃষ্টি করলেন; সে প্রাণিদের মধ্যে কেউ কেউ বললো– যক্ষমঃ, অর্থাৎ আমরা পূজা করবো। এ কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, যারা তোমাদের মধ্যে যক্ষামঃ বলেছো, তারাই যক্ষ হবে। অন্য একদল প্রাণি বললো– রক্ষামঃ, অর্থাৎ জল রক্ষা করবো। যক্ষরা সাধারণত মানুষের বন্ধু ও কুবেরের ভৃত্য আর রাক্ষসরা মানুষের শত্রু।

(২) বানররাজ সুগ্রিবের একজন মন্ত্রি।

যজুর্বেদ

দু ভাগে বিভক্ত যথা– ১. শুক্লযজুর্বেদ ও ২. কৃষ্ণজুর্বেদ। এর নামান্তর ১. বাজসনেয় সংহিতা ও ২. তৈত্তিরীয়সংহিতা। এ উভয় অংশ ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে প্রায় দু সহস্র যজু আছে।

বৈশম্পায়ন, জাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নিজ শিষ্যকে যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। একদিন কোন কারণে বৈশম্পায়ন রেগে যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেন আমার নিকট যা অধ্যয়ন করেছো তা পরিত্যাগ করো। যাজ্ঞল্ক্য যোগ বলে বিদ্যাকে মূর্তিমতি করে উদ্বমন করলে বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষি হয়ে উদ্বান্ত যজুর্বেদ ভক্ষণ করেছিলেন।

এ উদ্বান্ত জযুর্বেদ বুদ্ধির মালিন্য হেতু কৃষ্ণরঙ হয়েছিলো তাই এটি "কৃষ্ণযজুঃ"।

যজুর্বেদ পরিত্যক্ত হওয়ায় দুঃখিত যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের আরাধনা করে তাঁর নিকট হতে "শুক্লযজুঃ' প্রাপ্ত হন। এ শুল্কযজুঃ জাবাল গৌধেয় কন্ব মধ্যন্দিন প্রভৃতি পঞ্চদশ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। মধ্যন্দিন মহর্ষি দ্বারা লব্ধযজুর্বেদের শাখা বিশেষকে মাধ্যন্দিন বলে। যাজ্ঞবল্ক্য যদিও অনেক শিষ্যকে যজুর্বেদ

উপদেশ দিয়েছিলেন তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় মাধ্যন্দিনি শাখা জনসমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মাধ্যন্দিন যজুর্বেদ যারা জানেন বা অধ্যয়ন করেন তাঁদেরকে মাধ্যন্দিন বলে।

যম

তিনি দক্ষিণের দিকপাল। সূর্যের ঔরসে এবং তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনি বৈবস্বত মনুর ভাই। স্বামির তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়াকে স্বামির কাছে রেখে পলায়ন করেন। কিন্তু ছায়া সংজ্ঞার সন্তানদের যথোচিত যত্ন করতেন না বলে যম রেগে গিয়ে বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করেন। বিমাতার শাপে তাঁর পদদ্বয় ক্ষত ও কীটদষ্ট হয়। যম বাবা সূর্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে সূর্য তাঁর ক্ষতস্থানের পুঁজ ও কীট ভক্ষণের জন্য যমকে একটি কুকুর দান করলেন। দুর্বল পায়ের জন্য যম মহিষ-বাহনে ভ্রমণ করতে বাধ্য হন। যম মর্তে বিদূররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। যম পতিব্রতা সাবিত্রির ব্যবহারে ও স্তবে তুষ্ট হয়ে তাঁর মৃত পতি সত্যবানকে জীবিত করেন এবং সাবিত্রির অন্ধ ও ক্ষমতাচ্যুত শ্বশুরকে চক্ষু ও রাজ্য ফিরিয়ে দেন। দক্ষ প্রজাপতির ১৩টি মেয়েকে যম বিয়ে করেন। যমের ঔরসে তাঁদের গর্ভে ১৩ টি ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তির গর্ভে যমের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। যমের পুরির নাম সংযমনী। সেখানে প্রাণিগণ সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগ করে। তাঁর সম্মুখে বিরাজ করেন ত্রিলোকসংহারক মৃত্যু, পার্শ্বে জমদগ্নি তুল্য মূর্তিমান কালদণ্ড, তাই তিনি দণ্ডধর নামে খ্যাত। দেবগণের মধ্যে যম সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান বলে তাঁর নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ। তিনি জীবের পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা। এ কার্যে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত আছেন পাপ-পুণ্যের হিসাব রক্ষক চিত্রগুপ্ত তাঁর মন্ত্রি। মানুষ মৃত্যুর পর নরকে গমন করলে, সেখানে মন্ত্রি চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা থেকে প্রত্যেকের পাপ-পুণ্যের বিবরণ বর্ণনা করেন। যমের দেহের রং সবুজ। তিনি রক্তরঙ পরিচ্ছদে ভূষিত। যমের দূতেরা মৃত আত্মাদের যমালয়ে নিয়ে আসেন। যমলোক মনুষ্যলোক থেকে ৮৬,০০০ যোজন দূরে অবস্থিত। যমরাজার পুরি চার হাজার যোজন দির্ঘ এবং দু হাজার যোজন বিস্তৃত। উচ্চ স্বর্ণময় প্রাচির দ্বারা এ পুরি বেষ্টিত।

যদু

যযাতি রাজার বড় ছেলে। দেবযানির গর্ভে তাঁর জন্ম। বাবার জরা গ্রহণে অস্বীকার করায় তিনি রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন। তা থেকেই খ্যাতিমান যদুবংশের উৎপত্তি হয়।

যযাতি

চন্দ্রবংশের নরপতি। তিনি মহারাজ নহুষের ছেলে। রাজা যযাতি একদিন শিকার করতে বনে গিয়ে জল খোঁজে ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে একটি কুয়ার নিকট উপস্থিত হয়ে এক পরমা সুন্দরি মেয়ে দেখতে পেলেন। পরে সযত্নে তাঁকে তুলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় শুক্রাচার্যের মেয়ে, দেবযানি জেনে তাঁকে বাবার কাছে পাঠান।

অন্য এক সময় যযাতি শিকারে এসে সখিগণে পরিবেষ্টিতা দেবযানিকে দর্শন করেন এবং শুক্রাচার্যের অনুমতিক্রমে উভয়ের বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। কালক্রমে দেবযানির গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্বসু নামে দু ছেলে জন্মে। রাজা যযাতি অনুরোধে দৈত্যরাজ দুহিতা শর্মিষ্ঠাকে গোপনে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে তাঁর দ্রুহ্য, অন্য ও পুরু নামে তিন ছেলে জন্ম গ্রহণ করে।

দেবযানি এ সমস্ত শুনে ক্রোধে রাজভবন পরিত্যাগ করে বাবার কাছে গিয়ে বাবাকে সমস্ত বিষয় জানিয়েছিলেন। শুক্রাচার্য রেগে "অকালে জরাগ্রস্ত হও" এ বলে যযাতিকে অভিশাপ দেন। রাজা অভিশপ্ত হয়ে শুক্রাচার্যের নিকট পুন পুন অনয়-বিনয় করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন যে, যযাতি ইচ্ছা করলে জরা পাত্রান্তরে সংক্রমিত করতে পারবেন এবং যে ছেলে জরা গ্রহণ করবে তাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করবেন।

পরে রাজা একে একে নিজ ছেলেদেরকে জরা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর ছোট ছেলে পুরু ব্যতীত অপর কেউই জরা গ্রহণ করতে স্বীকার করলো না। তখন তিনি নিজ জরা পুরুকে সমর্পণ করে পুন যৌবণ গ্রহণ করে ধর্মানুযায়ি বিষয় ভোগ করতে লাগলেন।

বহুদিন পরে বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হয়ে পুরুকে ডেকে নিজ যৌবন সহ রাজ্যাধিকার প্রদান করে তপস্যার জন্য বনবাসে গেলেন।

যুধিষ্ঠির

পাণ্ডু রাজার বড় ছেলে। পাণ্ডুর বনে অবস্থান কালে তাঁর অনুমতিতে ধর্মরাজের ঔরসে ও কুন্তির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। কালক্রমে পাণ্ডুর মৃত্যু হলে যুধিষ্ঠির মা ও ভিম প্রভৃতি ভাইদের সাথে হস্তিনাপুর গিয়ে থাকতে লাগলেন। ক্রমে অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করে কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রে শিক্ষিত হয়েছিলেন। এরপর যৌবরাজের অভিষিক্ত হয়ে যথানিয়মে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করতে লাগলেন। পরম ধার্মিক বলে তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হতে লাগলো। ভিম প্রভৃতি ভাইয়েরা তাঁকে বাবার ন্যায় মান্য করতেন এবং সর্বতোভাবে তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করতেন।

যুধিষ্ঠিরের সুখ্যাতি শুনে কৌরবগণ নিতান্ত ম্রিয়মাণ হলেন। কি উপায়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত করবেন এ কু-অভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ বারণাবতে যান। দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য পুরোচম নামে এক নিচ জাতি দ্বারা বারণাবতে একটি জতুগৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। বারণাবতে যাওয়ার সকল বিদুর তাঁদেরকে বিপদের কথা ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন। পরে বিদুরের পরামর্শে কাজ করে সে বিপদ হতে মুক্তি লাভ করে সেখান থেকে পলায়ন করেন।

এ সময়ে তাঁরা একচক্রা নগরিতে কিছুদিন থেকে ব্যাসদেবের আদেশে পাঞ্চাল দেশে যান। সেখানে এক কুম্ভকারের ঘরে বাসস্থান নির্দিষ্ট করে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন দ্রৌপদির স্বয়ম্বর বার্তা শুনে পাঁচভাই সে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন। সেখানে মহাবীর অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদিকে লাভ করলে পাণ্ডবগণ মার আদেশ অনুসারে সকলেই দ্রৌপদিকে বিয়ে করেন।

এ সময়ে পাণ্ডবদের সংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে প্রেরণ করে তাঁদেরকে আনেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে বাসস্থান নির্দেশ করে দেন। যুধিষ্ঠির ভাইয়েদের সাহায্যে ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন রাজধানি স্থাপন করে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। দ্রৌপদির গর্ভে তাঁর প্রতিবিন্দ্য নামে ছেলে জন্মে। এরপর কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞেয় অনুষ্ঠান করেন। সকল রাজা যজ্ঞকারির বশ্যতা স্বীকার না করলে রাজসূয় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না। এজন্য যুধিষ্ঠির প্রথমেই কৃষ্ণের সাথে ভিম ও অর্জুনকে প্রেরণ করে জরাসন্ধকে হত্যা করেন এবং নিজ ঘরে বন্দি নৃপতিগণকে মুক্তি দেন। এরপর মহা সমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এ যজ্ঞ দর্শনে দুর্যোধনের হৃদয়ে হিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। তিনি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য ক্ষয় করার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে দ্যুতক্রীড়ার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করার ছলে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করেন। ধর্ম রক্ষা করতে যুধিষ্ঠিরকে ঐ অক্ষক্রীড়ার পণ স্বরূপ ১২ বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিলো। তথাপি তিনি ক্ষণকালের জন্যও ধর্ম পথ হতে বিচ্যুত হননি। পরম ধার্মিক বলে যুধিষ্ঠির সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁদের বনবাস কালে ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে নানা পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণনা করে তাঁদের মনে শান্তি বিধান করতেন। এ সময় দুর্মতি দুর্যোধন পাণ্ডবদেরকে নিজ ঐশ্বর্য প্রদর্শনার্থ ঘোষ যাত্রা করে পাণ্ডবদের দুঃখ দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলো। পরে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সাথে

দুর্যোধনের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হলে ঐ যুদ্ধে দুর্যোধন সস্ত্রীক বন্দি হন। সে সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ভিম ও অর্জুনকে সেখানে পাঠান। তাঁরা গন্ধর্ব রাজের হাত হতে দুর্যোধনকে মুক্ত করেছিলেন। দ্রৌপদিকে অপহরণ করার অভিলাষি হয়ে জয়দ্রথ ভিমের হাতে ধরা পড়েন এবং লাঞ্ছিত হলে ধর্মরাজ তাঁকে ক্ষমা করে মুক্ত করেন। অজ্ঞাতবাস ও বনবাসে প্রতিজ্ঞা পালন করে যুধিষ্ঠির নিজ রাজ্য পুনপ্রাপ্তি জন্য দুর্যোধনের কাছে দূত পাঠান। ফলে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে আত্মীয় বন্ধুগণের উচ্ছেদে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। দুর্যোধন যখন কিছুতেই তাঁর বাক্যে স্বীকৃত হলো না, তখন অগত্যা তাঁকে যুদ্ধ করাই স্থির করতে হলো। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁর পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হয়।

১৮ দিন ধরে দু পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাঁর জীবনে কদাচ তিনি মিথ্যা বাক্য বলেননি, এজন্য দ্রোণবধের দিন "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এ বাক্য অতীব অনিচ্ছা সহকালে তাঁকে বলতে হয়েছিল। তিনি যুদ্ধের ১৮তম দিনে শল্যরাজকে হত্যা করেন। কৌরবকুলরূপ কাষ্ঠরাশি ভস্ম করে সমরানল নির্বাণ হলে যুধিষ্ঠির কথঞ্চিৎ শোকাপনোদনার্থ অতীব দুঃখিত মনে গান্ধারির দেখা করতে যান। শরশয্যাগত ভিস্মের নিকট হতে তিনি সদুপদেশ গ্রহণ করেন। এরপর যুধিষ্ঠির বহু শোক দুঃখ প্রকাশ করে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারি, কুন্তি ও বিদুর শেষ জীবন ঈশ্বরচিন্ত ায় অতিবাহিত করার জন্য বনে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে যদুবংশ ধ্বংস হলে কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করে দ্রৌপদি ও ভাইদের সাথে মহাপ্রস্থান করেছিলেন। তাঁরা ক্রমে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে হিমালয় অতিক্রম করে সুমেরু পর্বতে উপস্থিত হলে প্রথমে দ্রৌপদি, পরে সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভিম নিজ নিজ পাপের জন্য একে একে পতিত হয়েছিলেন। পরে একাকি যুধিষ্ঠির সশরিরে স্বর্গে চলে গেলেন।

যোগেশ্বর

মহাদেবের অপর নাম।

রক্তবীজ

রক্তবীজ অর্থ ডালিম ফল। দানবরাজ রম্ভের মৃত্যু হলে যক্ষরা তাঁর মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করেন। রম্ভের মহিষিও সহমরণে যাবার জন্য চিতারোহণ করেন।

চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হলে সে অগ্নি থেকে এক ভিষণাকার পুরুষ বেরিয়ে এলেন। সে ভয়ঙ্কর পুরুষের নাম রক্তবীজ। তিনি দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের জেনারেল ছিলেন। দেবির সাথে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধকালে রক্তবীজের সাথে দেবির সহচরিদের ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এর শরবিদ্ধ দেহ থেকে যত বিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়তো, তা থেকে রক্তবীজের মতো ভয়ঙ্কর বলবীর্য সমন্বিত তত মহাশূর তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হতেন। এজন্য ইন্দ্র নিজের বজ্র দিয়ে একে নিপাত করতে গেলে শত শত রক্তবীজের আবির্ভাব হয়েছিল। শেষে দেবি মহাশক্তি দেবতাদের বিপদ দেখে নিজের অঙ্গনির্মিতা ও অঙ্গীভূতা কালিকে বললেন, সমস্ত রক্তবীজ স্বরূপ দৈত্যকে ভক্ষণ করো এবং রসনা বিস্তার করে সমস্ত শোণিত পান করো। তা হলে রক্তবীজ নিঃশোণিত হয়ে আমার হাতে নিহত হবে। দেবি মহাশক্তি চামুণ্ডা ও কালির সাহায্যে রক্তবীজের নিপাত করেন।

রতি

যৌন আকাঙ্ক্ষার দেবি। তাঁর অন্যান্য নাম কামি, প্রীতি, কাম-পত্নী, কামকলা, কামপ্রিয়া, রাগলতা, মায়াবতি, কেলিকলা, সুভঙ্গি, ইত্যাদি। তিনি কামদেবের স্ত্রী ও দক্ষের মেয়ে। কালিকা পুরাণে আছে, প্রজাপতি দক্ষ নিজের মেয়ে রতিকে দেখিয়ে কামদেবকে বললেন, এ আমার দেহজাত মেয়ে এবং গুণে তোমার অনুরূপ; ধর্মতঃ তোমার সহচারিণী এবং কার্যত তোমার বশবর্তিনী হবে। দক্ষ এ বলে নিজের শরির হতে স্বেদজলসম্ভূতা মেয়েকে রতি নাম দিয়ে কামদেবের হাতে সমর্পন করলেন। এ কামপত্নীকে দেখে দেবতারা এর অনুরক্ত হন। মহাদেবের কোপে কামদেব ভস্মিভূত হলে রতি স্বামিকে পুনর্জীবিত করার জন্যে মর্ত্যলোকে মায়াবতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

রত্নাকর

রামায়ণ রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি পূর্বে 'রত্নাকর' নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি করে সংসার নির্বাহ করতেন। একবার দেবর্ষি নারদকে হত্যা করতে উদ্যত হলে নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বাবা-মা-স্ত্রী-ছেলে সকলে তাঁর এ পাপের ভাগ নেবেন কিনা। তখন রত্নাকর বাবা-মা প্রভৃতি আত্মীয়দের এ প্রশ্ন করলে তাঁরা সকলেই তাঁর পাপের ভাগ নিতে অসম্মত হলেন। তখন রত্নাকরের চৈতন্য এবং তিনি নারদের কাছে রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। বহুকাল তপোনিরত থাকায় তাঁর সমস্ত শরির উইপোকার মাটিতে (বল্মীক) আবৃত হয়। রত্নাকর তপস্যাকালে বাল্মীকে আবৃত হয়েছিলেন বলে তৎার নাম হয় বাল্মীকি। সরস্বতীর বর ছেলে হয়ে বাল্মীকি অসাধারণ কবিত্ব লাভ করলেন

এবং নারদের আদেশে রামায়ণ রচান করেন। তমসাতটে বিচরণকালে মিথুন বিহাররত এক ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চকে এক ব্যাধ তাঁর সমক্ষে বধ করে। তাতে ক্রৌঞ্চী সংগমরত পক্ষীর বিচ্ছেদে করুণস্বরে বিলাপ করতে থাকে। এ দৃশ্য দর্শনে করুণাপরবশ বাল্মীকে এ বলে ব্যাধকে অভিশাপ দিয়ে ওঠেন–

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং
ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ
কামমোহিতম্॥"

–নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা-লাভ করবি না, কারণ তুই ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।

জগতে এ প্রথম ছন্দবদ্ধ শ্লোক রচিত হলো। তাই বাল্মীকি আদি কবি নামে খ্যাত। এরপর ব্রহ্মা তাঁর আশ্রমে এসে তাঁকে রামচরিত বিবৃত করে রামায়ণ রচনা করতে বলেন এবং বাল্মীকি রামের ছেলে কুশ ও লবকে সে রামায়ণ-গান করতে শেখান। রামের অশ্বমেধযজ্ঞ সভায় আমন্ত্রিত হয়ে কুশ ও লব রামায়ণগান করে পৃথিবীতে রামায়ণ প্রচার করেন। গর্ভবতি সীতা রাম দ্বারা নির্বাসিতা হয়ে বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর যমজ ছেলে কুশ ও লব এ আশ্রমেই জন্মলাভ করেন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে সর্ববিদ্যা দান করে অস্ত্রবিদ্যায়ও সুশিক্ষিত করেন।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া ধরে কুশ ও লব যুদ্ধে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও শেষে রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। সীতা তখন শোকে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। তখন বাল্মীকি তীর্থ-দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি এ সঙ্কটকালে ফিরে এসে রামচন্দ্রাদিকে পুনর্জীবিত করেন। রামের অশ্বমেধযজ্ঞে কুশ ও লব রামায়ণ-গান করে জনসমক্ষে রামায়ণ প্রচার করেন।

রম্ভা

রম্ভা স্বর্গের এক প্রধানা অপ্সরা। বিভিন্ন পুরাণে এ অপ্সরার সৌন্দর্য ও সঙ্গীত পারদর্শীতার সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আছে। রম্ভা মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় আবির্ভূত হয়। একবার রম্ভা কুবেরের পুত্র নলকূবরের নিকট অভিসার গমনকালে রাবণ তাঁকে দেখে কামমুগ্ধ হয়ে বলপূর্বক ধর্ষণ করেন। রম্ভা নলকূবরকে এ বৃত্তান্ত জানালে নলকূবর রাবণকে অভিশাপ দেন, কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তার প্রতি বল প্রয়োগ করতে গেলে রাবণের মস্তক সাত খণ্ডে ভগ্ন হবে। এ জন্যই সীতা রাবণ দ্বারা অপহৃতা হয়েও নিজের

সতীত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হন। (রামায়ণ–উত্তর)। একবার ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করার জন্য অপ্সরা রম্ভাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর শাপে রম্ভা শিলাতে পরিণত হয়ে ১০০০ বৎসর অবস্থান করেন। (রামায়ণ– উত্তর, মহাভারত– অনু)

রম্ভা যখন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে শিলারূপে বাস করছিলেন তখন অঙ্গারিকা নামে একজন রাক্ষসি সেখানে নানা উপদ্রব করতে আরম্ভ করে। তখন ঐ আশ্রমে তপস্যারত শ্বেতমুনি বায়ব্য অস্ত্রে ঐ শিলাখণ্ড যোজনা কপিতীর্থে এলে তার মস্তকে সে শিলাখণ্ড পড়ে তার মৃত্যু হয়। ঐ শিলাখণ্ড কপিতীর্থে নিমগ্ন হলে রম্ভা আবার নিজরূপ ফিরে পান। (স্কন্দ পুরাণ)

ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালে রম্ভার তালভঙ্গ হয়। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের শাপে স্পন্দনহীন বিকলাঙ্গ হয়ে রম্ভা ভূতলে পতিত হন। পরে নারদের পরামর্শে শিবের পূজা করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যেতে পারেন। (স্কন্দ পুরাণ)

ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা জাবালি মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে রম্ভার এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জাবালি এ মেয়েকে প্রতিপালন করেন; মেয়ের নাম ফলবতি। (স্কন্দ পুরাণ)

রাক্ষস

রাক্ষসদের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে এরূপ লেখা আছে– পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করেন। তারপর প্রাণিগণকে সৃষ্টি করে বললেন– তোমরা সযত্নে এ জল রক্ষা কর। একদন বললো, 'রক্ষামঃ' আমরা রক্ষা করব। ব্রহ্মার আদেশে তারা রাক্ষস হোল। আর একদল? বললো, যক্ষামঃ– আমরা পূজা করবো; তারা যক্ষ হোল।

বিষ্ণুপুরাণ মতে কশ্যপ ও দক্ষের মেয়ে খসা হতে রাক্ষসদের জন্ম। রামায়ণ ও মহাভারতের মতে আর্যদের আগমনের পূর্বে যে জাতি এদেশে বাস করত, তারা অনার্য এবং তাদের রাক্ষস বলা হত। আর্যরা যুদ্ধ করে এ অনার্য রাক্ষসদের পরাজিত করেছিলেন। সাধারণত, রাক্ষসদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছেণ প্রথম শ্রেণিকে অনেকটা যক্ষদের মতো বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণি অত্যন্ত শক্তিশালি, এরা দেবতাদের শত্রু; তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত হচ্ছে দানব ইত্যাদিরা। এরা সাধারণত নিষিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করে, যজ্ঞ ইত্যাদি নষ্ট করে, শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়, সাধু ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করে, মানুষদের ভক্ষণ করে এবং সমস্ত মানুষকে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করে। এ শ্রেণিভুক্ত রাক্ষসদের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাবণ।

বর্ণিত আছে যে, শিব ও পার্বতি একবার রাক্ষসদের এ বর দিয়েছিলেন, রাক্ষসিরা গর্ভ ধারণ মাত্রই সন্তান প্রসব করবে, এবং সে সন্তান মার সমকক্ষ হবে। মহাভারতে ভিম দ্বারা বক, কির্মীর ও হিড়িম্ব রাক্ষসদের বিনাশ এবং হিড়িম্বাকে বিয়ে করা দেখতে পাওয়া যায়। ভিমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

রাধা

(১) কৃষ্ণপ্রেমিকা গোপবালা। বৃষভানুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী কলাবতির গর্ভে রাধার জন্ম। আয়ান ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে তিনি কৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার কোনরূপ উল্লেখ নাই। কৃষ্ণপ্রেমিকা এক সখির উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবি ভাগবত ও পদ্মপুরাণে রাধার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে, গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হতে রাধা উদ্ভূতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রি দেবি। রাধা আবির্ভাব মাত্রই ষোড়শ বৎসর বয়স্কা ও নবযৌবনসম্পন্না হন এবং রত্ন-সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে আসীন হন। এ সময় রাধার লোমকূপ হতে লক্ষ কোটি গোপিকা ও কৃষ্ণের লোমকূপ হতে সেরূপ গোপ এবং গোসমূহ আবির্ভূত হয়। গোলোকে রাধার এরূপে জন্ম হয়। এ গোলোকের রাধা পরে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেমন করে তিনি বৃন্দাবনে এলেন, সে সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এরূপ লেখা আছে। একবার শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের বৃন্দাবনের রম্যবনে রমণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা হওয়া মাত্র তাঁর দেহ হতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণ মূর্তি ও বাম অঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করলেন। রাধা নিজের স্বামিকে কামাতুর দেখে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। এজন্য তাঁর নাম হল রাধা। 'রা' অর্থে লাভ করা, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করা এবং 'ধা' অর্থে ধাবমান হওয়া-হরির পদে ধাবমান হওয়া। এ রাধা সুদামের শাপে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মর্ত্যে জন্মগ্রহণের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা গোলোকে অবস্থান করেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ একবার রাধিকাকে বঞ্চনা করে বিরজা নামে এক গোপিনির সঙ্গে মিলিত হন। চারজন দূতী এ সংবাদ রাধিকাকে দিলে, তিনি সঙ্গিসহ কৃষ্ণের অনুসন্ধান করেন। কৃষ্ণসখা সুদামা রাধার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণকে দিয়ে পলায়ন করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভয়ে বিরজাকে ত্যাগ করে অন্তর্হিত হন। বিরজা ক্রোধে প্রাণত্যাগ করে নদী-রূপে প্রবাহিত হলেন। রাধা সে স্থানে কাহাকেও না দেখে স্বস্থানে ফিরে আসেন। পরে কৃষ্ণের দেখা পেয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। সুদামা কৃষ্ণের প্রতি রাধার এ আচরণ সহ্য করতে

না পেরে রাধাকে তিরস্কার করেন। এতে রাধা রেগে গিয়ে সুদামাকে অসুরযোনি লাভ করার অভিশাপ দেন। সুদামাও রেগে গিয়ে রাধাকে অভিশাপ দেন, তুমি গোলোক হতে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে গোপগৃহে শতবর্ষ কৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করবে। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার ধারণের জন্য তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। রাধার অভিশাপে সুদামা অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে শঙ্খচূড় নামে খ্যাত হলেন আর সুদামার শাপে রাধা বৃষভানু-মেয়েরূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

রাধাকৃষ্ণ লীলা ভারতীয় ধর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জ্ঞান ব্যতিরেকে 'ভক্তির' সাহায্যে ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়– রাধা ও গোপীদের জীবনের এ মূলসূত্র। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি অনন্তের আহ্বানের প্রতীকঃ শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, আর রাধা মানবাত্মা।

(২) সারথি অধিরথের স্ত্রী এবং কর্ণের পালিকা মা। একদিন স্বামিসহ রাধা নদীতে স্নান করার সময় একটি মঞ্জুষা জলে ভেসে আসছে দেখতে পান। রাধার অনুরোধে অধিরথ সেটি জল হতে তুলে নিয়ে এলে তার মধ্যে সদ্যঃপ্রসূত এক শিশু দেখতে পান। রাধা এ শিশুকে সযত্নে পালন করেন। এ শিশুই পরে কর্ণ নামে খ্যাতিমান হন। পালিকা মার নাম অনুসারে কর্ণের আর এক নাম 'রাধেয়'।

(৩) বৃষভানুর স্ত্রী কলাবতি বায়ু গর্ভধারণ করেন। কালে কলাবতি বায়ু প্রসব করলে অযোনিসম্ভূতা রাধার জন্ম হয়। ১২ বৎসর পরে বৃসভানু আয়ান ঘোষের সঙ্গে রাধার বিয়ে দেন। রাধা তাঁর নিজের ছায়া স্থাপন করে অদৃশ্য হন। এ ছায়ার সঙ্গেই আয়ানেরবিয়ে হয়। ১৪ বৎসর অতীত হলে শ্রীকৃষ্ণ কংস বধের জন্য বালকরূপে গোকুলে এলেন। আয়ান ঘোষ শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার সহোদর এবং গোলাকে রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা সকলের কাছে পরিচিত।

রাবণ

ব্রহ্মার ছেলে পুলস্ত্য, পুলস্তের ছেলে বিশ্বশ্রবা। এ বিশ্বশ্রবামুণির ঔরসে ও সুমালি-মেয়ে কৈকসি (তাঁর অন্য নাম নিকষা) রাক্ষসির গর্ভে ১. রাবণ, ২. কুম্ভকর্ণ ও ৩. বিভীষণ, এ তিন ছেলে এবং ৪. শূর্পনখা নামে এক মেয়ের জন্ম হয়। লঙ্কা রাক্ষসদের বাসভূমি ছিলো। এ রাক্ষসের সঙ্গে বিষ্ণুর ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাক্ষসেরা ১. অতল, ২. বিতল, ৩. সুতল, ৪. তলাতল, ৫. মহাতল, ৬. রসাতল প্রভৃতি পাতালে আশ্রয় নেয়। এ রাক্ষসদের মধ্যে সুমালি রাক্ষসের কৈকসি নামে এক পরমাসুন্দরি মেয়ে ছিলো। সুমালি মেয়ের বিয়ে স্থির করার জন্য পাতাল থেকে মর্তলোকে বেরিয়ে এসে মনে মনে স্থির করেন মেয়ের এমন বিয়ে দিতে হবে যেনো মেয়ের সন্তান বিষ্ণুকে দমন করতে

পারে। তিনি তখন পুলস্ত্যছেলে বিশ্বশ্রবাকে স্বামিরূপে বরণ করার জন্য মেয়েকে বললেন, যেনো এ বিয়ে থেকে অমিততেজা শত্রু দমনে সমর্থ এক ছেলে হয়। বিশ্বশ্রবার কাছে গেলে তিনি এ মেয়ের ইচ্ছে তপঃপ্রভাবে জানতে পেরে বললেন, কৈকসি ছেলেলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এসেছেন, কিন্তু দারুণ প্রদোষকালে আসায় কৈকসির ছেলেগণ দারুণ ক্রূরকর্মা রাক্ষস হবেন তখন কৈকসি অনুনয় বিনয় করে উত্তম ছেলে প্রার্থনা করলে বিশ্বশ্রবা বললেন, তোমার কনিষ্ঠ ছেলে আমার বংশানুরূপ ও ধর্মশীল হবেন। এরপর বিশ্বশ্রবার সাথে কৈকসির বিয়ের ফলে এক বীভৎস রাক্ষসের জন্ম হলো। এ ছেলেই রাবণ। তাঁর দশটি মস্তক, কুড়িটি বাহু, ঘোর কালো রঙ, কেশ প্রদীপ্ত, লোহিতরঙ ওষ্ঠ ইত্যাদি। পরে কৈকসির গর্ভে মহাবল কুম্ভকর্ণ ও ধর্মাত্মা বিভীষণের জন্ম হয়। আর মেয়ের নাম হয় শূর্পণখা। কুবের বিশ্রবার অন্য স্ত্রীর ছেলে। সপত্নী-ছেলে কুবেরের ঐশ্বর্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে কৈকসি নিজের ছেলেদের এ তপস্যা করতে বলেন যে, তারা যেনো কুবেরের ঐশ্বর্য ও তেজ পান। কুবের রাবণের বৈমাত্র ভাই। তিনি যক্ষদের ও রাবণ রাক্ষসদের রাজা। মার উপদেশে তিন ভাই ব্রহ্মার ঘোরতর তপস্যা করতে থাকেন। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চাইলে রাবণ অমরত্বের বর চাইলেন। কিন্তু ব্রহ্মা অসম্মত হলে রাবণ দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদির অজেয় ও অবধ্য হবার বর চাইলেন। মানুষদের তিনি তৃণতুল্য জ্ঞান করেন বলে– এ সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ নেই। ব্রহ্মা রাবণকে এ বরই দিলেন। বিভীষণ প্রার্থনা করলেন নিরতিশয় বিপদে পড়লেও যেনো তাঁর ধর্মে মতি থাকে। কুম্ভকর্ণ নিদ্রা সুখে জীবন কাটাবার বর পেলেন। দানব-শিল্পি ময়দানবের মেয়ে মন্দোদরির গর্ভে রাবণের ঔরসে মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করলেন। বর পেয়ে রাবণ পৃথিবী জয়ের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। সে সময় লঙ্কা রাজ্য বৈমাত্র ভাই কুবেরের অধীনে ছিল। প্রথমেই লঙ্কায় এসে কুবেরকে বিতাড়িত করে তিনি রাক্ষস-রাজ্য স্থাপন করেন এবং ভাইর পুষ্পক রথ অধিকার করেন। কুবের কৈলাস পর্বতে অলকানগরি নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। কেবলমাত্র কার্তবীর্যার্জুন ও কিষ্কিন্ধ্যার বানর– রাজ বালির হাতে তিনি পরাজিত হন। তিনি মহারাজ মান্ধাতাকে পরাজিত করতে না পেরে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। পাতালে বলিরাজের নিকটও রাবণ লাঞ্ছনা ভোগ করেন। মুণি বর নারদের প্ররোচনায় রাবণ মৃত্যু অধিপতি যমের সাথে যুদ্ধ করেন। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁদের যুদ্ধ নিবারণ করেন। একবার কৈলাসের নিকট দিয়ে পুষ্পক রথে যাবার সময় রাবণের রথের গতি রুদ্ধ হয়। শিবের অনুচর নন্দি রাবণকে বলেন, হর-পার্বতি এখানে আছেন– এ স্থান সকলের অগম্য।

নন্দির বানর মুখ দেখে রাবণ অবজ্ঞায় হাস্য করায় নন্দী অভিশাপ দেন যে, তাঁর তুল্য বানরদের হাতেই রাবণের বংশ লোপ হবে।

রাবণ তখন বাহু বলে কৈলাস পর্বত উত্তোলন করতে থাকেন। পার্বতি চঞ্চল হয়ে শিবকে আলিঙ্গন করাতে শিব পায়ের আঙ্গুলের চাপে রাবণকে পীড়িত করলেন। তাতে রাবণ স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এ ত্রিলোক কম্পিত করে ভিষণ গর্জন করে ওঠেন। অমাত্যদের পরামর্শে রাবণ মহাদেবের স্তব করাতে মহাদেব রাবণকে মুক্ত করেন এবং বলেন পর্বতের ভাবে পীড়িত ও দারুণ রব করার জন্য তাঁর নাম রাবণ হবে। মহাদেব রাবণকে 'চন্দ্রহাস' নামক এক দীপ্ত খড়্গ দান করেন। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে রাবণ যুদ্ধ করেন এবং রাবণছেলে মেঘনাদ যুদ্ধে ৩৩ কোটি দেবতার রাজা ইন্দ্রকে পরাজিত করে বন্দি অবস্থায় লঙ্কায় নিয়ে আসেন। বিশ্ব স্রষ্টা ব্রহ্মার অনুরোধে দেবরাজ ইন্দ্র মুক্তিলাভ করেন। এ কার্যের জন্য মেঘনাদের নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। লঙ্কারাজ রাবণ ক্রমশ অত্যাচারি হয়ে দেব, দানব ও ঋষিকন্যাদের অপহরণ করতে থাকেন। বৃহস্পতি ছেলে মহর্ষি কুশধ্বজের মেয়ে তপোনিরতা বেদবতিকে অপহরণ করতে উদ্যত হলে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন এবং পুনর্বার কোন ধার্মিকের অযোনিজা মেয়েরূপে জন্মগ্রহণ করে রাবণবধের কারণ হবেন বলে রাবণকে অভিসম্পাত দেন। এ অভিসম্পাৎকারি মেয়েই সীতা।

রাবণ রাজা মরুতের যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞে আগত সকল ঋষিদের খেয়ে ফেলেন। ১. সুরথ, ২. গাধি, ৩. গয় ও ৪. পুরুরবা প্রভৃতি রাজা রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। অযোধ্যাপতি সম্রাট অনরণ্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। রাবণ দ্বারা নিহত হবার পূর্বে তিনি অভিসম্পাত দেন, তাঁরই বংশজাত রাম রাবণকে হত্যা করবেন। নলকুবেরের নিকট অভিসারে গমনকালে রম্ভাকে সবলে ধর্ষণ করার জন্য নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দেন, কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রয়োগ করলেই তৎক্ষণাৎ রাবণের মৃত্যু হবে। রাবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে নাগগণকে পরাভূত করেন এবং নিবাতকবচ নামে দৈত্যদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হন। ব্রহ্মার বরে উভয়েই সুরাসুরের অজেয় হওয়ায় ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় পরস্পরের মধ্যে সন্ধি হয়। রাবণ বরুণ ছেলেদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। অশ্মনগরে চারশত কালকেয় দানবদের যুদ্ধে হত্যা করার সময় রাবণ-বোন শূর্পণখার স্বামি সেনাপতি বিদ্যুজ্জিহ্বও নিহত হন। একমাত্র বোন এরূপে বিধবা হলে রাবণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করার অনুমতি দেন। সে সময় পিতৃসত্য পালনার্থ অযোধ্যাপতি দশরথের ছেলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে পঞ্চবটিতে কুটির নির্মাণ করে বনবাস কাল পূর্ণ করছিলেন। শূর্পণখা রামের প্রণয়িনী হয়ে সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ তাঁর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন

করেন। শূর্পণখার অধীনস্থ রাক্ষস জেনারেল খর ও জেনারেল দূষণ সসৈন্যে রামের হাতে নিহত হয়। শূর্পণখা লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে সমস্ত সংবাদ রাবণকে দিয়ে সীতা হরণে উত্তেজিত করেন। রাবণ পঞ্চবটিতে উপস্থিত হয়ে তাড়কা রাক্ষসির ছেলে জেনারেল মারিচের সাহায্যে সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। মারিচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার সামনে বিচরণ করে। রাম সীতার অনুরোধে তাকে ধরতে বহু দূর চলে যান। অবশেষে তাকে হত্যা করার জন্য বাণ নিক্ষেপ করলে মারিচ রামের স্বর অনুকরণ করে কাঁদতে থাকে। সীতার অনুরোধে লক্ষ্মণ তাঁকে একাকি রেখে রামের অনুসন্ধানে গেলে, রাবণ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকেন। এতে নিষ্ফল হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করে রাবণ সবলে সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময়ে জটায়ু পথিমধ্যে তাঁকে আক্রমণ করলে রাবণ তাঁর পাখা ছেদ করে জটায়ুকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে যান। পথে সীতা ঋষ্যমুক পর্বতে সুগ্রীব প্রভৃতি বানরদের উদ্দেশে নিজের অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করেন। লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে সীতাকে বশে আনার জন্য রাবণ বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু অসমর্থ হয়ে তাঁকে অশোকবনে বন্দিনি করে রাখেন এবং তাঁকে বশীভূত করার জন্য বহু রাক্ষসি নিযুক্ত করেন। রাবণ সীতাকে বলেন, দশ মাসের মধ্যে রাবণের বশিভূতা না হলে তিনি তাঁকে খেয়ে ফেলবেন। নলকুবেরের শাপের ভয়ে রাবণ সীতার উপর বলপ্রয়োগ করেন নি। রাম-লক্ষ্মণ সীতার খোঁজে বেরিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতা করেন এবং হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার সংবাদ আনয়ন করেন। সেখানে হনুমান অশোকবন তছনছ করে ও লঙ্কা পুড়িয়ে রামের বানর-সেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হন। তখন রাবণ রাক্ষসদের সাথে পরামর্শ করেন। বিভীষণ রাবণকে সীতা প্রত্যার্পণের পরামর্শ দিলে রাবণ তাঁকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দেন। ক্ষিপ্ত বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করেন। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আটক করেন, কিন্তু গরুড়ের সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণ মুক্ত হন। তারপর ১. জেনারেল ধূম্রাক্ষ, ২. জেনারেল বজ্রদংষ্ট্র, ৩. জেনারেল অকম্পন ও ৪. জেনারেল প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষস সেনানী রামের হাতে নিহত হন। কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করে যুদ্ধে পাঠানো হলে কুম্ভকর্ণও নিহত হন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হত্যা করেন। অবশেষে রাম-রাবণে ঘোরতর যুদ্ধ হলে রাবণ নিহত হন।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, রাবণের দশ মাথা, কুড়ি হাত ও তাম্ররঙ কুড়ি চোখ ও চাঁদের মতো উজ্জ্বল দাঁত ছিলো। রাজকিয় স্বভাব থাকলেও দেহের নানা স্থানে দেবতাদের সঙ্গে নানা প্রকার যুদ্ধের দরুণ ক্ষতের চিহ্ন ছিলো। ইন্দ্রের বজ্র,

ঐরাবৎ, বিষ্ণুব চক্র তাঁর দেহে নানা প্রকার ক্ষত চিহ্ন করেছিলো। তিনি পর্বতের চূড়াকে খণ্ডিত করতে বা সমুদ্রকে আলোড়ন করতে পারতেন। পর্বতের মতো লম্বা হওয়াতে তিনি হাত দিয়ে সূর্য বা চাঁদের গতিরোধ করতে পারতেন। তিনি এত গর্বিত ও অহঙ্কারি ছিলেন যে নিজের প্রতিরক্ষার জন্য কখনও মানুষের বা কোন জন্তুর সাহায্য চান নি। তাই বিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহন করে রাবণকে হত্যা করেন।

রামচন্দ্র

সূর্যবংশিয় অযোধ্যার রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ লব্ধ জ্যেষ্ঠ ছেলে। দশরথের তিন রানির গর্ভে চার পুত্রের জন্ম হয়। তার মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে কৈকেয়ির গর্ভজাত ভরত ও সুমিত্রার গর্ভজাত রক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। রামের চৌদ্দ বৎসর বয়ক্রমকালে বিশ্বামিত্র রাক্ষসদের হাত হতে যজ্ঞ-রক্ষা করার জন্যে দশরথের অনুমতিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণকে নিজের আশ্রশে নিয়ে যান। রামকে তাড়কা ও অন্যান্য রাক্ষসদের নিহত করে মহর্ষির যজ্ঞ সম্পন্ন করাতে বলা ও অতিবলা বিদ্যা ও দিব্যাস্ত্র সকল দান করেন। তারপর বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণসহ মিথিলা যাত্রা করেন। পথে তাঁরা গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হলে, গৌতমের শাপে সকলের উপস্থিত হলে, গৌতলের শাপে সকলের অদৃশ্য অহল্যাকে রাম শাপমুক্ত করেন। মিথিলায় পিতা রাজার আতিথ্য গ্রহণ করে বিশ্বামিত্রের পরামর্শে জনকের হরধনু ভঙ্গ করে রাম জনকের বীর্যশুল্কা মেয়ে সীতাকে বিয়ে করেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কনিষ্ঠা বোন উর্মিলার বিয়ে হয়। জনকের ভাই কুশধ্বজের দু মেয়ের সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিয়ে হয়। শিবের হরধনু ও ভঙ্গ করার সময় বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জীবিত ছিলেন। তিনি শিবের শিষ্য ছিলেন। সে জন্য হরধনু ভঙ্গ করতে রামের উপর তিনি কুপিত হন। দু জনেই বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্ত্বেও পরশুরাম রামকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং রামের হাতে পরাজিত হন। কিছুকাল পরে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করেন। এ সংবাদে দাসি মন্থরার প্ররোচনায় দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী ভরত কৈকেয়ি ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়েন। আশৈশব রামকে স্নেহ করলেও মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ি দশরথের পূর্ব প্রতিজ্ঞার সুযোগে, এক বরে ভরতের যৌবরাজ্য লাভ ও আর অন্য বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাসের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অনুসরণ করেন।

পিতৃসত্য পালনার্থ রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে বন্ধু নিষাদরাজ গুহের সাহায্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হন। প্রয়াগের নিকট ভরদ্বাজমুনির আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তাঁর পরামর্শে দণ্ডকারণ্যের চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে থাকেন। রামের বনগমনের পর দশরথ ছেলেশোকে প্রাণত্যাগ করেন। ভরত রাজ্যলোভ ত্যাগ করে রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য চিত্রকূটে উপস্থিত হন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসকাল পূর্ণ করার সঙ্কল্প স্থির রাখেন। তাতে ভরত রামের পাদুকা তাঁর প্রতীকস্বরূপ সিংহাসনে স্থাপন করে রামের প্রতিনিধিরূপে নন্দিগ্রামে বাস করে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। এরপর এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে বাস করে রাম নির্বাসনের দশ বৎসর কাটিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। অগস্ত্য মহা সমাদরে অতিথি-সৎকার করে রামকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মাস্ত্র ও অক্ষয় তূণির দান করলেন। মহর্ষির উপদেশানুসারে রাম গোদাবরী তীরে পঞ্চবটি বনে কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। তখন এ বন রাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। রাবণের বিধবা বোন শূর্পণখা এ বনে বাস করত। এ রাক্ষসী রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রণয় নিবেদন করলে রাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও বিতাড়িত হয়ে সীতাকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। রামের আদেশে লক্ষ্মণ এ রাক্ষসির নাক ও কান কেটে দিলে। তারপর শূর্পণখার দু ভাই খর ও দূষণ রামকে আক্রমণ করলে, রাম তাদের দুজনকে এবং সমস্ত সেনাকে বধ করে পঞ্চবটি বন রাক্ষসশূন্য করেন। শূর্পণখা তখন তাঁর ভাই রাবণের নিকট সমস্ত সংবাদ নিবেদন করল। রাবণ সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে ও বোনর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাড়কা রাক্ষসির ছেলে মারীচের সঙ্গে পঞ্চবটি বনে উপস্থিত হলেন। মায়াবি মারিচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতার সম্মুখে ভ্রমণ করতে লাগলো। সীতা তখন রামকে ঐ স্বর্ণহরিণ এনে দিতে অনুরোধ করায়, রাম লক্ষ্মণকে কুটিরে রেখে স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করে হরিণকে শরাঘাত করলেন। শরবিদ্ধ মারিচ রামের স্বর অনুসরণ করে 'হা লক্ষ্মণ, হা সীতা' বলে প্রাণত্যাগ করল। এ কাতরোক্তি শুনে রামের বিপদ আসন্ন ভেবে সীতা লক্ষ্মকে রামের অনুসন্ধান করতে প্রেরণ করলেন। এ সুযোগে রাবণ গুপ্তস্থান হতে পরিব্রাজকবেশে উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক সীতাকে নিজের রথে চড়িয়ে লঙ্কার দিকে প্রস্থান করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এসে কুটির শূন্য দেখে সীতা খোঁজে যাত্রা করে পথে মস্তকহীন কবন্ধকে হত্যা করলে তার অশরিরী আত্মা বানর রাজা সুগ্রীবের সাহায্য গ্রহণ করতে বললেন। সুগ্রীবকে তার ভাই বালীর হাত হতে হৃতরাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার উদ্ধারে সাহায্য করতে রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হলো। এর ফলে সীতা উদ্ধারে সমস্ত বানরকুল ও হনুমানের সাহায্য পেলেন।

লঙ্কায় উপস্থিত হলে রাবণের কনিষ্ঠ ভাই বিভীষণ সীতাকে মুক্তি দেবার জন্য রাবণকে বলেন। এত রাবণ রেগে গিয়ে বিভীষণকে অপমানিত করলে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করলেন। তাঁর স্ববংশে সংহার করে সীতাকে উদ্ধার করলেন ও বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সীতার সম্বন্ধে রাম বললেন, চরিত্ররক্ষা, অপবাদ খণ্ডন এবং তাঁর খ্যাতিমান বংশের গ্লানি দূর করার জন্য সীতাকে বর্জন করলেন। এ অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। তখন সীতা প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে অগ্নিতে স্বর্ণ-প্রতিমা সীতা বিলীন হয়ে গেলেন। তারপর অগ্নি সীতাকে রামরে নিকট ফিরিয়ে দিয়ে সীতার সুচরিত্র ও সতীত্বের প্রমাণ করে দিলেন।

এরূপে চৌদ্দ বৎসরের পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলে ভরত রামের হাতে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করলেন। তখন রাম রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। এ সময়ে তিনি শুনতে পেলেন, সীতার দির্ঘকাল রাবণের গৃহে একাকি বন্দিনী থাকায় প্রজারা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে নানারকম কুৎসা রটনা করছে। সীতাকে নিজে সতী জেনেও প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য রাম লক্ষ্মণকে বললেন, সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করে আসতে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ এ আদেশ পালন করলেন। তখন সীতা পূর্ণগর্ভা ছিলেন।

এরপর রাম অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যক্তা হবার পর তাঁর দু যমজ পুত্রের জন্ম হয়। মহর্ষি এদের নাম দিলেন লব ও কুশ। বাল্মীকি কুশ ও লবকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিলেন। রামের অশ্বমেধযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে বাল্মীকি লব ও কুশের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। লব-কুশের রামায়ণ গান শুনে রাম মুগ্ধ হলেন এবং এদের আকার ও অবয়ব দেখে নিজের ছেলে বলে বুঝতে পারলেন। বাল্মীকির কাছে সীতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা শুনে রাম সীতাকে রাজ সভায় আনতে বললেন। বাল্মীকি সীতাকে আবার অযোধ্যায় এনে বললেন, রাম, তুমি,লোকাপবাদে ভীত, এখন আজ্ঞা করো, সীতা তোমায় প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। তখন সীতা অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে মা বসুধার কোলে স্থান পাবার জন্যে প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হল এবং সীতা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেনস। সীতাকে হারিয়ে রাম বিষণ্ন চিত্তে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন সময় একদিন কালপুরুষ তাঁর কাছে এসে গোপনে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এ গোপন কথাবার্তার সময়ে কেউ সেখানে উপস্থিত হলে রাম তাকে বর্জন করবেন, এরূপ স্থির ছিলো। লক্ষ্মণ প্রহরীরূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হয়ে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ সাক্ষাৎকারে বাধা দিলে তিনি লক্ষ্মণকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন লক্ষ্মণ

বাধ্য হয়ে রামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাম সত্য বাক্য পালনের জন্য লক্ষ্মণকে বর্জন করতে বাধ্য হলেন। বর্জিত হবার পর লক্ষ্মণ সরযূ সলিলে আত্মবিসর্জন করেন। প্রিয় ভাইকে বর্জন করার পর রাম শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে কুশকে কোশলের ও লবকে উত্তর কোশলের রাজা করে সরযূতে প্রবেশ করে যোগবলম্বনে প্রাণ ত্যাগ করেন। রামায়ণ মহাকাব্যে রামের চরিত্র অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় বিচিত্র ও জটিল ভাব ধারণ করেছে। রামচন্দ্র ছেলেরূপে, মিত্ররূপে, প্রভুরূপে, স্বামিরূপে, প্রাজাপালক রাজারূপে ও মহাশূররূপে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। এ সকল সদগুণাবলির জন্য তিনি পুরুষোত্তম মূর্তিতে যুগ-যুগান্ত সকলের হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু রাম চরিত্র কয়েকটি আপাতবৈষম্য ও জটিল রহস্যে পূর্ণ। তাঁর চরিত্রে যে সকল বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়েছে, সে আপাত-বৈষম্যের সামঞ্জস্য ও রহস্যের মীমাংসা ব্যতিরেকে এ অনন্যসাধারণ চরিত্রের সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। শ্রেষ্ঠনীতি ও পরম সত্য তাঁর চরিত্রকে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন করে রেখেছে। কর্তব্যের কাছে তিনি নির্মল ছিলেন বলে সীতাবর্জনে আপন জীবনকে পূর্ণরূপে নৈরাশ্যময় করেও তিনি নিজ নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে পরান্মুখ ছিলেন না। সীতাকে ত্রিলোকের মধ্যে বিশুদ্ধা ও সতীত্ব প্রভাসম্পন্না জেনেও লোকনিন্দাভয়ে লোক সমক্ষে সীতার পরীক্ষা গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। এ সমস্ত ঘটনার দ্বারা তাঁর চরিত্রের নীতিজ্ঞান, কর্তব্যবুদ্ধি, আদর্শ স্থাপন ও সতেজ পৌরুষের দিকগুলি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বোত্তর জীবনের বহুশত ঘটনার আলেখ্যদর্শনে মতে হয় মর্ত্যলোকে ইনিই স্বর্গরাজ্য রচনা করেছিলেন, যে স্বর্গরাজ্যের নাম রামরাজ্য। তাঁর আশ্চর্য চরিত্রের আদর্শ কেবল মহাবিস্ময়ের বস্তুই নয়– অন্তরের পরম পূজনীয় সামগ্রি।

রামায়ণ

ইক্ষাকুবংশে রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। এ রাজার কৌশল্যা কৈকেয়ি ও সুমিত্রা নামে তিন স্ত্রী ছিলেন। কৌশল্যার গর্ভে রাম কৈকেয়ির গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। এ চারজন সৌভ্রাত্রের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রাম শৈশবাবস্থায় বিশ্বামিত্র ঋষির তত্ত্বাবধানে থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। সে সময় তাড়কা রাক্ষসিকে হত্যা করে নিজ বাহুবলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র মুণি এতে খুব প্রীত হয়ে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের গৃহ সীতা মাধবি উর্ম্মিলা শ্রুতকীর্তি নামের চারমেয়ের সাথে যথাক্রমে রাম ভরত লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের বিয়ে দেন।

রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠছেলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তদনুসারে অভিষেকেরও উদ্যোগ হতে লাগলো। এ দেখে কৈকেয়ি রাজার পূর্ব প্রতিশ্রুত বর দু টি প্রার্থনা করলেন। এর একটিতে রামের ১৪ বছর বনবাস এবং অপরটিতে ভরতের রাজ্যাভিষেক চাওয়া হয়। দশরথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, সুতরাং এর অন্যথা করতে পারেন না। ধর্মবীর রাম বাবাকে বিপন্ন দেখে নিজ প্রতিজ্ঞাপালন এবং মা কৈকেয়ির অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বনে গমন করলেন। ভ্রাতৃস্নেহে লক্ষণ এবং অকপটদাম্পত্য প্রণয়নী সীতা রামের অনুগমন করে স্ব স্ব গুণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। গঙ্গা-তীরস্থিত শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হয়ে চণ্ডালাধিপতিগুহের আতিথ্য গ্রহণ করে নিজ অলৌকিক মহত্বের পরিচয় দিয়ে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকুট গিয়ে সেখানে আনন্দিত মনে বাস করতে লাগলেন। এ সময় রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তিনি মহা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া দূরে থাকুক এবং সৌহার্দ্র বশত রামকে বনে গমন করা হতে নিবৃত্ত করার জন্য তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। উদারপ্রকৃতি মহাবল রাম ভরত দ্বারা পুন পুন অনুরুদ্ধ হলেও পিতৃ-আজ্ঞার কারণে রাজ্য গ্রহণে ইচ্ছুক হলেন না। ভরত বিফলমনোরথ হয়ে জ্যেষ্ঠের পাদুকাযুগল গ্রহণ করে ফিরে এলেন এবং রামের আগমন প্রতীক্ষায় নন্দীগ্রামে অবস্থান করে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

রাম নগরবাসিগণের পুনরাগমন আশঙ্কা করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন। মহারণ্যে প্রবেশ করে অনেক রাক্ষস হত্যা করে– ১. শরভঙ্গ, ২. সুতীক্ষ্ণ, ৩. অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষির সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং অগস্ত্যের পরামর্শানুসারে ১. ঈন্দ্র, ২. শারসন ৩. খড়্গ এবং ৪. অক্ষয়শরপূর্ণ তুণি গ্রহণ করলেন। সে স্থানে অবস্থানের সময়ে অগ্নিকল্প ঋষিগণের সামনে রাক্ষসবধে প্রতিশ্রুত হলেন। সেখানে বাস করতে করতে রাবনের বোন শূপর্ণখার নাক কান কাটলে সেনাপতি খর, সেনাপতি ত্রিশিরা, ও জেনারেল দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসের সাথে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে তাঁরা সকলেই নিহত হন। এরূপে ১৪ সহস্র রাক্ষস নিহত হলে রাবণ ক্রোধান্ধ হয়ে মারিচ নামক রাক্ষসের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মারিচ মহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাবণকে সাহায্য করতে স্বীকার করেন। রাবণ মারিচকে সঙ্গে করে রামচন্দ্রের আশ্রমপদের কাছে এলেন। মারিচ মায়াবলে স্বর্ণমৃগের আকার ধারণ করে সীতার সামনে বিচরণ করতে লাগলেন। সীতা ঐ মায়াহরিণ দেখে মুগ্ধ হয়ে রামের নিকট তা চাইলেন। মহাপুরুষ রাম রাজ্যসুখ বিসর্জন দিয়ে বনে গিয়ে কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুব্ধ হননি, কিন্তু সীতার স্বর্ণহরিণ গ্রহণাভিলাষ সম্পাদনে

পরাঙ্মুখ হতে পারলেন না। সুতরাং স্বর্ণ হরিণ ধরতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণও রামের খোঁজে কুটির ত্যাগ করেছিলেন। দুষ্ট রাবণ সে অবসরে প্রতিকুলকায়ি গৃধ্ররাজ জটায়ুকে হত্যা করে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যান। রঘুকুলতিলক কর্তব্যপরায়ণ রাম স্ত্রী শোকে অভিভূত হয়েও জটায়ুর যথাবিধি অগ্নিসংস্কার করে সীতার খোঁজে বের হন।

সীতাশোকসন্তপ্তহৃদয়ে তাঁর সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হয়। সুগ্রীব আদ্যোপান্ত সীতাঅপহরণ ঘটনা শুনে ব্যথিত হয়ে রামের সাথে বন্ধুত্ব করেন। বন্ধুত্ব বন্ধন বানররাজ সুগ্রীব রামের নিকট বালির সাথে নিজ শত্রুতার বিবরণ দিলে রাম বালিকে হত্যা করতে তাঁকে ভ্রাতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিশ্রুত হলেন। কিষ্কিন্ধ্যা গুহায় রামের সাথে বালির যুদ্ধ হয়। বালি সে যুদ্ধে নিহত হন। সুগ্রীব ভ্রাতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সীতার খোঁজের জন্য নানা দিকে বানর প্রেরণ করলেন। মহাবল হনুমান গৃধ্ররাজ সম্পাদিত কথানুসারে সমুদ্রজল লঙ্ঘন করে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন। অশোক কাননে শোকাকুলা পিতানন্দিনিকে দেখে রামপ্রদত্ত অভিজ্ঞান ও সংবাদ প্রদান করে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। লঙ্কাপুরি দগ্ধ করে রামকে প্রিয়সংবাদ প্রদান করেন। রাম বানর দ্বারা সেতু নির্মাণ করে লঙ্কা প্রবেশ ও রাবণকে হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। কর্তব্যপরায়ণ রাম কষ্ট স্বীকার করে সীতাকে উদ্ধার করলেন বটে; কিন্তু তাঁকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করতে পারলেন না। সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে নিজ পবিত্রতা প্রকাশ করলে রামচন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করে রাক্ষসরাজ বিভীষণকে লঙ্কার রাজত্বে অভিষিক্ত করে পুষ্পকরথারোহণে অযোধ্যা যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে ভরদ্বাজাশ্রমে গিয়ে হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠালেন। পরে নন্দিগ্রামে ভ্রাতৃগণের সাথে সমবেত হয়ে জটাভার ত্যাগ করে রাজ্য-ভার গ্রহণ করলেন।

রুদ্র

(১) ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে। 'রুদ্' ধাতুর অর্থ রেধন বা শব্দ করা। রুদ্র সে জন্য গর্জনকারি মরুৎগণের বাবা; এ সম্পর্কে রুদ্র বজ্র বা বজ্রধারি মেঘরূপ দেবতা।

বেদে রুদ্রের বিবিধ নামের ও বিবিধ গুনের উল্লেখ দেখা যায়। রুদ্র ত্র্যম্বক অর্থাৎ ত্রিভুবন তাঁর মা। রুদ্রের রূপকল্পনা ও গুণধর্ম এরূপ– রুদ্রের হাত আছে, তাঁর ওষ্ঠ সুন্দর, তিনি কপর্দি (জটাকেশ)। তাঁর রঙ পিঙ্গল, উজ্জ্বল, সূর্যের মতো দীপ্তিশালি। তিনি রথারূঢ় হয়ে বিচরণ করেন। তাঁর হাতে বজ্র এবং আকাশ হতে তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাঁর হাতে ধনুর্বানও থাকে। স্ত্রী, পুরুষ, গাভি, ঘোড়া,

ভেড়া ইত্যাদিকে তিনি নানা প্রকার মঙ্গল ও প্রাচুর্য দান করেন। রোগের ওষধি দান করে রুদ্র সকলকে নিরোগ করেন; পাপ হতে সকলকে নিস্কৃতি দেন। রুদ্র ভয়াবহ বন্য জন্তুর মতো ধ্বংসকারি। তাঁকে বৃষভ ও আকাশের লোহিত বরাহ বলা হয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে মুক্তিদাতা, কিন্তু রুক্ষ স্বভানাপন্ন; তিনি এখানে ভিষণ ধ্বংসাত্মক রুদ্র দেবতা। ঋগবেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে। তিনি বদান্য, সহজে তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ। তিনি আবার অনিষ্টকারি। তিনি ক্রুদ্ধ হলে লোকদের হিংসা করেন, বজ্রাঘাতে মানুষ ও পশু বধ করেন, রোগ আনয়ন করেন। রুদ্র প্রসন্ন হলে বিপদ হতে ত্রাণ করেন, রোদ দূর করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। রুদ্রের চরিত্রে এরূপ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। রুদ্র একাধারে রুদ্র (ভয়ানক) ও শিব (মঙ্গলময়, ১০/৯২/৯ ঋগবেদ)। এ শিব বিশেষণ পরে রুদ্রের অপর নাম হয়ে পৌরাণিক ত্রিদেবতার একমত হয়েছেন। রুদ্র বা শিব পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিনাশ শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

উপনিষদে রুদ্রের চরিত্রের বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে রুদ্র নিজেকে বলেছেন– আমিই সর্ব প্রথমে আগত, আমার পূর্বে কিংবা ওপরে কেউ নাই। আমি চিরন্তন ও আমি চিরন্তন নই। আমি ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মা নই। তিনি এ পৃথিবীর শাসনকর্তা, সমস্ত জীব তাঁর কথায় চালিত হয়। প্রলয় কালে তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করেন। তাঁর আদি, মধ্যম, অন্ত কিছুই নাই। তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনি ইন্দ্র, তিনি শিব।

(২) গণদেবতা বিশেষ। রুদ্রের সংখ্যা এগারো জন– অহিব্রধনু, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকি (মৎস্য পুরাণ), অজৈকপাদ ও সুরেশ্বর। বিভিন্ন পুরানে রুদ্রদের আরও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়।

বিষ্ণু পুরাণে রুদ্রের জন্ম সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ আছে– ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করছিলেন, তখন তাঁর শরির হতে রোদন করতে করতে একটি ছেলে উৎপন্ন হলো। সে ছেলে তখন ব্রহ্মার কাছ হতে নিজের নাম প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মার তখন তাঁর নাম দিলেন রুদ্র। তারপর সে পুনরায় ক্রন্দনরত হয়ে সাতবার চোখের জল ফেলল। তখন সাতটি নাম সে প্রাপ্ত হল– ১. ভব,২. সর্ব, ৩. ঈশান, ৪. পশুপতি, ৫. ভিম, ৬. উগ্র, ৭. কপালি ৮. তদ্ভিন্ন মহাদেব বা রুদ্র কিংবা শিব। ঋগবেদে অগ্নিকে রুদ্র বলা হয়েছে এবং মরুৎরা তাঁর সন্তান। এ বেদে তিনি এ ভাবে কীর্তিত হয়েছেন– তিনি সঙ্গীতের ও যজ্ঞের দেবতা।

পদ্ম পুরাণে রুদ্রের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে– ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে তাঁর ভ্রূ-মধ্য হতে রুদ্রের আবির্ভাব হয়। আবির্ভূত হয়েই তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁকে বললেন– তুমি কাঁদছো কেনো? এর উত্তরে রুদ্র বললেন–

আমার নাম, স্থান ও স্ত্রী-পুত্রাদির বিষয় নির্দেশ করে দিন, তা হলে আমি ক্রন্দন হতে নিবৃত্ত হব। এ কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, তুমি জন্মিবামাত্রই রোদন করেছ, এজন্য তোমার নাম রুদ্র। এ ছাড়া ১. ঋতধ্বজ, ২. মনু, ৩. মন্যু, ৪. উগ্ররেতা, ৫. শিব, ৬. ভব, ৭. কাল, ৮. মহিনস, ৯. বামদেব ও ১০. ধৃতব্রত তোমার নাম হলো। ১. ইন্দ্রিয় সকল, ২. অনুহৃদ, ৩. ব্যোম, ৪. বায়ু, ৫. অগ্নি, ৬. জল, ৭. মহী, ৮. তপস্যা, ৯. চাঁদ ও ১০. সূর্য– এ সকল স্থানে তুমি বাস করবে। ১. ধৃতি, ২. ধী, ৩. অসিলোমা, ৪. নিযুৎ ৫. সর্পি, ৬. বিলম্বিকা, ৭. ইরাবতি, ৮. স্বধা ও ৯. দীক্ষা তোমার স্ত্রী হবে। সকল স্ত্রীর সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করে তুমি জগৎ পূর্ণ করো। ব্রহ্মা এ কথা বলার পর রুদ্র ভূত, প্রেত ও বৈরবাদি সৃষ্টি করতে লাগলেন। এরূপ জগৎ ধ্বংসকারির সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মা রুদ্রকে বিরত হতে বললেন এবং বিষ্ণুর আরাধনা করতে বললেন।

রুরু

ভৃগুপুত্র চ্যবনের ঔরসে ও সুকন্যার গর্ভে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচি অপ্সরার গর্ভে রুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সহবাসে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতি হন। কিন্তু এ অপ্সরার মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে তিনি নদীতীরে মেয়েকে পরিত্যাগ করে প্রস্থান করেন। সে সময় মহর্ষি স্থূলকেশ এ মেয়েকে দেখতে পেয়ে নিজের আশমে এনে পালন করতে লাগলেন। এ মেয়ের স্বভাব, রূপ, গুণ সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ বলে মহর্ষি এর নাম রাখলেন প্রমদ্বরা। রুরু এ কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে আগ্রহান্বিত হলেন। তাঁর বাবা প্রমতির অনুরোধে স্থূলকেশও মেয়েকে দান করতে সম্মত হলেন। বিয়েকাল আসন্ন হলে প্রমদ্বরা সখিদের সঙ্গে খেলা করতে করতে হঠাৎ একটা সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেলেন। সর্পের দংশনে প্রমদ্বরা বিবর্ণ ও হতচেতন হয়ে পড়লেন। তখন রুরু বনে গিয়ে করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলেন এবং দেবতাদের কাছে প্রমদ্বরার জীবন-ভিক্ষা করতে রাগলেন। রুরু বিলাপ শুনে দেবাতরা তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে একজন দূত পাঠালেন। দূত এসে বললে, প্রমদ্বরার আয়ু শেষ হয়েছে, যদি তুমি এ মেয়েকে তোমার আয়ুর অর্ধ দান কর, তাহলেই সে আবার জীবিত হবে। রুরু তখনই প্রমদ্বরার বাবা বিশ্বাবসু ও দেবদূতের সঙ্গে যমের কাছে গিয়ে রুরুর অর্ধায়ুর পরিবর্তে মৃত প্রমদ্বরার জীবনভিক্ষা করলেন। যম এতে সম্মত হলে প্রমদ্বরা জেগে উঠলেন। প্রমতি ও স্থূলকেশ তখন এ বর-মেয়ের বিয়ে দিলেন। এর পর রুরু অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্পকুল ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করে যথা-শক্তি সকল প্রকার সর্প বধ করতে লাগলেন। এক দিন তিনি এক ডুণ্ডুভ সাপকে বধ করতে উদ্যত হলে এ সাপ

বললো, সে কোন অপরাধ করে নি, তবে কেনো তাকে বধ করা হচ্ছে। উত্তরে রুরু বললো, তাঁর স্ত্রীকে সাপে দংশন করেছিল, সে জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞা মতো তিনি সর্প বিনাশ করছেন। তখন ডুণ্ডুভ বললো, যারা মানুষকে দংশন করে তারা অন্য জাতীয় সাপ। সে পূর্বে সহস্রপাদ নামক ঋষি ছিল। তার খগম নামে এক বন্ধু ছিল, এ বন্ধুর বাক্য একবোরে অব্যর্থ সত্য। একদিন খগম তপস্যায় নিযুক্ত থাকা কালে, সে খেলার ছলে একটি তৃণ-নির্মিত সর্প নিয়ে তাকে ভয় দেখায়। তাতে তার বন্ধু মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞানলাভ করে তিনি তাকে শাপ দেন, সে সর্পে পরিণত হবে। অনেক অনুনয়বিনয় ও ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফলে খগম বলেন- আমি যা বলেছে তা মিথ্যা হবার নয়, তবে প্রমতির ছেলে রুরু দর্শন পেলে তুমি শাপমুক্ত হবে। তুমিই সে রুরু। আজ আমি তোমার দর্শনে শাপমুক্ত হলাম।

রেবতি

রৈবত রাজার মেয়ে ও বলরামের স্ত্রী। রেবতি পরমা সুন্দরি ছিলেন বলে বাবা পৃথিবীতে মেয়ের উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে ব্রহ্মার পরামর্শ গ্রহণ করতে স্বর্গে যান। ব্রহ্মা রৈবতকে দ্বারকায় গিয়ে বলরামের হাতে এ মেয়েকে সম্প্রদান করতে বলেন। কারণ, বিষ্ণুর অংশে বলরাম জন্মগ্রহণ করেছেন। নিজের অজ্ঞাতসারে লক্ষ বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করার পর ফিরে এসে রৈবত দেখেন, পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির অবনতি হয়েছে; তারা এখন খর্বাকৃতি, ক্ষীণদেহ ও বুদ্ধিহীন। তিনি ফিরে এসেই দ্বারকাতে গিয়ে বলরামের হাতে মেয়ে রেবতিকে দান করেন। অত্যন্ত দির্ঘাঙ্গি অপরূপ সুন্দরি রেবতিকে দেখে বলরাম তাঁর হল দ্বারা এ দির্ঘাঙ্গিকে একটু খাটো করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। বলরামের ঔরসে রেবতির নিশঠ ও উল্মুক নামে দু ছেলে হয়। যদুবংশ ধ্বংসের সময় বলরামের মৃত্যু হলে রেবতি সহমৃতা হন। (হরিবংশ)

রণজিৎসিংহ

১৭৮০ সালে পাঞ্জাবের গুজরণবালায় এ মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম মহাসিংহ। তিনি পাঞ্জাবে একটি উপরিভাগের অধিপতি ছিলেন। রণজিতের ৮ বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হয়। সেকালে তিনি তাঁর বাবার দেয়ানের অধীনে কালযাপন করতেন। বাল্যকালে বসন্তরোগ হওয়ায় রণজিতের একটি চোখ নষ্ট হয়। বাল্যকাল হতেই রণজিৎ নিজ বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়ে শিখদের নায়ক হতে সচেষ্ট হন।

এ সময় পাঞ্জাবদেশ দুররানি ভূপতির অধীন ছিলো। দুররানি ভূপতি কোন এক কার্যোপলক্ষে রণজিতের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে লাহোরের অধিপতি করেন। এ সময় তাঁর বয়স ঊনিশ বছর মাত্র। তিনি অধীনস্থ প্রদেশসমূহ সুনিয়মে শাসন করতে লাগলেন। সেনাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং তাদের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁর অপরিসীম যত্নে সেনাগণ এরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল যে তাঁর খালসা সেনা সেকালে অজেয় হয়ে উঠেছিল। রণজিৎ ক্রমশ পাঞ্জাবে নিজ অধিকার বিস্তার করে প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হয়েছিলেন। লাহোর নগর তাঁর রাজধানি ছিলো। তিনি নিজ অধিকার বদ্ধমূল করে ক্রমে রাজ্যবিস্তার করতে লাগলেন। এ সময় মুলতান ও কাশ্মির আফগানদের অধীন ছিলো। রণজিৎ অসাধারণ বলবিক্রমে আফগানদেরকে পরাজিত করে মুলতান ও কাশ্মির অধিকার করেন। গুণপক্ষপাতি রণজিৎ অনেক ইউরোপিকে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে পেশোয়ারে উপস্থিত হলে আফগানেরা তাঁর ধৃষ্টতায় রেগে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে দলে দলে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন নওশেরার রণ ক্ষেত্রে উভয় সেনার সাক্ষাৎ হয়। আফগানগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করেও কৃতকার্য হতে পারে নি। শেষে রণজিৎ পেশোয়ার জয় করে ফিরে এলেন।

ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সাথে রণজিৎসিংহের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৪৩৯ খ্রিঃ অব্দে মহাবীর রণজিৎসিংহ মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাগ ও রাগিনী

সঙ্গীতশাস্ত্রের ছটি রাগ : ভৈরব, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘ। অন্য মতে, ভৈরব, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ, শ্রী, নটনারায়ণ। প্রত্যেক রাগের ছটি করে রাগিনী আছে। যেমন :

ভৈরব : ভৈরবি, বাঙালি, সৈন্ধবি, গুণকেলি, গুজরি, রামকেলি।
মেঘ : মল্লারি, সৌরবি, সায়েবি, কৌশিকি, গান্ধারি, হরশৃঙ্গার।
নটনারায়ণ : কামোদি, কল্যাণি, আভিরি, লাষিকি, সারঙ্গি, হাম্বির।
শ্রী : মালশ্রী, ত্রিবেণি, গৌরী, কেদরি, মধুমাধবি, পাহাড়ি।
বসন্ত : দেশি, দেবকিরী, বরাটী, তোড়ি, ললিতা, হিন্দোলি।
পঞ্চম : বিভাষ, ভূপালি, কর্ণাটি, বড়হাসিকা, মালবি, পঠমঞ্জরি।

রামমোহন রায়

তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। ১৭৭৪ সালে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে ব্রাহ্মণকূলে তাঁর জন্ম। তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা করে পাটনায় আরবি

ও ফার্সি শিক্ষা করেন, পরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশি গিয়েছিলেন। অসাধারণ অধ্যাবসায়ি রামমোহন সকল বিষয়ে কৃতবিদ্য হয়ে ১৬ বছর বয়সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর মন ধর্মের দিকে ধাবিত হওয়ায় বহু অনুসন্ধানের পর তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরাবাদি মতাবলম্বি হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি বই রচনা করেন। এ উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাঁর যথেষ্ট মনোবিবাদ ঘটে। তিনি ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে নানা স্থান ভ্রমণ করে তিব্বতে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধদের আচার ব্যবহারে প্রীত না হওয়ায় তিনি তাঁর বিদ্বেষ ভাজন হয়েছিলেন। চার বছর দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এ অবস্থায় রংপুরে কলেক্টরি আদালতে একটি কার্য গ্রহণ করে নিজ গুণের সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন। তাঁর ভাইদের মৃত্যু হওয়ার সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারি হয়ে আর চাকরি করা অনাবশ্যক মনে করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি অনন্যমনে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

১৮২৭ সালে রামমোহন কলকাতায় ব্রাহ্মণসমাজ স্থাপন করে তার তিন বছর পরে স্বতন্ত্র উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, আরবি, ফার্সি, গ্রিক, ল্যাটিন, উর্দু, হিব্রু, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা জানতেন। ইনিই সর্বপ্রথমে উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্য লেখক। নতুন ধর্ম সংস্থানের জন্য তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিলো। সতীদাহ নিবারণের জন্য শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা গভর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় দিল্লির মোগল সম্রাটের কার্য উপলক্ষে ইংল্যাণ্ড গিয়ে করেন। সে সময়ে সম্রাট তাঁকে রাজা উপাধি দান করেন। ১৮৩২ সালে তিনি প্যারিস নগরে উপস্থিত হয়ে ফ্রান্সের রাজার নিকট সম্মানিত হন। পরের বছর ব্রিস্টল শহরে রামমোহন রোগ-গ্রস্থ হয়ে ১৮৩৩ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর মানব লীলা সংবরণ করেন।

রামপ্রসাদ সেন

তিনি একজন প্রসিদ্ধ গীতি রচয়িতা ও পরম সাধক ছিলেন। ১৭২৩ সালে ভাগীরথী নদীর তীরে কুমার হট্ট-হালি শহর গ্রামে বৈদ্যকুলে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম রাম রাম সেন। রাম প্রসাদ পাঠাবস্থায় পিতৃবিয়োগের কারণে আশানুরূপ বিদ্যাচর্চা করতে পারেননি। পরে অধ্যবসায় গুণে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, পার্সি ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। একদিন চাকুরির জন্য কলকাতা গেলে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর গৃহে তাঁকে লেখকের কাছে নিযুক্ত হন। তখন হতেই তার শ্যামা-বিষয়ক গীতি রচনায় বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তিনি খুব কালিভক্ত ছিলেন। তিনি অবসর পেলেই গান রচনা করতেন এবং এ সকল গান সময়ে সময়ে দপ্তরের খাতা পত্রেও লিখে রাখতেন। একদিন উচ্চপদস্থ একজন

কর্মচারি রামপ্রসাদের খাতায় গান লেখা আছে দেখে তিনি তাঁদের বসকে জানিয়ে ছিলেন। বস অতিশয় সহৃদয়, ধার্মিক ও গুণগ্রাহি ছিলেন। তিনি রাম প্রসাদের রচিত গীত পাঠ করে খুব আনন্দিত হলেন এবং তাঁর মাসিক ৩০ (ত্রিশ) টাকা বৃত্তি নির্ধারণ করে অবসর দিলেন। রামপ্রসাদের ভক্তিপূর্ণ গীতি সমাজে খুবই আদরণীয়।

রামানন্দ রায়

তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নর্মদা তীরবর্তী দেশে তাঁর বাস ছিল। কিন্তু জন্মস্থান কোথায় তা নির্ণয় করা কঠিন। রামানন্দ ঐশ্বর্যশালি লোক ছিলেন। তাঁর চিত্ত ঈশ্বরপ্রেমে একান্ত অনুরক্ত ছিলো। তাঁর ধর্মোপদেশ ও ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা খুবই উপাদেয়। চৈতন্যদেব দেশপর্যটনকালে রামানন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। রামানন্দ চৈতন্যের আদেশে তাঁর সাথে লীলাচল গমন করেন।

রামানুজ

খ্রিস্টিয় বারো শতাব্দিতে তিনি দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হন। চোল বা তাঞ্জোর রাজ্যে তাঁর বাড়ি ছিলো। তিনি খুব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। চোল-রাজ্যে সেকালে সবাই শৈব ছিলো। সেখানে রামানুজই বিষ্ণু উপাসনার প্রথম প্রবর্তক। শিব উপাসকদের মধ্যে এ নতুন মত প্রচার করতে তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। পরিশেষে চোলরাজকর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে তিনি মহিসুরে পলায়ন করেন।

মহিসুরের রাজকন্যাকে তিনি এক দূরপনের রোগ হতে মুক্ত করায় রাজা তাঁর মতাবলম্বি হন এবং তাঁর রাজ্যে সে মত প্রচার করতে অনুমতি দেন।

লক্ষ্মণ

(১) রাজা দশরথের ছেলে ও দশরথের অন্যতমা স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভজাত। ছেলে। এ জন্য তিনি সৌমিত্রি নামেও খ্যাত। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যমজ ভাই ও রামের বৈমাত্রেয় ভাই ও রামের বৈমাত্রেয় ভাই। লক্ষ্মণ জৌষ্ঠ ভাই রামের বিশেষ অনুগত ছিলেন। রাক্ষসদের অত্যচার হতে ঋষিদের যজ্ঞ হোমাদি রক্ষা করার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে আশ্রমে আনলে, লক্ষ্মণও রামের অনুগমন করেন। তাড়কা বধের পর লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে মিথিলায় আসেন। এখানে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহের পর পিতা-মেয়ে ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে হয়। ঊর্মিলার গর্ভে লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে দু ছেলে হয়। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য রামের বনযাত্রা কালে লক্ষ্মণ সহগমন করেন। পঞ্চবটি আশ্রমে

রাবণ-বোন শূর্পণখা কামাতুর হয়ে লক্ষ্মণের কাছে এলে তিনি নিজ হাতে শূর্পণখাকে ছিন্ননাসা ও লাঞ্ছিত করেন। শূর্পণখার প্রার্থনায় রাক্ষস-সেনাপতি খর ও দূষণ রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে নির্মূল হন। তখন শূর্পণখা তার ভাই রাবণকে সীতাহরণের জন্য উত্তেজিত করে। রাবণ স্বর্ণহরিণ রূপি মায়াবি মারীচের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে উপস্থি হয়ে কৌশলে সীতাকে অপহরণ করেন। রাম সীতাকে উদ্ধার করার মানসে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। লঙ্কার ঘোর যুদ্ধে লক্ষ্মণ রামের সহায় ছিলেন। অন্যের অবধ্য রাবণ-ছেলে ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্মণ বধ করেন। শোজকাতুর রাবণ প্রতিশোদ গ্রহণের জন্য শক্তিশেল অস্ত্রদ্বারা লক্ষ্মণকে বধ করেন। বানর চিকিৎসক সুষেণ বিশল্যকরণি নামক উদ্ভিজ্জ লতা দ্বারা লক্ষ্মণকে জীবিত করেন। অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করে লোকাপবাদ ভয়ে গর্ভবতি সীতাকে বনবাসে পাঠালে লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাসে রেখে আসেন। তারপর সীতা বাল্মীকির আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর দু যমজ ছেলে লব ও কুশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্মীকি দ্বারা শাস্ত্রে ও অস্ত্রে শিক্ষিত হয়। দু ভাই রামচন্দ্রের অশ্বমেধ ঘোড়া ধরে অজ্ঞাত ও অপরিচিত কাকা লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। ঊর্মিলার গর্ভজাত লক্ষ্মণের দু ছেলে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু দু পৃথক রাজ্যের রাজা হন।

সীতা পাতালে প্রবেশ করার পর সমস্ত পার্থিব কাজ শেষ হয়ে গেলে, কালপুরুষ ছদ্মবেশে রামের নিকট উপস্থিত হন। তাপসরূপি কালপুরুষ বলেন, তুমি যদি নিজের হিত চাও, তবে আমার বক্তব্য গোপনে শ্রবণ করতে হবে, অন্য কেউ যদি আমাদের কতা শোনে বা একত্রে আমাদের দেখে তবে সে তোমার বধ্য হবে। রাম এ শর্তে তাঁর কথা শুনতে সম্মত হন। রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে স্বয়ং দ্বররক্ষা করতে বলেন। লক্ষ্মণকেও এ শর্ত জানান হয়। ঠিক এ সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা রামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হলে, লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে অপেক্ষা করতে বলেন। এতে দুর্বাসা রেগে গিয়ে সকলের ওপর অভিশাপ দিতে আরম্ভ করেন। তখন লক্ষ্মণ ভাবলেন যে, সকলের বিনাশ না হয়ে কেবল তাঁরই মৃত্যু হোক। তখন দুর্বাসা আর অভিশাপ না দিয়ে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। লক্ষ্মণ তখন রামকে বললেন, আপনি সন্তপ্ত না হয়ে আমার প্রতি আপনার পূর্ব-প্রতিজ্ঞা পালন করুন।পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যা ত্যাগ করে সরযূ তীরে এসে যোগগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

(২) দুর্যোধনের ছেলে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর হাতে নিহত হন।

লঙ্কা

রাক্ষসরাজ রাবণের পুরি। লঙ্কা লবণ সমুদ্র বেষ্টিত ত্রিকূট পর্বতের উপরিস্থিত বিশ্বকর্মা নির্মিত পুরি। প্রস্থে দশ ও দৈর্ঘে বিশ যোজন। স্বর্ণ-প্রাচীর বেষ্টিত। এরপর কুম্ভিরপূর্ণ পরিখা। চারদিকে স্বর্ণদ্বার, প্রত্যেক দ্বারে শত্রুবিনাশী প্রশস্ত যন্ত্রসেতু। মাল্যবান, সুমালি ও মালি ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করে দেবশিল্পি বিশ্বকর্মা দ্বারা এ পুরি নির্মাণ করান। এ স্থান হতে তাঁরা সর্বলোকের উপর উৎপীড়ন করায় বিষ্ণু এদের দমন করেন। মালি নিহত হয় ও সুমালি ও মাল্যবান পাতালে গমন করে। এরপর বৈমাত্রা ভাই রাবণের হাতে পরাজিত হয়ে রাবণকে লঙ্কার অধিকার ছেড়ে দেন। রাবণ সীতা অপহরণ করার পর সীতা খোঁজে এসে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেন। রাবণ নিহত হলে রাবণের ভাই বিভীষণ লঙ্কার অধিপতি হন। (রামায়ণ)

লব

রামচন্দ্র ও সীতার ছেলে। রাম সীতাকে গর্ভাবস্থায় লোকাপবাদের ভয়ে নির্বাসিত করলে সীতা বাল্মীকির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। সে সময় তাঁর যমজ ছেলে– কুশ ও লবের জন্ম হয়। বাল্মীকির কাছে তাঁরা সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। মহর্ষি তাঁর স্বরচিত রামায়ণ এঁদের কণ্ঠস্থ করিয়ে সকলকে শোনাতেন। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে দু ভাই মুনি-বালক বেশে বাল্মীকির সঙ্গে যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে মহর্ষির আদেশে রামায়ণ গান করে সকলকে মুগ্ধ করেন। এঁদের গান শুনে ও আকার-প্রকার দেখে রাম এঁদের নিজ ছেলে বলে চিনতে পারলেন। পরে প্রকৃত পরিচয় পেয়ে রাম সীতাকে ও লব-কুশকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন মনোদুঃখে সীতা পাতালে প্রবেশ করলে রাম কুশকে কোশলরাজ্যের এবং লবকে উত্তর কোশলের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনি লবকোট বা লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত।

লোপামুদ্রা

অগস্ত্যের স্ত্রী। যিনি নারীদের রূপাভিমান লোপ করেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁর পিতৃগণকে এক বিবরের মধ্যে লম্বমান থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কেনো তাঁরা এ অবস্থায় আছেন। পিতৃগণ উত্তরে বলেছিলেন, অগস্ত্য যেনো ছেলে উৎপাদন করে তাঁর এ পিতৃগণকে নরক হতে উদ্ধার করেন। তখন অগস্ত্য বলেছিলেন, তাঁদের এ আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করবেন। তখন অগস্ত্য সমস্ত প্রাণির উত্তম অঙ্গের সমবায়ে এক অদ্বিতীয়া সুন্দরি

নারী সৃষ্টি করলেন। সে সময়ে সন্তানকামনায় বিদর্ভরাজ তপস্যানিরত ছিলেন। অগস্ত্য আপনার নির্মিত এ মেয়েকে বিদর্ভরাজের হাতে অর্পণ করলেন। বিদর্ভরাজ-গৃহে পালিতা হয়ে এ মেয়ে লোপামুদ্রা নামে পরিচিতা হন। লোপামুদ্রার যখন যৌবনাবস্থা, তখন অগস্ত্য বিদর্ভরাজের কাছে এঁকে প্রার্থনা করলেন। রাজার অনিচ্ছা থাকলেও ঋষির শাপের ভয়ে ও লোপামুদ্রার অনুরোধে ঋষির হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করা হল। ঋষির অনুরোধে বহুমূল্য বসন ও আভরণ ত্যাগ করে বল্কল ও চীর পরিধান করে লোপামুদ্রা স্বামি অগস্ত্যের অনুগমন করলেন। গঙ্গতীরে এসে দু জনে উৎকট তপস্যায় রত হন। বহুকাল পর একদিন লোপামুদ্রাকে ঋতু-স্নাতা দেখে অগস্ত্য সঙ্গমপ্রার্থী হয়ে তাঁকে আহ্বান করলেন। লোপামুদ্রা বললেন, পুত্রের জন্য যখন তাঁকে বিয়ে করা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন; কিন্তু তার পূর্বে তিনি পিতৃগৃহের অনুরূপ শয্যা, বসন ও ভূষণাদি প্রার্থনা করলেন। কারণ, চীর কাষায় বাস তিনি অপবিত্র করতে চান না। অগস্ত্যের পক্ষে এ রাজোচিত বসন, ভূষণ ও শয্যা সংগ্রহ করা অসম্ভব; তা সত্ত্বেও লোপামুদ্রা স্বামির সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। তখন অগস্ত্য বাধ্য হয়ে ধন আহরণের জন্য যাত্রা করে প্রথমে শ্রুতর্বা রাজার কাছে গেলেন, কিন্তু রাজার অর্থানুকূল্য না থাকায় অগস্ত্য তাঁর কাছ থেকে ধন গ্রহণ করলেন না। পর পর তিনি আরও দুটি রাজার কাছে গেলেন, কিন্তু সেখানেও কৃতকার্য না হওয়ায় শেষে বাতাপি দানবের ভাই ইল্বলের কাছে এলেন। ইল্বল মেশরূপধারি বাতাপির মাংস দিয়ে ঋষিকে পরিতৃপ্ত করলেন। ইল্বল বাতাপিকে বার বার ডাকা সত্ত্বেও যখন সে এল না, তখন অগস্ত্য বললেন, তিনি বাতাপিকে জীর্ণ করে ফেলেছেন। তখন ইল্বল ভীত হয়ে ঋষিকে প্রচুর অর্থ দিলেন। অগস্ত্য এরূপে অর্থ সংগ্রহ করে গৃহে ফিলে এলে লোপামুদ্রা ঋষিকে একটি পবিত্র ও বলবান ছেলে উৎপাদন করতে বললেন। যথাসময়ে দু জনে মিলিত হলে লোপামুদ্রা গর্ভবতি হলেন, এবং ঋষি অগস্ত্য বনগমন করলেন। সাত বৎসর পরে এক রূপবান ও বেদজ্ঞানসম্পন্ন পুত্রের জন্ম হলো। পুত্রের নাম হলো ইধ্মবাহ। তপস্যার প্রভাবে এ ছেলে বাবার উপযুক্ত ছেলে হয়েছিলেন। (মহাভারত– বনপর্ব)

লীলাবতি

তিনি এক বিদুষি মহিলা। তিনি সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভাস্করাচার্যের স্ত্রী। মহাত্মা ভাস্করাচার্য দক্ষিণাপথের সহপর্বতের প্রান্তবর্তী বিজুলবিড় গ্রামে ১০৩৬ শকে অর্থাৎ ১১১৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার

নাম মহেশ্বর দৈবজ্ঞ। ভাস্করাচার্য সুখ্যাতিমান সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থ রচনা করেন। তার ১ম অধ্যায় লীলাবতি, ২য় অধ্যায় বীজগণিত, ৩য় অধ্যায় ত্রিকোণমিতি ও ৪র্থ অধ্যায় গোলাধ্যায়।

মহাত্মা ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় রচনাকালে সঙ্কুলন, ব্যবকলন, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘন মূল, ত্রৈরাশিক, ভিন্নপরিকর্ম প্রভৃতির সূত্র রচনা করে স্ত্রীর নিকট বলেন, স্ত্রী তাঁর সমাধান করে দেন। এরূপে সমুদয় গণিতের পাটি রচিত হয়। আচার্য তাঁর স্ত্রীর নাম চিরস্মরণীয় করার জন্য প্রথম অধ্যায়ের নাম লীলাবতি রাখেন।

লীলাবতি অল্প বয়সে বিধবা হন। ভাস্করাচার্য তাঁর মনের স্থৈর্য বিধানের জন্য নিজে সূত্র রচনা করে লীলাবতিকে এর সমাধান করতে আদেশ করেছিলেন। এভাবে ভাস্করাচার্যের পাটিগণিত লীলাবতি নামে অভিহিত হয়।

শকুন্তলা

পূর্বকালে ঋষি বিশ্বামত্রকে ঘোর তপস্যায় রত দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করেন। সর্বাঙ্গসুন্দরি বিবস্ত্রা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র মেনকার সঙ্গে মিলিত হন। মিলনের ফলে বিশ্বামিত্রর ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে মেয়ে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র অপ্সরা মেনকাকে বিদায় দিয়ে আবার তপস্যায় রত হন। তখন মেনকা সদ্যোজাতা মেয়েকে বন-মধ্যে মালিনী নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। এ পরিত্যক্তা মেয়ে শকুন্ত অর্থাৎ পাখি দ্বারা রক্ষিত হয়ে মহর্ষি কণ্বের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহর্ষি কণ্বই নিজের আশ্রমে এনে এঁকে নিজের মেয়ের ন্যায় পালন করতে থাকেন। শকুন্ত দ্বারা রক্ষিতা বলে মেয়েটির নাম হয় শকুন্তলা। এ সময় একদিন মহারাজ দুষ্মন্ত বন-মধ্যে হরিণি করতে এসে শ্রান্ত হয়ে কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলা রাজাকে যথোচিত অতিথি সৎকার করেন। শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে কণ্বমুনির ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন; কিন্তু রাজা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ায় শকুন্ত লা রাজাকে বলেন যদি নিতান্তই তাঁকে তাঁর স্ত্রী হতে হয়, তবে শকুন্তলার গর্ভে যে ছেলে হবে তাকেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে উত্তরাধিকারি করতে হবে। প্রেম-মুগ্ধ রাজা শকুন্তলার কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে তাঁকে বিয়ে করে কিছুদিন সেখানে সুখে বাস করার পর নিজ রাজ্যে ফিরে যান। এ সময় শকুন্তলা একটি সুকুমার শিশুর জন্ম দেন। এ বালক অত্যন্ত সাহসি ও শক্তিমান ছিলো এবং

সর্বপ্রাণিকে দমন করতে পারতো বলে এর নাম হলো সর্বদমন। কণ্বমুনি একদিন শকুন্তলাকে বললেন, বালকের এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার সময় হয়েছে। তখন শকুন্তলা তার পুত্রের সঙ্গে দুষ্মন্তের কাছে উপস্থিত হলেন এবং ছেলেকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে রাজাকে অনুরোধ করলেন। রাজা পূর্বের সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হওয়ায় স্ত্রীকেও চিনতে পারলেন না; তিনি সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করে শকুন্তলা ও রাজকুমারকে বিদায় দেন। তখন দৈববাণি হলো– রাজা দুষ্মন্তই পুত্রের বাবা এবং এর নাম 'ভরত' হোক। এ দৈববানী শুনে রাজা শকুন্তলা ও ছেলেকে গ্রহণ করলেন।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান=শকুন্তলার' আখ্যান সামান্য অন্যরূপ। মহারাজ দুষ্মন্ত বিবাহের পর আশ্রম ত্যাগের সময় শকুন্তলাকে একটি স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দান করে যান। একদিন শকুন্তলা যখন স্বামিবিচ্ছেদে চিন্তামগ্না, সে সময় দুর্বাসা মুনি আশ্রমে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। কিন্তু শকুন্তলা অদিতথিরূপে উপস্থিত হন। কিন্তু শকুন্তলা তখন এতই চিন্তামগ্ন যে, দুর্বাসার আগমন লক্ষ্যই করলেন না। তখন ক্রুদ্ধ দুর্বাসা তাঁর সৎকার অবহেলা দেখে শকুন্তলাকে শাপ দেন– যার জন্য সে এমন তন্ময় হয়ে আছে, স্মরণ করিয়ে দিলেও সে ব্যক্তি শকুন্তলাকে চিনতে পারবে না। তখন শকুন্তলার দু সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুর্বাসাকে অনেক অনুরোধ করার পর ঋষি বললেন– কোন অভিজ্ঞান দেখলে শকুন্তলার শাপমোচন হবে। শকুন্তলার এত তন্ময়তা এসেছিল যে, শাপের কথা তিনি জানতে পারেন নি। কণ্ব ফিরে এসে শকুন্তলার পরিচয় ও গর্ভসঞ্চারের কথা জানতে পেরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দেন। দুর্বাসার শাপে শকুন্তলা রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন। কারণ, সে অঙ্গুরিয়টি তখন তাঁর কাছে ছিল না। কোন সময়ে দৈবক্রমে বস্ত্রাঞ্চলবদ্ধ অঙ্গুরিয়টি স্নানের সময় জলে পড়ে গিয়েছিল। এরপর এক ধীবরের কাছ হতে সে অভিজ্ঞান অঙ্গুরিয়টি পেয়ে দুষ্মন্তের পূর্ব ঘটনা মনে পড়ে যায়। তখন তিনি শকুন্তলা ও ছেলেকে ফিরিয়ে আনেন। এ ছেলে ভরত নামে খ্যাত হয়ে পিতৃরাজ্য পান। এ ভরতের নামানুসারেই এ উপমহ দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ।

শক্তি

(১) তন্ত্রে ষোলটি স্বরবর্ণের ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। ঐ সকল শক্তি রুদ্রের ক্রোড়ে বাস করেন। এঁদের মূর্তি সিঁদুরের মতো রক্তরঙ। সকলের হাতে রক্তোৎপল ও নরকপাল আছে।

(২) ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতাদের নিজ নিজ শক্তি আছে। তাঁরা নিজেদের দেবগণের অংশভূতা। প্রয়োজন মতো তাঁরা দেব-তেজ হতে উদ্ভূত হয়ে নিজ নিজ দেবগণকে সাহায্য করেন। রক্তবীজের সঙ্গে চণ্ডিকার যুদ্ধকালে এরূপ শক্তি উদ্ভূতা হয়ে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন।

শঙ্খচূড়

শঙ্খচূড় একজন দৈত্য। সুদামা নামে একজন গোপ রাধিকার শাপে অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করে। তখন তার নাম হয় শঙ্খচূড়। তপস্যা বলে শঙ্খচূড় ব্রহ্মার কাছ থেকে এক কবচ লাভ করে দেবতাদের অজেয় হয়। ধর্মধ্বজ বিয়ে হয়। দেবতারা অধিকার হতে চ্যুত হয়ে প্রতিকার প্রার্থনায় ব্রহ্মাও শিবের সঙ্গে বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু বলেন, শঙ্খচূড়ের শাপের অবসান হবার সময় এসেছে। মহাদেব তাঁর শূল দ্বারা এ দানবকে সংহার করবেন। শঙ্খচূড় শিবের প্রদত্ত কবচ ধারণ করে অজেয়; সে কবচ তার কণ্ঠে থকাতে কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। সে জন্য বিষ্ণু ব্রাহ্মণের রূপ ধারণে করে ঐ কবচ চেয়ে নেবেন। আর ব্রহ্মা আরও বর দিয়েছিলেন যে, শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট না হলে কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। এ বিষয়েও একটা উপায় অবলম্বন করতে হবে। এরপর শিব শঙ্খচূড়ের কাছে গিয়ে নানা স্তোতবাক্যে দেবতাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। অসম্মত হওয়ায় তিনি বললেন যে, এর ফলে দেবতারা তার সঙ্গে শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এ যুদ্ধের সময় বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশ ধরে তার কাছ থেকে কবচ গ্রহণ করলেন, এবং শঙ্খচূড়ের রূপ ধরে তুলসির কাছে গিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করলেন। তারপর শিব বিষ্ণু-দত্ত শূল দ্বারা শঙ্খচূড়কে নিহত করলেন। শঙ্খচূড় শাপমুক্ত হয়ে আবার গোলোকে ফিরে গেলেন।
(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

শতধন্বা

শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক-মণি উদ্ধার করে সত্রাজিতকে ফিরিয়ে দেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সত্রাজিত নিজ মেয়ে সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন; কিন্তু শতধন্বা, অক্রুর প্রভৃতি যাদবরাজারা পূর্বেই সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। তাঁদের কারো সঙ্গে সত্যভামার বিয়ে না দেয়ায় তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের সকলের প্ররোচনায় শতধন্বা সত্রাজিতকে বধ করে স্যমন্তকমণি অধিকার করলেন। সত্যভামার কাছ থেকে এ সংবাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করতে মনস্থ করলেন। শতধন্বা এ সংবাদ জানতে পেরে কৃতবর্মা, অক্রুর ইত্যাদির সাহায্য প্রার্থনা করলেন; কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন

না। তখন শতধন্বা অক্রুরের কাছে সে মণি গচ্ছিত রেখে পলায়ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামের সঙ্গে পশ্চাদানুসরণ করে শতধন্বাকে বধ করলেন। (বিষ্ণুপুরা)

শতরূপা

প্রথম নারী। এক বর্ণনা হিসাবে তিনি ব্রহ্মার মেয়ে; ব্রহ্মা মেয়ের সঙ্গে অজাচারে প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের জন্মদান করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি ব্রহ্মার স্ত্রী, কিন্তু মনুর মা নন। মনুর বিবরণ হিসাবে ব্রহ্মা নিজেকে দু অংশে বিভক্ত করেন– নর ও নারী। এদের সঙ্গমের ফলে মনুর জন্ম হয়। এ নারীকে সাবিত্রিও বলা হয়।

মৎস্য পুরাণে আছে, ন জন মানসছেলে সৃষ্টি করার পর ব্রহ্মা এক মেয়ে সৃষ্টি করেন। এ মেয়েই শতরূপা, সাবিত্রি, গায়ত্রি, সরস্বতি ও ব্রাহ্মণি নামে খ্যাত। ব্রহ্মা এ মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁকেই বিয়ে করেন। এ মেয়ের গর্ভে ব্রহ্মা হতে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। অন্য মতে, তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মার মানসছেলেরা প্রজাসৃষ্টি করতে অসম্মত হলে ব্রহ্মা প্রজাবৃদ্ধির জন্য নিজেকে দু ভাগে বিভক্ত করেন– একভাগ নারী (শতরূপা), আর এক ভাগ পুরুষ। স্বায়ম্ভুব মনু হতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দু ছেলে এবং কাকুতি ও প্রসূতি নামে দু মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।

শত্রুঘ্ন

রাজা দশরথের স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভজাত যমজ পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। তিনি লক্ষ্মণ ও রামের অনুগত ও সহায় ছিলেন। রামের বন গমনে পুত্রশোকে দশরথ দেহত্যাগ করেন। তখন শত্রুঘ্ন ভরতের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে ছিলেন। শত্রুঘ্নের সঙ্গে পিতারাজার কনিষ্ঠ ভাইর অন্যতমা মেয়ে শ্রুতকীর্তির বিয়ে হয়। রামের নির্বাসনে তিনি এতদূর বিরক্ত ও মর্মাহত হয়েছিলেন যে সকল অনর্থের মূল কৈকেয়ির দাসি মন্তরাকে নিগৃহিত করেন এবং কৈকেয়িকে কঠোর ভর্ৎসনা করেন।

রাম বনবাসের পর রাজ্যভার গ্রহণ করলে শত্রুঘ্ন ভরতকে রাজকার্যে সহায়তা করেন। একসময় যমুনাতীরবাসি মহর্ষিরা মধুদৈত্যের ছেলে লবণ রাক্ষসের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠলে, শত্রুঘ্ন রামের আদেশে তার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাকে শূলহীন দেখে আক্রমণ করে বিনষ্ট করেন। দেবতা প্রদত্ত শূলের জন্যই মধুদৈত্যের ন্যায় তার ছেলে লবণও অজেয় ছিল। লবণবধের পর শত্রুঘ্ন লবণের মথুরা রাজ্য নিজের ছেলে সুবাহু ও শত্রুঘাতিকে অর্পণ করে। এরপর শত্রুঘ্ন রামের সঙ্গে সরযূ নদীতে প্রবেশ করে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। (রামায়ণ)

শম্বর

শম্বর এক অসুর। কন্দর্প শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে প্রদ্যুম্ন রূপে জন্মগ্রহণ করলে শম্বর প্রদ্যুম্ন হাতে স্বীয় বিনাশের কথা জেনে তার জন্মের ৬ দিনের দিন রজনিযোগে সূতিকাগার হতে প্রদ্যুম্নকে অপহরণ করে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। একটি বৃহৎ মৎস্য তাঁকে ভক্ষণ করেছিলো। পরে ঘটনাক্রমে ঐ মৎস্য ধৃত হয়ে অসুরের গৃহে নীত হলে তার উদরমধ্য হতে বালক বের হয়। কন্দর্প ভস্মের পর তার পত্নী শম্বর ঐ বালকের লাল-পালনের ভার মায়াবতির উপর অর্পণ করেন। মায়াবতি বালকের প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন, সুতরাং বিশেষ যত্নসহকারে বালকের লালন-পালন করে তাঁকে আসুরকি মায়ায় শিক্ষিত করেন। পরে ঐ প্রদ্যুম্ন হাতে শম্বর নিহত হন।

শমিক

শমিক নিরতিশয় ক্ষমাগুণবিশিষ্ট ঋষি। একদিন রাজা পরীক্ষিৎ শিকারে বের হয়ে একটি হরিণকে বাণ বিদ্ধ করেন এবং ঐ হরিণের অনুসরণ করে ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি তখন মৌনব্রত হয়ে ধ্যান মগ্ন ছিলেন। রাজা খুব পিপাসার্ত হওয়ায় জল চাইলেন। ঋষি জল দেননি। মুণির ঐরূপ অযথা কার্যের দণ্ডবিধানের জন্য রাজা ধনুকের অগ্রভাগে একটি মৃতসর্প উত্তোলন করে ঋষির গলায় পরিয়ে দেন।

পরে শমিক পুত্র শৃঙ্গি সহচর মুণিবালকের মুখে বাবার এরূপ অবমাননার কথা শুনে বাবার নিকট যান এবং যথোক্ত রাজদণ্ড প্রত্যক্ষ করে ক্রোধভরে "আজ হতে ৭ দিন তক্ষক সর্প তোমাকে দংশন করবে" এ বলে রাজাকে অভিসাপ দেন। এরপর ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং উপস্থিত ঘটনায় রাজার নির্দোষিতা প্রমাণ করে প্রজার পক্ষে রাজার উপকারিতার বিষয় বহুল পরিমাণে ছেলেকে উপদেশ দেন। এরপর খুব দুঃখিত মনে সে নিষ্ঠুর সংবাদ রাজা পরীক্ষিতের নিকট প্রেরণ করেন।

শর্যাতি

বৈবস্বত মনুর পুত্র। তিনি একবার সেনা-সামন্তের সঙ্গে সপরিবারে চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। শর্যাতির মেয়ে সুকন্যা বাবার সঙ্গে আশ্রমে এসে এক স্থানে উই ঢিবির ভিতর দুটি উজ্জ্বল পদার্থ প্রজ্জ্বলিত দেখে চাপল্যবশত ঐ দুটিকে শলাকাবিদ্ধ করেন। ঐ দু উজ্জ্বল পদার্থই ছিলো চ্যবনের দু চক্ষু। শলাকাবিদ্ধের দরুন হঠাৎ অন্ধ হয়ে চ্যবন ক্রুদ্ধ হলেন। তখন তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য শর্যাতি তাঁর মেয়ে সুকন্যাকে তাঁর হাতে দান করলেন। এতে চ্যবন সন্তুষ্ট হলেন।

শল্য

মদ্রদেশের অধিপতি। তার বোন মাদ্রীর সাথে পাণ্ডুর বিয়ে হয়। দ্রৌপদির স্বয়ম্বর সভায় অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলে অন্য নৃপতিগণ তাঁর প্রতিকূলে যুদ্ধ করতে উদ্যত হন। তৎকালে শল্যও পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে মল্লযুদ্ধে ভিমের নিকট পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্র সময়ে শল্য কৌরবের পক্ষ অবলম্বন করে কর্ণের সারথি হিসেবে কাজ করেন। পরে যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে কৌরবদের সেনাপতি হয়ে যুধিষ্ঠিরের সাথে যুদ্ধ করেন এবং তার হাতে নিহত হন।

শিখণ্ডি

দ্রুপদরাজের মেয়ে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ংবরসভা হতে ভিষ্ম দ্বারা বলপূর্বক অপহৃতা হন। চিরকুমার ভিষ্ম বৈমাত্রেয় ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য এ তিন মেয়েকে অপহরণ করেন, পূর্বে অম্বা মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরভ করেছিলেন বলে ভিষ্ম এঁকে শাল্বর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি ভিষ্ম দ্বারা প্রথমে অপহৃতা হওয়ায় শাল্ব এঁকে আর বিয়ে করতে সম্মত হন না। 'সত্যের জয় এক দিন হবেই হবে'– এ কথা বলে অম্বা রাগে ও দুঃখে শাল্বরাজের প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন। ভিষ্মই তাঁর দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ মনে করে অম্বা ভিষ্মের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভিষ্মের অস্ত্রশিক্ষক পরশুরামের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে। পরশুরাম ভিষ্মকে বলেন যে, তুমি অম্বাকে অপহরণ করেছিলে বলে শাল্বরাজ অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতএব আমার আদেশে তুমি অম্বাকে গ্রহণ কর। ভিষ্ম পরশুরামের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন বলে তিনি ভিষ্মের গুরু। গুরুর আদেশ পালন করতে ভিষ্ম অসম্মত হন। তখন পরশুরামের সঙ্গে ভিষ্মের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু এ যুদ্ধে কারও জয়লাভ হয় না। দু জনই পরস্পরের অবধ্য। তখন পরশুরাম অম্বাকে বলেন, অম্বার এখন ভিষ্মের শরণ নেওয়া উচিত। কিন্তু অম্বা এতে সম্মত না হয়ে ভিষ্মকে যুদ্ধে নিপাতিত করবেন বলে স্থির করেন। ভিষ্মের মৃত্যুর জন্য অম্বা কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তপস্যায় রত হয়ে তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে করতে তিনি গঙ্গার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। গঙ্গায় স্নান করার পর গঙ্গাদেবি অম্বার কঠোর তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভিষ্মই তার এ দুর্দশার কারণ এবং তাঁর মৃত্যুর জন্যই অম্বা কঠোর তপস্যায় নত হয়েছেন– তাই জানালেন। আটবসুর মধ্যে এক বসু ভিষ্ম–গঙ্গার ছেলে। গঙ্গা অম্বার মূর্খতার জন্য তিরস্কার করে এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হতে বিরত হতে বললেন।

এরপর অম্বার তপস্যা ও প্রার্থনায় আকৃষ্ট হয়ে মহাদেব অম্বার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ভিষ্মহত্যাই অম্বার একমাত্র কামনা– এ বর মহাদেবের কাছ থেকে তিনি প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তিনি তো সামান্য নারী, কেমন করে তিনি ভিষ্মের মতো যোদ্ধাকে নিহত করবেন। উত্তরে মহাদেব বললেন– অম্বার নবজন্ম হবে এবং কিছুদিন পরে পুরুষ রূপ প্রাপ্ত হবেন। তখন যোদ্ধা হিসাবে অম্বা ভিষ্মকে নিহত করবে এবং বর্তমান দেহের সব ঘটনাই তাঁর মনে থাকবে। এ কথা বলে মহাদেব অদৃশ্য হলে অম্বা সন্তুষ্ট চিত্তে যমুনা তীরে চিতা প্রজ্বলিত করে অগ্নির মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

এ সময় দ্রুপদরাজের কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে বর দেন, দ্রুপদরাজের প্রথকে মেয়ে হবে, সে মেয়ের পরে ছেলেরূপ গ্রহণ করবে। অপুত্রক দ্রুপদরাজের প্রথম মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে তিনি পুত্রোচিত জাতকর্ম করেন এবং প্রচার করেন যে, তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। তাঁর নাম রাখা হয় শিখণ্ডি। এ শিখণ্ডিই অম্বা। পরে মহাদেবের বরে শিখণ্ডি পুরুষই হবে ভেবে দ্রুপদের স্ত্রী দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার মেয়ের সঙ্গে শিখণ্ডির বিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিন পরে হিরণ্যবর্মা মেয়ের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হয়ে দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তাঁর জন্যই এ যুদ্ধ ও বাবা-মা দুঃখ ভোগ করেছেন– এ মনে করে শিখণ্ডি অরণ্যে গিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করেন। সে অরণ্যে কুবেরে অনুচর স্থূনাকর্ন নামে এক যজ্ঞ বাস করত। সে শিখণ্ডির কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে কিছুকালের জন্য নিজের পুরুষত্ব শিখণ্ডিকে দান করে স্ত্রী হয়ে থাকে। সে শিখণ্ডিকে বলে, তিনি যেনো তাঁর বাবাকে হিরণ্যবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করে ফিরে এসে তার পুরুষত্ব প্রত্যার্পণ করেন। কিছুকাল পরে কুবের স্থূণাকর্ণের গৃহে এসে স্থূণাকর্ণ স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে দেখে রেগে গিয়ে তাকে শাপ দেন, সে যেনো স্ত্রী হয়ে চিরকাল বাস করে এবং শিখণ্ডি পুরুষ হয়েই থাকে। শিখণ্ডির মৃত্যুর পর সে যেনো তার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এরপর শিখণ্ডি দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং পৌরুস পেয়ে রথীশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভিষ্ম জানতে পারেন যে অম্বা শিখণ্ডিরূপে পরিণত হয়েছে এবং তাঁকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। যৌবনে কুরুক্ষেত্র স্ত্রীলোকের, ক্লীবের বা যে স্ত্রী পুরুষ হয়েছে বা অস্ত্রহীনের সঙ্গে তিনি কখনও যুদ্ধ করবেন না। দশ দিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মাত্মা ভিষ্মের ইচ্ছামৃত্যু মনে জাগে। এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরত কালে শিখণ্ডি নটি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর বক্ষ বিদ্ধ করেন এবং তাঁকে সম্মুখে রেখে অর্জুন ভিষ্মকে শরাঘাতে জর্জরিত করেন। এরূপে ভিষ্মের পতন সম্ভবপর হয়। নিদ্রিত শিবিরবাসীদের অতর্কিত আক্রমণ করলে শিখণ্ডি দ্রৌপদির পাঁচ অশ্বত্থামার প্রতি বাণ বর্ষণ করতে থাকেন, কিন্তু অশ্বত্থামার খড়্গাঘাতে শিখণ্ডি নিহত হন।

বেদবিভাগকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কামনালব্ধ বরপুত্র। ছেলে কামনায় ব্যাসদেবের সুমেরু পর্বতে মহাদেবের তপস্যা করছিলেন। অগ্নি, বায়ু, ভূমি ও আকাশের মতো পবিত্র ও বীর্যশালি এক ছেলে হোক– মনে এ সংকল্প করে ব্যাসদেব সুমেরু পর্বতে তপস্যায় নিযুক্ত হন। শতবর্ষ কাল আরাধনার পর মহাদেব ব্যাসকে বললেন, আমার বরে তোমার তেজোময়, কীর্তিমান, বিক্রমশালি এক ছেলে হবে। এ বর পেয়ে ব্যাস নিজ আশ্রমে ফিরে এসে হোম করতে লাগলেন। বেদব্যাস হোমের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করার সময়, ঘৃতাচি নামে এক অপ্সরা এসে উপস্থিত হন। অপ্সরার রূপে কামাবিষ্ট হওয়ায় বেদব্যাসের চিত্তচাঞ্চল্য হলো। এ চাঞ্চল্যের বেদ দমন করতে না পারায় তাঁর বীর্য অরণির মধ্যে পতিত হয়। বেদব্যাসের এ অবস্থা দেখে ভীতচিত্ত অপ্সরা শুকপক্ষির রূপ ধরে সেখান হতে প্রস্থান করে। বেদব্যাস প্রবল বেগে অরণি মন্থন করতে থাকেন। তার ফলে যজ্ঞকাষ্ঠ হতে প্রজ্বলিত অগ্নির মতো শুকদেব নিজের তেজে বহির্গত হয়ে আসেন। ঘৃতাচি শুকপক্ষির রূপ ধারণ করে এ স্থান হতে প্রস্থান করেছিলেন বলে এ পুত্রের নাম হলো শুক। তখন গঙ্গা মূর্তিমতি হয়ে এ শিশুকে স্নান করালেন। মহাদেব স্বয়ং শুকদেবের। উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। আকাশ হতে ব্রহ্মচারির ধারণযোগ্য কৃষ্ণাজিন পতিত হলো। ইন্দ্র তাঁকে কমণ্ডলু ও দিব্য অস্ত্র দিলেন। শুকদেব বাবার নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা করতে লাগলেন এবং বৃহস্পতির কাছে সকল বেদাদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। বাবা মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভের জন্য শুকদেবকে মিথিলার রাজা জনকের গিয়ে তিনি মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন। তারপর তিনি হিমালায়ে বাবার কাছে উপস্থিত হন। সেখানে বাবার চার শিষ্যের সঙ্গে শুকদেব বেদ অধ্যয়ন করলেন। এ স্থানে নারদ শুকদেবকে নানা উপদেশ দান করেন। এরপর তিনি স্থির করলেন, যোগবলে দেহত্যাগ করবেন। যোগবলম্বন করে তিনি ব্রহ্মত্বলাভ করলেন। (মহাভারত–শান্তিপর্ব)

তিনি এমন জিতেন্দ্রিয় ও নির্বিকার ছিলেন যে, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরারা তাঁর তপোভঙ্গ করতে নিষ্ফল তো হলেনই এমন কি শুকদেবের সমক্ষে তারা নগ্নাবস্থায় থাকতেও লজ্জাবোধ করতেন না। তারপর শুকদেব কৈলাস শিখর হতে যোগবলে সূর্যাভিমুখে যাত্রা করে বায়ুমণ্ডলের উর্ধলোকে গিয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। স্নেহবিহ্বল বাবা ব্যাসদেবের কাতর আহ্বান শুনে স্থাবর-জঙ্গম প্রতিধ্বনিত করে শুক 'ভো' উত্তর দেন। সে থেকে গিরিগুহা প্রভৃতি স্থানে এ শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শুক্র ভৃগুর পুত্র। সে জন্য তিনি ভার্গব নামে পরিচিত। তিনি দৈত্যরাজ বলির গুরু ও দৈত্যদের পুরোহিত ও গুরু ছিলেন। তিনি শ্বেতরঙ ও শ্বেতবস্ত্রধারি। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্র প্রবক্তা। শুক্রাচার্য দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণ বামনরূপে বলিকে ছলনা করতে এসে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলে শুক্রাচার্য বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ বলিকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপাদ ভূমি দানে বলিকে বিরত করতে চান। বিরত না হয়ে বলি যখন জল নিয়ে দান করতে উদ্যত হন, তখন শুক্রাচার্য মক্ষিকারূপে ভৃঙ্গারে প্রবেশ করে জল রোধ করেন। বামন তা জানতে পেরে ভৃঙ্গারের ভিতর কুশ বিদ্ধ করতে উদ্যত হন। এরূপে তার মধ্যে কুশ প্রবেশ করাতে মক্ষিকারূপধারি শুক্রের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শুক্রাচার্য জ্ঞাত সঞ্জীবনি বিদ্যার প্রভাবে মৃতদেব পুনর্জীবিত করতে পারতেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে কচ এ বিদ্যালাভ করার জন্য শুক্রের শিষ্য ও তাঁর মেয়ে দেবযানির ভক্ত হন। কচকে দৈত্যরা বারবার হত্যা করতো, আর দেবযানির অনুরোধে শুক্রাচার্য প্রতিবার কচকে পুনর্জীবিত করতেন। শেষ বারে দৈত্যরা কচকে দগ্ধ করে তাঁর ভস্ম সুরার সঙ্গে মিশ্রিত করে শুক্রকে পান করায়। তখন দেবযানির কাতর অনুরোধে শুক্র উদরস্থ কচকে মৃতসঞ্জীবনি বিদ্যা দান করলেন এবং কচকে বললেন, সে যেনো তাঁর উদর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাঁর অর্জিত মৃত-সঞ্জীবনি বিদ্যা দ্বারা শ্রক্রকে জীবিত করে। তাঁর নিজের দেহ বিভক্ত করার ফলে াকচ বহির্গত হন এবং শুক্রাচার্য প্রাণত্রাগ করেন। কচ বহির্গত হয়ে মৃতসঞ্জীবনি বিদ্যার প্রভাবে শুক্রকে জীবিত করেন। শুক্রের ছেলে ষণ্ড ও অমর্ক হিরণ্যকশিপুর আদেশে তৎপুত্র প্রহলাদের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হন। রাজা যযাতি দেবযানিকে বিয়ে করেন। তাঁর অন্য স্ত্রী শর্মিষ্ঠার ওপর পক্ষপাতমূলক অনুরাগ ছিল বলে, দেবযানি নিজেকে অপমানিত মনে করেন। এতে রেগে গিয়ে শুক্রাচার্য যযাতিকে অভিশাপ দিয়ে জরাগ্রস্ত করেন।

হরিবংশে বৃত্তান্ত আছে একবার অসুররা দেবতাদের পরাজিত করে ত্রিলোক বলির অধিকারে থাকবার পর বিষ্ণু দৈত্যরাজ বলিকে ছলনাপূর্বক স্বাধিকারচ্যুত করে ইন্দ্রকে ত্রিলোকের অধিপতি করেন। তখন তিনি দেবতাদের খর্ব করার জন্য মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেবের কাছে তিনি এমন মন্ত্র প্রার্থনা করেন– যা দেবগুরু বৃহস্পতির অজ্ঞাত এবং অসুরদের জয় অবশ্যম্ভাবি। মহাদেব আদেশ দিলেন, শুক্রাচার্য যদি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচারি হয়ে অধোমুখে

থেকে কুণ্ডের ধূমপান করে তপস্যা করতে পারেন, তাই তাঁর প্রার্থনা মতো মন্ত্র বা বর তিনি পাবেন। তাঁর এ অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে দেবতারা অসুরদের আক্রামণ করেন। বিষ্ণু শুক্রাচার্যের মার শিরচ্ছেদ করলেন; এ কারণ শুক্রের বাবা ভৃগু রেগে গিয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন, এ স্ত্রী-বধ-জনিত পাপের জন্য তাঁকে সাতবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তিনি শুক্র-এাকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু সমস্ত দেবতা, বিশেষত ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে পড়েন, পাছে শুক্রাচর্য তাঁর ইপ্সিত বর মহাদেবের কাছ হতে প্রাপ্ত হন। তখন ইন্দ্র শুক্রকে প্রলুব্ধ করার জন্য নিজ মেয়ে জয়ন্তিকে শুক্রের কাছে প্রেরণ করেন। জয়ন্তিও পরম ভক্তিভরে শুক্রের সেবা করতে থাকেন। এদিকে দির্ঘকাল তপস্যার পর শুক্রচার্য তাঁর প্রার্থিত বর পেলেন এবং ইন্দ্রমেয়ে জয়ন্তির ইচ্ছানুসারে তিনি অদৃশ্য হয়ে দশ বৎসর তাঁর স্ত্রীরূপে তাঁকে গ্রহণ করলেন। জয়ন্তির মায়ায় অসুররাও শুক্রকে পেল না। এ সুযোগে দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রের রূপধারণ করে অসুরদের কাছে এলেন এবং অসুররা তাঁকে প্রকৃত শুক্র ভেবে সংবর্ধনা করল। দশ বৎসর অদৃশ্য অবস্থায় শুক্র জয়ন্তির মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কাটালেন এবং জয়ন্তির গর্ভে তাঁর দেবযানি নামে এক মেয়ে হলো। দশ বৎসর পরে তাঁর মোহ কেটে গেলে তিনি অসুরদের কাছে ফিরে এলেন কিন্তু ছদ্মবেশি শুক্রাচার্যের প্ররোচনায় অসুররা প্রকৃত শুক্রাচার্যকে বিতাড়িত করল। তখন প্রকৃত শুক্রাচার্য এ কাজের জন্য অসুরদের অভিশাপ দিলেন– তাঁকে অপমান করায় অচিরেই অসুররা জ্ঞানভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হবে। অভিশপ্ত অসুররা বৃহস্পতির মায়া বুঝতে পেরে দলবদ্ধভাবে শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁর কোপ শান্ত করেন।

মহাভারতে আছে– অসুররা দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুক্রের মার (ভৃগুপত্নীর) আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন নি, সে জন্য বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীর শিরচ্ছেদ করেন। বিষ্ণু শুক্রের মাকে বধ করার জন্য শুক্র দেবদ্বেষি হন। একদিন তিনি যোগবলে কুবেরকে বদ্ধ করে তাঁর সমস্ত ধন অপহরণ করেন। কুবেরের অভিযোগ শুনে মহাদেব শূল-হাতে শুক্র-নিধনে এলেন। তখন শুক্র শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। তখন মহাদেব শুক্রকে ধরে গ্রাস করে ফেললেন। তারপর মহাদেব মহাহ্রদের জল মধ্যে দশ কোটি বৎসর তপস্যা করলেন। তাঁর জঠরে থাকায় শুক্রেরও উৎকর্ষ লাভ হলো। এরপর শুক্র মুক্তির জন্য মহাদেবের কাছে বার বার প্রার্থনা করতে লাগলেন। মহাদেব তাঁকে বললেন– আমার শিশ্ন দিয়ে তুমি নির্গত হও। শিশ্ন পথে নির্গত হওয়ায় তাঁর নাম হলো শুক্র।

শ্বেতবাহন

অর্জুন দেখুন।

শ্রীবৎস

তিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম চিন্তা। একবার শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ– এ নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে ধার্মিক শ্রীবৎসকে এর মীমাংসার জন্য অনুরোধ করা হয়। দেবতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট বলা অসঙ্গত মনে করে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের দুটি সিংহাসন নির্মাণ করান। নির্দিষ্ট দিনে লক্ষ্মী এসে স্বর্ণ সিংহাসনে ও শনি রৌপ্য সিংহাসনে বসলেন। এতে সহজেই দু জনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। লক্ষ্মী প্রীত হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ শনি রাজার অনিষ্ট চেষ্টায় নিরন্তর ছিদ্র সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন শ্রীবৎস আহারের পর পাদপ্রক্ষালন করতে ভুলে গেলে, সে রন্ধ্রের সাহায্যে শনি তাঁর দেহে প্রবেশ করেন। শনির প্রভাবে শ্রীবৎস দিন দিন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ক্রমে ক্ষমতাচ্যুত হন। অবশেষে এক কাঁথার মধ্যে রত্নরাজি বেঁধে সস্ত্রীক রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পথে শনি এক মায়া-নদী সৃষ্টি করে স্বয়ং একটি জীর্ণ নৌকো নিয়ে উপস্থিত হন। নৌকোটি অতি জীর্ণ হওয়ায় এবং একটির অধিক পণ্য তাতে বহন করা সম্ভব নয় বলে শ্রীবৎস প্রথমে কাঁথায় জড়ানো রত্নরাজি নৌকোয় তুলে মাঝিকে সেটি অন্য পারে রেখে আসতে বলেন। শনি সে কাঁথা সমেত নৌকো করে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নৌকো সমেত অদৃশ্য হয়ে যান। তখন নিঃস্ব শ্রীবৎস সস্ত্রীক এক কাঠুরিয়ার গৃহে আশ্রয় নেন।

এতেও শনির ক্রোধ শান্ত হয় না। তিনি স্বামি স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করতে থাকেন। একদিন শ্রীবৎসম কাষ্ঠ সঙগ্রহের জন্য বনে গেলে এক মহাজনের নৌকো চড়ায় আটকে যায়। তখন শনি সেখানে দৈবজ্ঞের বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, কাঠুরিয়া পল্লিতে এক সতী আছেন, তিনি এসে নৌকো স্পর্শ করলেই নৌকো আবার চলবে। মহাজনের অনুরোধে চিন্তা নৌকো স্পর্শ করা মাত্র নৌকো ভেসে উঠল। আবার যদি নৌকো কখনো চড়ায় আটকে যায়, এ আশঙ্কায় মহাজন চিন্তাকে সবলে নৌকোয় তুলে নিলেন। চিন্তা তখন সূর্যের স্ত ব করে কুরূপা হবার প্রার্থনা করলেন। ফলে কুরূপা হওয়াতে তাঁর সতীত্ব নাশের কোন ভয় রইল না।

এদিকে শ্রীবৎস ঘরে এসে চিন্তাকে দেখতে না পেয়ে, চিন্তার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে এক রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। সে দেশের রাজকন্যা ভদ্রা

শ্রীবৎসকে বরমাল্য প্রদান করেন। শ্রীবৎস রাজকন্যার সাহায্যে রাজাকে অনুরোধ করিয়ে, নদীতীরে বাণিজ্যতরির শুল্ক সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে অনেক দিন পর অনুসন্ধান করতে করতে সে পূর্বেকার মহাজনের নৌকায় তিনি চিন্তাকে দেখতে পান। শ্রীবৎসের পরিচয় পেয়ে রাজা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। সূর্যের কৃপায় চিন্তা আবার তাঁর পূর্বশ্রী স্বরাজ্যে এসে লক্ষ্মীর কৃপায় হৃতরাজ্য আবার ফিরে পেলেন।

শাকটায়ন

একজন প্রাচীনকালের বৈয়াকরণ। শাকটায়ন কোন্ প্রদেশে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যে শাকটায়নের নাম আছে। ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন– ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অথর্ববেদ সর্বাপেক্ষা আধুনিক। তাঁরা খ্রিস্টের জন্মগ্রহণের দু সহস্র বছর আগে অথর্ববেদ রচিত হয়েছে এরূপ অনুমান করেন। শাকটায়ন বৈদিকালের অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহর্ষি পাণিনি খ্রিস্টের জন্মের ৪৭৬ কি ৪৭৮ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। পাণিনি তাঁর নিজ ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ির মধ্যে অনেক প্রাচীন বৈয়াকরণের মত উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে– "ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য"। ৮/৪/৫০ এ সূত্রে শাকটায়নের নাম দেখা যায়। শাকটায়ন পাণিনির বহু শতাব্দী আগের। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব খ্রিস্টের ১২ শতাব্দীর গ্রন্থকার, তিনি তাঁর "কবিকল্পদ্রুমের" মধ্যে যে আটজন শাব্দিকের কথা বলেছেন তন্মধ্যে আপিশলি ৪র্থ ও শাকটায়ন ৫ম। বোধ হয় তিনি প্রাচীনতা অনুসারেই নামগুলো নির্দেশ করে থাকবেন। তা হলে আপিশলি শাকটায়নের আগের। পাণিনিও– "বা সুপ্যাপিশলেঃ"। ৬।১।৯২ এ সূত্রে আপিশলির মত উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন– "মহর্ষি পাণিনি নিজ ব্যাকরণ মধ্যে গার্গ, গালব, স্ফোটায়ন, আপিশলি, শাকটায়ন প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির মত উল্লেখ করেছেন তাদের কোন পৃথক ব্যাকরণ ছিলো না, তাঁরা ব্যাকরণ সংক্রান্ত এক একটা বিষয়ে যে মত প্রকাশ করতেন তাই পাণিনি উল্লেখ করেছেন মাত্র"।

শালিবাহন

একজন প্রসিদ্ধ ভূপতি। প্রতিষ্ঠান নগরে শেষ নাগেন্দ্রের ঔরসে কোন ব্রাহ্মণির গর্ভে এ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। নাগেন্দ্র নাগবংশিয় কোন রাজা। প্রাচীন সংস্কৃত

গ্রন্থে অনেক নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগকন্যা উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছিলেন। ললিত বিস্তর নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ও পুরাণাদিতে অনেক নাগবংশ ও নাগভূপতির বৃত্তান্ত লেখা আছে। প্রতীচ্য ঐতিহাসিকগণের মতে "নাগজাতি ভারতবর্ষের আদিম নিবাসি। আর্য জাতির আগমনের আগে এরাই এদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে শাসন করতেন। আর্যগণ আগমন করলে বিয়ের সূত্রে তাঁদের সাথে মিশে যায়। নাগরাজের বোন কুমুদ্মতীর সাথে কুশের বিয়ে ও নাগরাজ মেয়ে জাম্ববতির সাথে কৃষ্ণের বিয়ে, নাগকন্যা উলুপি ও চিত্রাঙ্গদার সাথে অর্জুনের বিয়ে সমুদয়ই আর্যজাতির সাথে নাগজাতির মিলনের পরিচায়ক। প্রতিষ্ঠান নগর মধ্যভারতের অধ্য ভারতেও যে অনেক নাগজাতির বাস ছিল। 'ললিত বিস্তরে' ও অন্যান্য গ্রন্থে এর বিবরণ পাওয়া যায়। এ দ্বারা অনুমান করা যায় শালিবাহন কোন নাগরাজ হতে ব্রাহ্মণিরগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে শালিবাহন যে দিন জন্মগ্রহণ করেন সে দিন উজ্জয়িনী নগরিতে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত চিন্তিত হন এবং একজন দৈবজ্ঞকে এ বিষয় প্রশ্ন করেন। দৈবজ্ঞ গণনা করে বলেন– "মহারাজ! প্রতিষ্ঠান নগরে শালিবাহন নামক এক শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে তৎকর্তৃক আপনার জীবন নাশের সম্ভাবনা আছে, এ কারণে এরূপ ভূমিকম্প হয়েছে।" তা শুনে বিক্রমাদিত্য কিছু সময় বিষণ্নভাবে থাকনে। তারপর শালিবাহন প্রাপ্তবয়স্ক হলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। একদিন খড়্গ হাতে প্রতিষ্ঠান নগরে উপস্থিত হন। বিক্রমাদিত্য ভেবেছিলেন এ তরুণমতি শালিবাহনকে বিনা আড়ম্বরে অনায়াসে হত্যা করতে পারবেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হয়। শালিবাহন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিক্রমাদিত্য স্বয়ংই বিনাশ প্রাপ্ত হন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিহত হলে উজ্জয়িনী রাজধানী শালিবাহন অধিকৃত হয়। বিক্রমাদিত্যের জন্ম হতে যে বছর গণনা করা যায় এর নাম সংবৎ। অতএব বর্তমান সময় হতে অনুন্য ২০০০ বছর আগে বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন বিধ্যমান ছিলেন। শালিবাহন একজন মহাপরাক্রমশালি ভূপতি ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে তিনি এ সময় দ্বিগ্বিজয়ে বের হন। বহু দেশ জয় করে শেষে হুনদেশে গমন করেন এবং সেখানে ম্লেচ্ছধর্ম প্রচারক কুমারি গর্ভসম্ভূত মহাত্মা ঈশকৃষ্ণের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শালিবাহন ঈশকৃষ্ণকে ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করেন। ঈশকৃষ্ণ তাঁর নিকট ম্লেচ্ছধর্মের মত ব্যক্ত করেন। শালিবাহন ঈশকৃষ্ণকে হুনদেশে থাকতে অনুরোধ করেন এবং ভারতে আসতে নিষেধ করেছিলেন। ঈশকৃষ্ণও সে দেশেই থাকতেন।

শালিবাহন যে অব্দ প্রচলিত করেন এর নাম শক। শালিবাহনের অনেক কীর্তি আছে। প্রতিষ্ঠান নগর তাঁর রাজধানি ছিল। মধ্য ভারতবর্ষে প্রয়াগের অনতি দূরে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান (পৈঠান)। নগরির ভগ্নাবশেষ উক্ত নগরির পূর্ব গৌরব ঘোষণা করছে।

শিব

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব বা শিবের স্থান অতি উচ্চে। তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও মহাদেব সংহারকর্তা। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। ধনুকের নাম পিনাক। তাঁর বিশ্বধ্বংসি অপর অস্ত্র পাশুপত– যা তিনি অর্জুনকে দান করেছিলেন। প্রলয়কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ধ্বংস কাজে নিযুক্ত হবেন। তিনি বদান্য, সহজে সন্তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ।

শুম্ভ

তিনি একজন অসুর। তিনি নিশুম্ভের ভাই। তাঁরা দুজনেই পাতালে বাস করতেন। একসঙ্গে বসে তাঁরা অযুত বর্ষ তপস্যা করায় ব্রহ্মা প্রীত হয়ে তাঁদের বর দিতে চাইলে, তাঁরা অমরত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁরা এ বর ব্রহ্মার কাছ থেকে না পাওয়ায়, আবার প্রার্থনা করেন, তাঁদের যেনো মৃত্যু না হয়। তখন ব্রহ্মা তাঁদের সে বর দেন। দানবরা স্বর্গ অধিকার করতে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে ইন্দ্র, বায়ু, কুবেরাদিকে পরাস্ত করে ত্রিলোক ভোগ করতে থাকেন। তাঁদের পীড়নে ত্রিলোকে বিপর্যয় ঘটতে থাকায় দেবতারা নিরুপায় হয়ে বৃহস্পতির পরামর্শে দেবি ভগবতির আরাধনা করতে থাকেন, দেবি দ্বারা প্রথমে নিশুম্ভও শেষে শুম্ভ নিহত হন।

শূলপাণি

শিব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর কৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ গঙ্গায় তর্পণ করার জন্য যাত্রা করেন। সে সময় শিবকে পাণ্ডব পুরির রক্ষক হিসেবে থাকতে অনুরোধ করেন। ত্রিশূল হাতে মহারুদ্র শিব প্রহরিরূপে পাণ্ডবপুরি রক্ষা করেছিলেন।

শূর্পণখা

রাবণের বোন। কালকেয় বংশের রাক্ষসরাজ বিদ্যুৎ জিহ্ব তার স্বামি। রাবণের দিগ্বিজয় অভিযান কালে কালকেয়দের সাথে যুদ্ধের সময় ভুলে বিদ্যুৎজিহ্ব নিহত হয়। অনুতপ্ত রাবণ বিধবা বোনকে দণ্ডকারণ্যে ইচ্ছামতো বিবাহের অনুমতি দেন

এবং জেনারেল খর ও জেনারেল দূষণ নামে দু সেনাপতিকে তাঁর রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। রামের বনবাসকালে রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে শূর্পণখা তাঁকে বিয়ে করতে চান। রাম তাঁকে লক্ষ্মণের কাছে পাঠালে লক্ষ্মণও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন শূর্পণখা রাগ করে সীতাকে খেতে চাইলে লক্ষ্মণ খড়গাঘাতে তাঁর নাক-কান কেটে তাড়িয়ে দেন। শূর্পণখা খর ও দূষণের কাছে এ অপমানের কথা বলে এর প্রতিকার চাইলে তাঁরা রামকে আক্রমণ করেন এবং রামের হাতে নিহত হন। শূর্পণখা উদ্বিগ্ন হয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে সব ঘটনা জানিয়ে সীতাকে অপহরণ করতে উত্তেজিত করেন। ফলে সীতার অপহরণ ও রাবণের সবংশে নিধন হয়।

ষণ্ড

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দু ছেলে। এ দু ভাই হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহলাদের শিক্ষক ছিল। বরাহকল্পে দেবাসুরের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে দেব পক্ষে থেকে এরা যুদ্ধ করে। প্রথমে এরা অসুরদেরই সেনাপতি ছিল এবং দেবতাদের পরাজিত করে। তখন দেবতারা মন্ত্রণা করে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ষণ্ডামার্ককে এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত করেন। এ দু জনকে অমৃত পান করিয়ে দেবতারা এদের অসুর পক্ষ ত্যাগ করতে অনুররোধ করেন। অমৃত তখন অমুর পক্ষ ত্যাগ করে। ফলে দেবতারা অসুরদের পরাজিত করেন। (বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণ)

ষোড়শি

(১) দেবি শতাক্ষির (দুর্গাদেবির এক নাম) দেহ হতে উৎপন্ন এক মহাশক্তি।
(২) দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত তৃতীয় মহাবিদ্যা।

সংজ্ঞা

বিশ্বকর্মার মেয়ে ও সূর্যের স্ত্রী। সূর্যের ঔরসে তাঁর গর্ভে তিনটি সন্তান হয়– বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা। বিবস্বতের ছেলে বলে মনু, যম ও যমুনা। বিবস্বতের ছেলে বলে মনু বৈবস্বত নামে খ্যাত হন। সংজ্ঞা সূর্যের অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে সূর্যকে দেখলে চক্ষু নিমীলিত করতেন। এ জন্য সূর্য রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন, সংজ্ঞা তাঁর চক্ষু সংযমন করার জন্যে প্রজাদের সংযমনকারি যমকে প্রসব করবেন। তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে সংজ্ঞা চপলভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তাঁর এ চপল চক্ষু দেখে সূর্য বললেন যে, তিনি চঞ্চলস্বভাবা নদীকে প্রসব করবেন। তখন চঞ্চলা যমুনার জন্ম হলো। পরে স্বামির কোপ হতে রক্ষা পাবার জন্য নিজের অনুরূপ ছায়া নামে এক নারীকে সৃষ্টি করে সূর্যের কাছে রেখে

ও তাঁর ওপর নিজের ছেলে-মেয়ের পরিচর্যার ভার দিয়ে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে ফিরে যান কনার আগমনে বিশ্বকর্মা অসন্তুষ্ট হয়ে মেয়েকে সূর্যের কাছে ফিরে যেতে বলেন; কিন্তু স্বামির কাছে না গিয়ে সংজ্ঞা উত্তর কুরুবর্ষে ঘোটকির রূপ ধরে ভ্রমণ করতে থাকেন। এদিকে সূর্য ছায়াকে সংজ্ঞা জ্ঞানে তাঁর গর্ভে ছেলেমেয়ের জন্মদান করলেন; কিন্তু ছায়া নিজের সন্তানদের মতো সংজ্ঞার সন্তানদের প্রতিপালন করতেন না। এতে যম একদিন রেগে গিয়ে বিমাতাকে পদাঘাত করতে উদ্যত হন। পরমুহূর্তেই যম ছায়ার ক্ষমা প্রার্থনা দিলেন যে, তাঁর পদ খসে যাবে। যম সূর্যের কাছে বিমাতার এ শাপের কথা প্রকাশ করলে সমস্ত বিবরণ গোপন রেখে ছলনা করবোর জন্য সূর্য ছায়াকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন ছায়া সমস্ত কথা স্বীকার করে সংজ্ঞার পিতৃগৃহে গমনের সমস্ত সংবাদ সূর্যকে বলে দেন। সূর্য বিশ্বকর্মার কাছে স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের সম্বন্ধে অভিযোগ করায় বিশ্বকর্মা তাঁকে বলেন– সংজ্ঞা তোমার তেজ সহ্য করতে না পেরে আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে ভর্ৎসনা করে তোমার নিকট পুনরায় প্রেরণ করেছি। তখন সূর্য সমাধিস্থ হয়ে সংজ্ঞার ঘোড়ারূপ ধারণ দেখতে পেলেন। এরপর সূর্য বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে নিজের তেজ কর্তন করে ঘোড়ারূপ ধারণ করে ঘোটকিরূপিণি সংজ্ঞার কাছে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। মিলনের ফলে প্রথমে যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমার ও পরে রেবন্তের জন্ম হলো। এরপর সূর্য তাঁর তেজ সংহত করাতে সংজ্ঞা নিজের রূপ ধারণ করে স্বামিগৃহে ফিরে এলেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

সংবরণ

চন্দ্রবংশিয় একজন রাজা; সূর্যের তপতি নামে এক মেয়ে ছিল। সূর্যভক্ত রাজা সংবরণ প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতেন। তিনি ধার্মিক, রূপবান ও খ্যাতিমান বংশের রাজা বলে সূর্য তাঁকে মেয়েদান করতে মনস্থ করলেন। এক দিন শিকারকালে সংবরণের ঘোড়া পিপাসার্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। এ সময় সংবরণ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে এক অসামান্য রূপবতি মেয়েকে দেখতে পান এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তপতি বাবাকে তপস্যার প্রীত করে তাঁকে উর্ধ্ব মুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে পুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষিকে যোগবলে স্মরণ করতে বললেন। বশিষ্ট যোগবলে সংবরণের আকাঙ্ক্ষা জানতে পেয়ে সূর্যের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, আপনার তপতি নাম্নী কন্যাকে মহারাজ সংবরণের জন্যে প্রার্থনা করছি। সূর্য সম্মত হয়ে তপতিকে নিয়ে এলে সংবরণ এঁকে বিয়ে করলেন। তপতিকে স্ত্রী রূপে পেয়ে সংবরণ মন্ত্রির উপর রাজ্যভার দিয়ে বনে উপবলে স্ত্রীর সঙ্গে বার বৎসর বাস করলেন। সংবরণকে এরূপ

ভোগসুখে মত্ত দেখে ইন্দ্র ক্ষুণ্ন হলেন। ইন্দ্রের অভিশাপে সে বারো বৎসর রাজ্যে এক বিন্দু বৃষ্টিপাত হলো না। স্থাবর-জঙ্গম সহ সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল। লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে ছেলেমেয়ে ত্যাগ করে চারদিকে বিচরণ করতে লাগল। বশিষ্ঠ তখন সংবরণ ও তপতিকে রাজপুরিতে ফিরিয়ে আনলেন। তখন ইন্দ্র আবার বারি বর্ষণ করলেন, চারদিকে শস্য উৎপন্ন হলো। তপতির গর্ভে কুরু নামক এক ছেলে জন্মগ্রহণ করল। সে থেকেই কুরুবংশের উদ্ভব। (মহাভারত-আদি)

সতী

ব্রহ্মার অন্যতম মানসছেলে দক্ষপ্রজাতির মেয়ে ও মহাদেবের স্ত্রী। দক্ষ মহামায়াকে মেয়েরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। মহামায়া এতে সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। দক্ষ বর প্রার্থনা করলেন মহামায়া যেনো তাঁর মেয়েরূপে জন্মগ্রহণ করে শিবের স্ত্রী হন। মহামায়া এ বরে সম্মত হয়ে বললেন, আমার প্রতি কখনও অন্যায় ব্যবহার করলে আমি দেহত্যাগ করবো। দক্ষ প্রজা সৃষ্টির মানসে বীরমেয়ে বীরিণি বা অসিক্নীকে বিয়ে করেন। তাঁরই গর্ভে এক মেয়ের জন্ম হয়। দক্ষ এ মেয়ের নাম রাখলেন সতী। সতী যৌবনে পদার্পণ করলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের কাছে এসে সতীকে বিয়ে করতে অনুরোধ করলেন। কারণ শিবের বিয়ে না হলে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটবে। তখন দক্ষ-প্রজাপতি নিজমেয়ে সতীকে মহাদেবের হাতে সম্প্রদান করলেন। কিন্তু মহাদেব দক্ষকে যথোচিত সম্মান কোনদিন দেখাতে পারেন নি মনে করে, দক্ষ শিবের উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। সতীর বিবাহের পর দক্ষ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এ যজ্ঞে সকলেই নিমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু সতী ও মহাদেব নিমন্ত্রিত হন নি। সতী এ যজ্ঞের কথা নারদের মুখে অবগত হয়ে তথায় যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিব সতীকে এ দক্ষযজ্ঞে যেতে বাধা দিলেন। এতে রেগে গিয়ে সতী পরমাপ্রকৃতি মহামায়ারূপে বিভূতি প্রকাশ করলেন। কালি, তারা, রাজ-রাজেশ্বরি, ভুবনেশ্বরি, ভৈরবি, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতি, বগলামুখি, মাতঙ্গি ও মহালক্ষ্মী– এ দশ মূর্তিতে মহাদেবকে তিনি বিভ্রান্ত করলেন। এর ফলে শিবের আদেশ পেয়ে সতী দক্ষযজ্ঞে গেলেন। যজ্ঞস্থলে তিনি সর্ববন্দিতা হয়েও বাবার মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করে বাবার সম্মুখেই দেহত্যাগ করলেন। সতীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ শিব নিজের জটা ছিন্ন করেন এবং তা হতে মহাবীর বীরভদ্রের আবির্ভাব হয়। এর পর শিব সমস্ত অনুচরের সঙ্গে দক্ষপুরিতে উপস্থিত হন। শিবের অনুচররা দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে। দক্ষপত্নীর ক্রন্দন ও দক্ষবাবা ব্রহ্মার অনুরোধে

শিব দক্ষকে প্রাণদান করেন বটে, কিন্তু শিব-নিন্দা-কলুষিত স্বমুণ্ড থেকে বঞ্চিত করে, তাঁকে ছাগমুণ্ড দান করেন। সতী-শোকে ক্রুদ্ধ শিব সতীর মৃহদেহ স্কন্ধে নিয়ে ভীষণ নৃত্য শুরু করলেন। তাতে সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হলো; তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীর দেহ ক্রমশ খণ্ড-বিখণ্ড করতে লাগলেন। সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হয়, সে সব স্থান 'মহাপীঠ' নামে খ্যাত। এরূপে একান্ন মহাপীঠের উৎপত্তি হয়। দক্ষগৃহে দেহত্যাগ করে সতী হিমালয়ের গৃহে হিমালয়-পত্নী মেনকার নিকটে এসে তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করা স্থির করলেন। যথাকালে পার্বতি-রূপে মেনকার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় একদিন নারদ এসে হিমালয়কে বলেন তাঁর মেয়ে শিবের স্ত্রী হবেন। পার্বতি তপস্যার দ্বারা শিবকে প্রসন্ন করে গৌররঙ লাভ করে গৌরী নামে খ্যাতা হন। কিছুকাল পরে তপস্যার জন্য শিব হিমালয় পর্বতে এলে হিমালয় পার্বতিকে নিয়ে শিবের পূজা করেন। পার্বতি ও তাঁর সখিরা শিবের আরাধনা করতে থাকেন। পার্বতি প্রায় সর্বদাই মহাদেবের চিন্তায় ও সেবায় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু পার্বতি তার সম্মুখে অবস্থান করলেও, শিব কোন দিন সম্যকরূপে পার্বতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি। এদিকে দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার শরনাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁদের জানালেন শিবতেজ হতে উৎপন্ন ছেলেই তারকা সুরকে বধ করতে সমর্থ হবে। সে জন্য মহাদেবের বিবাহের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তখন বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র শিবের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য মদনকে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে পার্বতির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রেরণ করেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে মদন শিবের কোপানলে পড়ে ভস্মিভূত হন। মদনভস্মের পর শিব সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করেন। পার্বতি তখন শোকেব ও দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে শিবের ধ্যানে মগ্ন হন। এমন সময় একদিন ইন্দ্র দ্বারা প্রেরিত হয়ে নারদ এসে পার্বতিকে বলেন, এতদিন পার্বতি তপস্যা ব্যতীত শিবের আরাধনা করেছেন, সে জন্য শিব তাঁর অনুরক্ত হয়েও তাঁকে গ্রহণ করছেন না। তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করতে হবে, তবেই তিনি শিবকে পাবেন । কারণ, পার্বতি ভিন্ন অন্য কোন নারীকে শিব গ্রহণ করবেন না। নারদের কথায় পার্বতি কঠোর তপস্যার রত হবেন স্থির করলেন। কিন্তু তাঁর মা এ অভিপ্রায় ত্যাগ করতে বললেন। পার্বতি এতে সম্মত না হওয়ায় মেনকা তাঁকে 'উ-মা' বলে সম্বোধন করে তপস্যায় রত হতে নিষেধ করায় পার্বতির নাম হলো 'উমা'। যে স্থানে মদন ভস্ম হয়েছিলেন, সে স্থানে পার্বতি এসে তপস্যায় রত হলেন। প্রথমে ফলাহার, পরে জলপান, তারপর পতিত বৃক্ষের পাতা ও শেষে নিরাহারে তিনি তপস্যা

করতে লাগলেন। বহু বৎসর তপস্যার পর ব্রহ্মা মহাদেবের গ্রহণযোগ্যা হয়েছেন। কিন্তু তখনো পার্বতি শিবের সাক্ষাৎ পেলেন না। কিছুকাল পরে শিব এক ব্রাহ্মনের রূপ ধরে পার্বতিকে পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত হলেন। পার্বতির পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেই শিবনিন্দা আরম্ভ করলেন এবং তাঁকে অন্য পতি গ্রহণ করতে বললেন। পার্বতি ব্রাহ্মণবেশি শিবকে সে স্থান ত্যাগ করতে বললেন। তখন শিব নিজমূর্তি ধারণ করলেন ও এর ফলে তাঁরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বাবা হিমালয়ের সম্মতি গ্রহণ করে তাঁদের দু জনের বিয়ে সম্পন্ন হলো। (কালিকা পুরাণ)

সত্যবতি

(১) ব্যাস মা। চেদিরাজ উপরিচর বসু একদা শিকারকালে তাঁর রূপবতি স্ত্রী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাবিষ্ট হন এবং তাঁর স্খলিত শুক্র এক শ্যেনকে দিয়ে রাজমহিষির নিকট প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণে এ শুক্র যমুনার জলে পড়ে ও ব্রহ্মশাপে মৎসিরূপিণি অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা এ জল পান করে গর্ভবতি হয় এবং দশম মাসে এক ধীবর দ্বারা ধৃত হয়। ধীবর এ মাছের মৎসির উদরে একটি পুরুষ ও একটি মেয়েশিশু পায় ও মৎসি শাপমুক্ত হয়। পুত্রের নাম হয় মৎস্য ও মেয়ের নাম সত্যবতি। কিন্তু মেয়ের গাত্রে মৎস্যের গন্ধ প্রবল ছিল বলে তাঁর নাম হয় মৎস্যগন্ধা। বসুরাজের এ মেয়ে ধীবরপালিতা হয়ে যৌবনে যমুনায় খেয়া পারাপারের কাজ করতেন। একদা তীর্থ পর্যটন-রত পরাশর মুনি তাঁর নৌকায় উঠে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে আমক্ত হয়ে তাঁছে এক ছেলে প্রার্থনা করেন, এবং কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে নদীর মধ্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করেন। পরাশরের ঔরসে সদ্য গর্ভধারণ করে সত্যবতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রসব করেন। পরাশরের বরে ছেলে প্রসবের পরেও সতীবতি কুমারিই থাকেন ও তাঁর দেহ সুগন্ধময় হওয়াতে তাঁর নাম হয় গন্ধবতি। এক যোজন দূর হতে তাঁর দেহের সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে তাঁকে যোজনগন্ধাও বলা হোত। একদা হস্তি নাপুরের রাজা শান্তনু যমুনা তীরবর্তী বনে ভ্রমণ করার সময়ে তাঁর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এঁকে দেখে ও পরিচয় পেয়ে তাঁর পালক বাবা দাসরাজার নিকট মেয়েকে প্রার্থনা করেন। দাসরাজের শর্ত ছিল যে, সত্যবতির গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্য দান করতে হবে। শান্তনু এ কথা শুনে অসম্মত হলেন; কারণ তার জ্যেষ্ঠ ছেলে ভিষ্মকেই তিনি রাজ্যদান করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা শোনার পর ভিষ্ম তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলে হয়েও সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করে বাবার ইচ্ছা পূরণ করেন। সত্যবতি ও শান্তনুর বিবাহের ফলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দু পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ ছেলে যৌবন লাভ করার পূর্বেই শান্তনুর মৃত্যু হয়। ভিষ্ম

সত্যবতির মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে বিচিত্রবীর্য রাজা হন। তাঁর সঙ্গে কাশিরাজের মেয়ে অম্বিকা ও অম্বালিকার বিয়ে হয়; কিন্তু সাত বৎসর পরে বিচিত্রবীর্যের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। পুত্রশোকার্তা সত্যবতি তাঁর দু বধূকে সান্ত্বনা দানের পর রাজ্য ও বংশরক্ষার জন্য ভিষ্মকে ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে বলেন, নতুবা বিয়ে করে স্বয়ং রাজা হতে বলেন। ভিষ্ম পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে সত্যবতি কথায় অসম্মত হলে তিনি তাঁর মেয়েকালে জাত ছেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে আহ্বান করেন এবং মার নির্দেশে দ্বৈপায়ন অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে ছেলে ব্যাসদেবের প্রেরণায় সত্যবতি বনবাসিনি হয়ে তপশ্চর্যায় নিযুক্ত থাকেন। এ ভাবে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

(২) ঋচিক মুনির স্ত্রী ও জমদগ্নির মা। একদা কুশিক-ছেলে গাধি অরণ্যে তপস্যা করছিলেন্ এ সময় সত্যবতি নামে তাঁর এক মেয়ে হয়। ঋচিক বিয়ে করার মানসে গাধির কাছে এসে এ মেয়ে প্রার্থনা করেন। গাধি বললেন, উপযুক্ত শুল্ক পেলে তিনি এ মেয়ে দান করতে সম্মত আছেন এবং শুল্কস্বরূপ তিনি এক সহস্র কৃষ্ণরঙ ঘোড়া চাইলেন। ঋচিক ঘোড়া সংগ্রহের জন্য বনে গিয়ে বরুণকে তপস্যার প্রীত করে তাঁর কাছ থেকে সহস্র ঘোড়া সংগ্রহ করেন। তখন গাধি ঋচীকের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করেন। এরপর ভৃগু, পুত্রের স্ত্রী দর্শনার্থ ঋচিকের কাছে এসে ছেলেবধূকে বর দিতে চাইলেন। তখন সত্যবতি নিজের জন্য তপোনিষ্ঠ ছেলে ও মার জন্য অমিত বলশালি ছেলে প্রার্থনা করেন। ভৃগু 'তথাস্তু' বরে ছেলেবধূকে দুটি চরু দিয়ে বললেন, ঋতুস্নান করে তুমি ও তোমার মা এ চরু আহার করবে। এ আরক্ত চরু তোমার মার ও ওই শুভ্ররঙ চরু তোমার। কিন্তু ভ্রমক্রমে বা মার কৌশলে এ দু চরু ভক্ষণে বিপর্যয় ঘটে ও তাঁরা বিপরীত চরু ভক্ষণ করেন। এ ব্যাপার জানতে পেরে ভৃগু সত্যবতিকে বলেন যে, তোমার ছেলে ক্ষত্রিয়াচারি ব্রাহ্মণ হবে, আর তোমার মতো ব্রাহ্মণাচারি ক্ষত্রিয়-ছেলে প্রসব করবেন। তখন সত্যবতি বললেন, আমার পৌত্র যেনো ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন হয়। ভৃগু তাই হবে বলে বর দিলেন। ফলে সত্যবতি পরশুরামের বাবা জমদগ্নির জন্ম দিলেন ও তাঁর মা বিশ্বামিত্রের জন্ম দিলেন। (কালিকা পুরাণ)

স্বামি ঋচিক সশরিরে স্বর্গে যাবার পর থেকে সত্যবতি লোকহিত কামনায় কৌশিকি (কুশি) নদী হয়ে হিমালয় থেকে প্রবাহিত হচ্ছেন।

(৩) দেবর্ষি নারদের মা। ব্রহ্মার অভিশাপে নারদের যখন মানব জন্ম হয়, তিনি তাঁর গর্ভধারিণী হন।

সত্যবান

শাল্বদেশের রাজা দ্যুমৎসেনের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী শৈব্যার গর্ভে সত্যবানের জন্ম হয়। দৈবনিগ্রহে অন্ধ ও শত্রুনিগ্রহে হৃতরাজ্য হয়ে দ্যুৎসেন স্ত্রী ও শিশুছেলে সত্যবানের সঙ্গে বনবাসি হয়ে তপশ্চর্যার ব্রতী হন। সত্যবান মাতাপিতার সেবা করে তাপসের জীবনযাপন করতেন। বনবাসি সত্যবান যৌবনে পদার্পণ করলে মদ্ররাজ অশ্বপতির মেয়ে সাবিত্রি সত্যবানকে দেখে তাঁর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে কৃতসঙ্কল্প হন ও বাবাকে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। দেবর্ষি নারদ এ কথা জানতে পেরে ঘোড়াপতিকে বলেন, সত্যবান সর্বগুণান্বিত। মা এবং বাবা সত্য কথা বলেন বলে ব্রাহ্মণরা এঁকে সত্যবান নামে অভিহিত করেন। বাল্যকালে সত্যবান অতিশয় করেন। বাল্যকালে সত্যবান অতিশয় ঘোড়াপ্রিয় ছিলেন ও মৃত্তিকার সাহায্যে ঘোড়ামূর্তি নির্মাণ করতেন। সে জন্য তার নাম হয় চিত্রাশ্ব। কিন্তু দোষের মধ্যে সত্যবান অল্পায়ু। এক বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হবে। ঘোড়াপতি তখন মেয়েকে অন্য পতি নির্বাচন করতে বললে সাবিত্রি অস্বীকার করে সত্যবানকেই বিয়ে করেন। বৎসরান্তে নির্দিষ্ট কালরাত্রে সত্যবান বনে ফল ও কাষ্ঠ আহরণে যাত্রা করতে উদ্যত হলে, সাবিত্রি শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে সত্যবানের সঙ্গে অরণ্যে গমন করেন। ফল ও কাষ্ঠ-সংগ্রহ করতে করতে সত্যবান হঠাৎ শিরঃপীড়া অনুভব করে অবসন্ন হয়ে পড়ে যান। অতি কষ্টে বৃক্ষতলে সাবিত্রির কোলে মাথা রেখে সত্যবান নারদের কথিত মতো মুহূর্তে প্রাণত্যাগ করেন। এমন সময় সাবিত্রি রক্তবস্ত্র পরিহিত বিরাটকায় এক ভয়ঙ্কর পুরুশতে পাশহাতে সত্যবানের পাশে দণ্ডায়মান দেখেন। সাবিত্রি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে ইনিই যম। সত্যবান পুণ্যাত্মা ও সাবিত্রি পতিব্রতা বলে যমদূতগণ সত্যবানকে নিয়ে যেতে অশক্ত হলে, যম স্বয়ং তাঁকে নিতে আসেন। সত্যবানকে পাশবদ্ধ করে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখে সাবিত্রি যমের অনুসরণ করলেন। যম তখন সাবিত্রিকে নিবৃত্ত হতে বলেন; কিন্তু সাবিত্রির স্তবে ও স্তুতিবাক্যে যম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বামির জীবন ছাড়া অন্য কোন বর প্রার্থনা করতে বলেন। তাতে সাবিত্রি শ্বশুরের অন্ধত্ব দূর হবার বর প্রার্থনা করেন। 'তথাস্তু' বরে যম সাবিত্রিকে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু সাবিত্রি নানা অনুনয়-বিনয় করে যমকে মুগ্ধ করেন। যম আবার সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা করতে বললেন। সাবিত্রি পুনরায় শ্বশুরের রাজ্যলাভ ও বাবার শতছেলে লাভ প্রার্থনা করেন। এ বর দান করে যম সাবিত্রিকে পুনরায় ফিলে যেতে বললেও তিনি যমের পশ্চাদগমন করা থেকে নিবৃত্ত হন না। সাবিত্রির স্তবে তুষ্টি হয়ে যম তাঁকে চতুর্থ বারের মতো বর প্রার্থনা করতে বলেন। তখন সাবিত্রি বলেন, তাঁর গর্ভে সত্যবানের ঔরসে যেনো শত ছেলে হয়। এ বর দান করে যম

সাবিত্রিকে প্রত্যাবর্তন করতে বললে, সাবিত্রি বলেন যে, শত ছেলেবতি হবার বর দেয়ার পরেও যম কেনো তাঁর স্বামিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যম এ কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে সত্যবানের জীবনদান করে বলেন যে, সত্যবান চারশত বৎসর সাবিত্রির সঙ্গে জীবিত থাকবেন। তখন সাবিত্রি সত্যবানের দেহের নিকট ফিরে এল সত্যবান সুপ্তোত্থিতের মতো জেগে উঠে সাবিত্রির সঙ্গে আশ্রমে ফিরে দ্যুমৎসেনের চক্ষু ও রাজ্যলাভ এবং অশ্বপতির শতছেলে লাভ হয়। (মহাভারত–বন)

সত্যব্রত

(১) সত্যব্রত ভগবান নারায়ণের ভক্ত একজন রাজর্ষি। অতীত কল্পের শেষে, ব্রহ্মার নিদ্রাকাল উপস্থিত হলে যে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়েছিল, তাতে পৃথিবীর সমস্ত লোক সমুদ্রজলে নিমগ্ন হয়। সে সময়ে কালবশে ঘুমের আবেশে ব্রহ্মা শয়ন করতে গেলে হয়গ্রীব তাঁর মুখনির্গত বেদসকল অপহরণ করেছিল। ভগবান শ্রীহরি হয়গ্রীবের এ কাজ জানতে পেরে নিজে সফরি মৎস্যের (পুঁটি মাছের) রূপ ধারণ করেছিলেন এবং হয়গ্রীবকে বধ করে বেদসকল উদ্ধার করেছিলেন। সত্যব্রত সে সময় কৃতমালা নদীর জলে তর্পণ করছিলেন; এমন সময় তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ জলের মধ্যে ছোট একটি পুঁটিমাছ দেখলেন। দ্রাবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত মাছটিকে জলে ফেলে দিতে উদ্যত হলে মাছটি পরম দয়ালু রাজাকে জলজন্তুদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে বলে। ভগবান শ্রীহরিই যে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য মাছের রূপ ধারণ করেছেন তা না জেনেই মহারাজ মাছটিকে রক্ষা করার সংকল্প করলেন। এবং বিভিন্ন আধারে রেখে তাকে বর্ধিত হতে সাহায্য করলেন। পরে এক দিনেই একশ যোজন সরোবরকে নিজ শরির দিয়ে বর্ধিত হতে সাহায্য করলেন। পরে এক দিনেই একশ যোজন সরোবরকে নিজ শরির দিয়ে ব্যাপ্ত করতে দেখে সত্যব্রত বুঝতে পারেন যে অব্যয় পুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ শ্রীহরিই মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন। তখন তিনি ভগবানকে স্তব করে কেনো তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন তা জানতে চান। ভগবান শ্রীহরি তখন আসন্ন মহাপ্রলয় সম্পর্কে সত্যব্রতকে সব কিছু বলেন। তারপর শ্রীহরির নির্দেশে এবং শ্রীহরি প্রেরিত নৌকোয় ধান্যাদি ও লতাপাতা নিয়ে সপ্তর্ষিদের সঙ্গে উঠে প্রলয় সমুদ্রে বিহার করতে করতে সত্যব্রত মৎস্যরূপি আদিপুরুষ ভগবানের নিকট তত্ত্বোপদেশ শোনেন। পরে সত্যব্রত শ্রীহরির কৃপায় বিবস্বানের ছেলে মনু হয়ে জন্মেছিলেন।

(২) ভিষ্মের অপর নাম।

সত্যভামা

রাজা সত্রাজিতের মেয়ে ও শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। বিবাহের অব্যবহিত পরেই অক্রুর ও কৃতবর্মার প্ররোচনায় তাঁর বাবা শতধন্বা দ্বারা নিদ্রিত অবস্থায় নিহত হন। নববধূ সত্যভামা বাবার মৃতদেহ তৈলমধ্যে রক্ষা করে স্বামির নিকট উপস্থিত হন। তখন শতধন্বাকে হত্যা করে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে তৃপ্ত করেন। একবার নারদ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য স্বর্গ হতে কল্পবৃক্ষের কয়েকটি ফুল নিয়ে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ফুলগুলো তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেন; কিন্তু ভুলক্রমে এ ফুল তিনি সত্যভামাকে দিতে বিস্মৃত হন। সত্যভামা এ ফুল না পেয়ে অভিমান করেন। তখন সত্যভামার সন্তোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বর্গ হতে কল্পতরু এনে সত্যভামার গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপন করেন। তিনি ইন্দ্রের স্ত্রী শচি, শিবের স্ত্রী গৌরী ও অগ্নির স্ত্রী স্বাহার মতো পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করে নারদকে স্বামি শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন এবং তৎপরে তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখন শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত তুলসিপত্রের বিনিময়ে নারদের নিকট হতে স্বামিকে ফিরে পান। যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর অন্যান্য যাদব মহিলাদের সঙ্গে তিনি অর্জুন দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থে নীত হন। পরে তিনি হিমালয় অতিক্রম করে কলাপগ্রামে গিয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে কাটিয়ে সমাধি লাভ করেন। তাঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সাত পুত্রের জন্ম হয়।

সপ্তর্ষি

ব্রহ্মার মানসছেলে সাত জন ঋষি। বিভিন্ন মন্বন্তরে যে সাত জন ঋষি আবির্ভূত হয়ে ধর্মের ব্যবস্থা ও লোকরক্ষা করেছেন, এঁদের নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ লেখা হয়েছে। আকাশের ঈশান কোণে তাঁরা অবস্থান করেন। এরাই সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে পরিচিত। এ সপ্তর্ষির নাম– মরিচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। এ সাত জনের যথাক্রমে কলা, অনুসূয়া, ক্ষমা, হবির্ভূ, সন্নতি, শ্রদ্ধা ও অরুন্ধতি এ সাত জন স্ত্রী। প্রত্যেক সন্বন্তরে সপ্তর্সি ভিন্ন ভিন্ন। এ সকল সপ্তর্ষি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ছিলেন। মনু চতুর্দশ; সুতরাং সপ্তর্ষিও চতুর্দশ মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন। (হরিবংশ)

সাতলোক

ভুঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য,– পুরাণোক্ত উপরিস্থ এ সাতটি লোক।

সাতসমুদ্র

১. লবণ, ২. ইক্ষু, ৩. সুরা, ৪. সর্পি, ৫. দধি, ৬. দুগ্ধ, ৭. জল– পুরাণোক্ত এ সাতসমুদ্র।

সরমা

অশোকবনে বন্দিনি সীতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন বিভীষণের পত্নী সরমা। বন্দি জীবনে সরমা ছিলেন সীতার একমাত্র সান্ত্বনার উৎস। সরমা এক সুযোগে অলঙ্কারহীনা সীতাকে সাজানোর উদ্যোগ নিলে বেদনাহত সীতা জানান যে, তিনি অলঙ্কারহীনভাবেই স্বামির কাছে যাবেন। সরমা সীতার যুক্তি গ্রহণ না করে তাঁকে সাজানোর পক্ষে মতো ব্যক্ত করেন। অলঙ্কার না থাকলেও সীতাকে সরমা সাজাবেন। ময়লাযুক্ত খনির গর্ভে মণি পাওয়া যায়। সে মণির ময়লা পরিষ্কার করে রাজার কাছে প্রদান করা হয়। সীতার বন্দিনি জীবনের মলিনতা দূর করে সরমা তাঁকে তাঁর স্বামির জন্য যোগ্য করে তুলবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সাময়িক মলিনতা সীতার সৌন্দর্য বিনষ্ট করতে পারেনি। তাছাড়া বন্দি জীবনে সীতাকে আনন্দিত রাখার দায়িত্ব পালন করেছেন বিভীষণপত্নী সরমা। সীতাকে সাজিয়ে রেখে সান্ত্বনার বাণি শুনিয়ে সরমা সে দায়িত্ব যথাযথ পালনের প্রয়াস পান। রাক্ষস পরিবেষ্টিত হয়ে সরমার আনুকূল্য না পেলে সীতার পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাই ছিল কঠিন।

সরস্বতি

বেদে সরস্বতি জ্যোতির্ময়ি অধিষ্ঠাত্রি দেবি। আর্যরা ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করলে সে স্থানের নদী বিশেষেরও এ নাম হয়। সরস্বতি দেবি নদীরূপে দেশকে উর্বরা করতেন, জলকে পবিত্র করতেন। দেশে অর্থ-সম্পদ আনতেন। বাগদেবিরূপে বেদে সরস্বতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, এ নদীতীরেই ঋষিদের গ্রাম ও আবাসস্থল ছিল। সমস্ত বৎসর এ স্থানে বেদধ্বনি হোত বলে তা বাগদেবির বাসস্থান বলে অবিহিত। কালক্রমে এ নদী সরস্বতি নাম প্রাপ্ত হয়। বেদের এ অধিষ্ঠাত্রি দেবিতে পরিণত হন। পূর্বে তাই বাগদেবিকে বোঝাতে সরস্বতি নদীর অধিষ্ঠাত্রি দেবিকেও বোঝাতো।

নদী অর্থে তাঁর মাহাত্ম্য এরূপ– পবিত্র-তোয়া যজ্ঞময়তীরশালিনি সরস্বতিদেবি আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন। মনোহর বেদবাক্য সকলের প্রেরণকর্ত্রি, সরস্বতি যজ্ঞকে ধারণ করেছেন। তিনি আপন স্রোতরূপ পতাকাদ্বারা মহার্ণব প্রকাশ করেন। বাগ্‌দেবি অর্থে তাঁর মাহাত্ম্য এরূপ– মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন, যিনি যজ্ঞশালিনি এবং অন্নদাত্রি সে সরস্বতি দেবি আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন। তিনি সুন্দর ও সত্য বাক্যের প্রেরনকর্ত্রি, তিনি সুবুদ্ধির উদ্বোধনকারিণি, তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্রি। তিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম

পরমাত্মার চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন। তিনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন।

সরস্বতির দেবি রূপে উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে ঃ পরমাত্মার মুখ হতে একটি দেবির আবির্ভাব হয়। এ দেবি শুক্লরঙা, বীনাধারিণি ও চন্দ্রের শোভাযুক্তা। এ দেবি শ্রুতি শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কবিদের ইষ্টদেবতা– এ জন্য এ দেবির নাম সরস্বতি। সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাঁচভাগে বিভক্ত হন– রাধা, পদ্মা, সাবিত্রি, দুর্গা ও সরস্বতি। এর মধ্যে এক শক্তি সরস্বতি কৃষ্ণ-কণ্ঠ হতে উদ্ভূতা। শ্রীকৃষ্ণ এ দেবিকে প্রথমে পূজা করেন। সে হইতে এ দেবির পূজা প্রচলিত হয়। দেবি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই কামনা করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতিকে নারায়ণ ভজনা করতে বলেন। (ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ)। দেবি-ভাগবত মনে সরস্বতি ব্রহ্মার স্ত্রী, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে লক্ষ্মী ও সরস্বতি দু জনই নারায়ণের স্ত্রী।

সাত্যকি

যদুবংশিয় রাজা শিনির পৌত্র ও সত্যকের ছেলে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন। সাত্যকির অন্য নাম যুযুধান। অর্জুনের কাছে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন ও শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সাত্যকি কিঞ্চিৎ উগ্রস্বভাব ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের পরদিন পাণ্ডবগণ যাদবদের সঙ্গে রাজ্যোদ্ধারের পরামর্শ কালে, দ্যূতক্রীড়ারত বলরাম যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতার কথা উল্লেখ করে শকুনিকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করলে, সাত্যকি বলরামকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবি হলে, সাত্যকি সর্ব্বান্তঃকরণে যুদ্ধে মত দেন। কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণ শেষবারের মতো শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় এলে, সাত্যকি তাঁর সঙ্গে যান। সেখানে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করার অভিসন্ধি করলে সাত্যকি তা বুঝতে পেরে সভা ত্যাগ করে গিয়ে কৃতবর্মাকে সেনাদের ব্যূহবদ্ধ করে সভাদ্বার রক্ষা করতে বলে পুনরায় সভায় আসেন ও ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের অভিসন্ধি প্রকাশ করেন। সাত্যকি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের অন্যতম সেনাপতি এবং একজন অতিরথ ছিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন। চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে জয়দ্রথ বধের জন্যে অর্জুন জয়দ্রথের অভিমুখে অগ্রসর হলে সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য থাকতে বলেন। অর্জুন দুর্যোধনকে পরাস্ত করেন ও শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করেন। তাতে অর্জুনের বিপদাশঙ্কায় যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অর্জুনের রক্ষার জন্য প্রেরণ করে। সাত্যকি দ্রোণের সারথি, রাজা

জলসন্ধ ও সুদর্শনকে নিহত করে কৌরবব্যূহে প্রবেশ করেন ও বহু কৌরব সেনা বিনষ্ট করে অর্জুনের অভিমুখে অগ্রসর হন। সাত্যকির বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির ভিমকে প্রেরণ করেন। ভিম ব্যূহভেদ করেন ও কর্ণের নিকট পরাজিত হন। তখন অর্জুন কর্ণকে আক্রমণ করায় ভিম সাত্যকির রথে উঠে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হন। তখন ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বাঁধা দেন ও যুদ্ধে পরাস্ত করে শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হন। তখন অর্জুন শরাঘাতে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন। এ অন্যায় যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে তিরস্কার করে ভূরিশ্রবা প্রায়োপবেশনে বসেন এবং সাত্যকি সকলের নিষেধ এবং সাত্যকি যোগমগ্ন ভূরিশ্রবার শিরচ্ছেদ করেন। অঙ্গদ নামে তাঁর এক ছেলে ছিল। পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শিরচ্ছেদ করে পাণ্ডব শিবিরে কৃতকর্মের জন্য আস্ফালন করলে, পাণ্ডবগণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। সাত্যকি গুরুহত্যার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিরস্কার করলে, উভয়ে উভয়কে হত্যা করতে ধাবিত হন। ভিমসেন, সহদেব ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে উভয়কেই শান্ত করেন। ষোড়শ দিনের যুদ্ধে কৌরবপক্ষিয় যোদ্ধা বিন্দ ও অনুবিন্দকে সাত্যকি নিহত করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় সাত্যকি সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে সুপ্ত পাণ্ডব-পক্ষিয়দের হত্যার জন্য কৃতবর্মাকে তিরস্কার করেন। কৃতবর্মাও ভূরিশ্রবা বধের জন্য সাত্যকিকে নিন্দা করেন। তাতে সাত্যকি সত্রাজিৎ বধের উল্লেখ করায়, সত্যভামা বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ প্রার্থনা করেন। সাত্যকি মত্ত অবস্থায় খড়গাঘাতে কৃতবর্মার শিরচ্ছেদ করেন ও অন্যান্য যাদবদের হত্যা করতে থাকেন। তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যকিকে বেষ্টন করে উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র দ্বারা প্রহার করে তাঁকে হত্যা করেন। (মহাভারত)

সাবিত্রি

(১) বেদমাত গায়ত্রি। যা হতে সর্বলোকের সৃষ্টি হয় ইনিই সবিতা। এ সবিতা যাঁর দেবতা তিন সাবিত্রি বা যিনি নিখিল বেদ প্রসব করেছেন ইনিই সাবিত্রি। মৎস্য পুরাণে আছে, তিনি নিজের দেহ দু ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে পুরুষ এবং এক ভাগে নারী হন। এ নারীই সাবিত্রি দেবি সরস্বতি, গায়ত্রি ও ব্রাহ্মণি।

(২) মদ্ররাজ ঘোড়াপতির একমাত্র মেয়ে সাবিত্রি। ঘোড়াপতি সন্তান কামনায় সূর্যাধিষ্ঠাত্রি সাবিত্রি দেবির তপস্যা করে এ তেজস্বিনি মেয়ে লাভ করেন। দেবি সাবিত্রির দান বলে তাঁর নাম সাবিত্রি হয়। তাঁর মা মালবি। তাঁর তেজের জন্য কেহ এঁকে বিয়ে করতে অগ্রসর না হওয়ায়, যৌবন প্রাপ্তা মেয়েকে ঘোড়াপতি স্বামি খোঁজে যাত্রা করতে বলেন। সাবিত্রি কাহাকেও পছন্দ করতে না পেরে বনবাসী, রাজ্যহারা শাল্বরাজ দ্যুমৎসেনের ছেলে সত্যবানকেই মনে মনে

বরণ করেন। নারদের কাছে অশ্বপতি জানতে পারেন, সত্যবান গুণবান, রূপবান, কিন্তু স্বল্পায়ু। এক বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হবে। তখন তিনি সাবিত্রিকে অন্য পতি নির্বাচন করতে বললে সাবিত্রি অসম্মত হন। বাধ্য হয়ে ঘোড়াপতি সত্যবানের হাতেই সাবিত্রিকে সমর্পণ করেন। সাবিত্রি স্বামির সঙ্গে বনবাসে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করতে থাকেন ও সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। নারদের বাক্য স্মরণ করে তিনি দিন গণনা করতে থাকেন এবং শেষে স্বামির মৃত্যুর চার দিন মাত্র অবশিষ্ট দেখে ত্রিরাত্র উপবাসের ব্রত গ্রহণ করেন। সত্যবানের মৃত্যুর দিন তিনি সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সত্যবান ফল ও কাষ্ঠ আহরণের জন্য বন গমনে উদ্যত হলে, শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে সাবিত্রি স্বামির সঙ্গে যাত্রা করলেন। ফল আহরণ করে কাঠ কাটবার সময় সত্যবান অসহ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হলে, সাবিত্রি তাঁর মাথা কোলে নিয়ে ভূমিতে বসলেন। মুহূর্তকাল পরে পাশ হাতে রক্তবসনধারি এক বিশাল পুরুষকে সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখে স্বামির মাথা কোল থেকে নামিয়ে উঠে কৃতাঞ্জলিপুটে সাবিত্রি সে পুরুষের পরিচয় জানতে চাইলেন ও জানতে পারলেন স্বয়ং যম সত্যবানের সূক্ষ্ম শরির নিতে এসেছেন। তারপর যম সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ (সূক্ষ্ম শরির) পাশবদ্ধ করে টেনে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করলেন; সাবিত্রিও যমের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর পশ্চাদগমন করতে থাকেন। যম তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে সাবিত্রি নিজ সঙ্কল্পে অটল থাকেন। তাঁর বাক্যে তুষ্ট হয়ে যম সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোন বর প্রার্থনা করতে বললেন। সাবিত্রি প্রথমে অন্ধ শ্বশুরের চক্ষুলাভ ও সূর্যের ন্যায় তেজলাভ প্রার্থনা করলেন। যম 'তুথাস্তু' বলে সাবিত্রিকে ফিলে যেতে বললেন; কিন্তু সাবিত্রি তাঁর স্বামির সঙ্গ ও যমের ন্যায় সজ্জনের সঙ্গই বাঞ্ছনীয় বলায় যম সত্যবানের জীবন ভিন্ন তাঁকে আরেকটি বর দিতে চাইলেন। দ্বিতীয় বরে সাবিত্রি তাঁর শ্বশুরের পুনর্বার রাজ্যলাভ প্রার্থনা করলেন। এরূপে বাক্যদ্বারা যমকে তুষ্ট করে তৃতীয় বরে বাবা ঘোড়াপতির শত ছেলেলাভ ভিক্ষা করলেন। যমও 'তুথাস্তু' বলে সাবিত্রিকে ফিরে যেতে বললেন। তারপর তাঁর মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হয়ে যম সাবিত্রিকে আর একটি বর দিতে উদ্যত হলে, সাবিত্রি নিজের গর্ভে সত্যবানের ঔরসে বলবীর্যসম্পন্ন শত ছেলে প্রার্থনা করলেন। যম সে বর দিয়ে সাবিত্রিকে জীবন ভিক্ষা করলেন। কারণ, যম তাঁর পতিকে নিয়ে তাঁকে শতছেলেবতি হবার বর দিতে পারেন না। অগত্যা যম হৃষ্টচিত্তে সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ করে, তাঁকে চার শত বৎসর আয়ু দান করলেন। সাবিত্রি স্বামির দেহের কাছে ফিরে এসে তাঁকে জাগ্রত করে তাঁর হাত ধরে সে রাত্রেই আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে দ্যুমৎসেন চক্ষুলাভ করে

সস্ত্রীক ছেলে ও ছেলেবধূর খোঁজে রত ছিলেন। এমন সময় সাবিত্রি সত্যবানসহ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর দ্যুমৎসেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি নারদের কথা থেকে সত্যবানের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। তারপর দ্যুমৎসেনের রাজ্যলাভ ও ঘোড়াপতির শত ছেলে লাভ হলো। সত্যবান যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন এবং সাবিত্রি শত ছেলেবতি হলেন। সাধ্বী আপন একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা সকলকে সুখি করলেন ও সর্ব বিষয়ে সিদ্ধকাম হলেন। (মহাভারত– বনপর্ব)

সিন্ধু

বৈশ্যবংশজাত অন্ধ মুনির ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত জনৈক মুনিকুমার। তিনি সরযূতীরে বাস করতেন। একদা কুমার অবস্থায় দশরথ সরযূতীরে রাতেতে শিকার করতে আসেন, তখন মুনিকুমার কলসিতে জলপূরণ করছিলেন। উক্ত শব্দ হস্তির জলপানের শব্দ অনুমান করে দশরথ শব্দভেদি বান নিক্ষেপ করেন। অতঃপর দশরথ মুনিকুমারের আর্তনাদ শ্রবণ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হন ও সিন্ধুর অনুরোধে তাঁর বাবা-মাকে এ দুঃসংবাদ দেন। পরে তাঁর অনুরোধে বাবা-মাকে সেখানে নিয়ে আসেন। এ স্থানেই সিন্ধুর মৃত্যু হয়। বাবা-মাকে তাঁর সঙ্গে স্বর্গে যান ও বাবা-মাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বলেন। তখন বৃদ্ধ মুনি দশরথকে ছেলে-শোকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ে চিতারোহণ করেন। (রামায়ণ– অযোধ্যাকাণ্ড)

সীতা

মিথিলার রাজা জনকের মেয়ে। হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় পিতা এঁকে সীতায় অর্থাৎ লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রে হল মুখ থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর নাম হোল সীতা। এ মানসি মেয়েকে পিতা নিজ মেয়ের মতো লালন-পালন করতে লাগলেন। মহর্ষি কুশধ্বজের মেয়ে বেদবতি রাবণ দ্বারা হৃতধর্মা হবার ভয়ে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করার সময় রাবণকে বলেন, ত্রেতাযুগে আমিই তোমাকে বধ করার জন্য কোন ধার্মিকের অযোনি-সম্ভবা মেয়েরূপে জন্মগ্রহণ করব। সে বেদবতিই ত্রেতায় সীতারূপে অবতির্ণ হন। দক্ষযজ্ঞের সময় মহাদেব ব্যবহৃত ধনু পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা পেয়েছিলেন। সীতা বিয়েযোগ্যা হলে পিতা পণ করেন যে এ হরধনু ভঙ্গ করবে তার হাতেই সীতাকে তিনি সমর্পণ করবেন। পৃথিবীর সকল রাজা ও রাজকুমারগণ এ হরধনু তুলতে অসমর্থ হলে রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে এ ধনুতে জ্যারোপণ করে এ ধনু ভঙ্গ করেন ও সীতার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর

রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সঙ্কল্প করলে মন্থরা-প্ররোচিত রাণি কৈকেয়ির প্রার্থনায় রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ হয়। রামের নিষেধ সত্ত্বেও সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বনগমন করেন। চিত্রকূট ত্যাগের সময় অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতাকে দিব্য বরমাল্য, অলঙ্কার, অঙ্গরাগাদি উপহার দেন। দণ্ডকারণ্যে বিরাধ রাক্ষস সীতাকে অপহরণ করে; কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ তাকে নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করেন।

পঞ্চবটিতে বাস করার সময় রাবণবোন শূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণের নিকট প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে লাঞ্ছিতা হন। এ সংবাদে রাবণ রেগে গিয়ে সীতাকে অপহরণ করার জন্য অমাত্য মারিচকে স্বর্ণহরিণ রূপ ধারণ করিয়ে সীতাকে প্রলুব্ধ করেন। সীতার অনুরোধে রাম মায়া-মৃগের অনুসরণ করলেন। মারিচ রামকে প্রলুব্ধ করে অনেক দূরে নিয়ে যায়। রাম শর-নিক্ষেপ করলে মৃত্যুকালে মারিচ রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে, 'হা সীতা' 'হা লক্ষ্মণ' বলে চিৎকার করে। রামের কোন বিপদ উপস্থিত মনে করে সীতা লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে যেতে বললেন। লক্ষ্মণ সীতাকে রক্ষা করার জন্য রাম দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং রামের কোন বিপদ হতে পারে না মনে করে যেতে অস্বীকার করেন। তখন সীতা মতিভ্রমে লক্ষ্মণকে তীব্র তিরস্কার করে বললেন, তাঁকে কামনা করেন বলেই লক্ষ্মণ রামের বিপদে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক। তখন বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মণ রামের অনুসন্ধানে গেলে পরিব্রাজকরূপে রাবণ সীতার নিকট উপস্থিত হন। সীতা অতিথি সৎকারের আয়োজন করেন। রাবণ তখন আত্মপরিচয় দিয়ে সীতাকে তাঁর সঙ্গে লঙ্কায় যেতে বললেন। সীতা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলে রাবণ তাঁকে সবলে অপহরণ করে মায়াময় রথে লঙ্কার পথে যাত্রা করেন। পথে জটায়ু রাবণকে বাঁধা দিলে, তিনি রাবণ দ্বারা ছিন্নপক্ষ হয়ে ভূতলে নিপতিত হন। পথিমধ্যে সীতা অলঙ্কারাদি নিয়ে ফেলে দেন। কিষ্কিন্ধ্যার নিকট এক পর্বতশৃঙ্গে পাঁচটি বানরকে দেখে সীতা তাঁর উত্তরীয় ও আভরণাদি সেখানে ফেলে দেন। রাবণ প্রথমে সীতাকে নিয়ে লঙ্কার অন্তঃপুরে রাখেন সীতা তাঁর বশে না আসায় রাবণ তাঁকে অশোকবনে রাক্ষসি বেষ্টিত অবস্থায় বন্দিনি করে রাখেন এবং বলেন যে বারো মাসের মধ্যে রাবণের বশ্যতা স্বীকার না করলে সীতাকে খণ্ডিত করে ভক্ষণ করা হবে। সীতার পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদির চিহ্ন ধরে জটায়ুর নির্দেশে রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবের সাহায্যে সীতাকে অন্বেষণ করতে থাকেন। পরে হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কা হতে সীতার খবর ও অভিজ্ঞান-স্বরূপ অঙ্গুরি নিয়ে আসেন। তারপর রাম বানরসেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হন। রাবণ সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বাণ দেখিয়ে বশে আনবার চেষ্টা করেন। এ সময় অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য রাবণ

সেস্থান ত্যাগ করতেই মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বাণ অন্তর্হিত হয় এবং বিভীষণ-পত্নী সরমা প্রকৃত রহস্য জানিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দেন। ছ-মাস যুদ্ধের পর রাবণ সবংশে নিহত হলে হনুমান সীতাকে আনতে যান ও সীতার পার্শ্বচরি রাক্ষসিদের বিনাশ করতে উদ্যত হন। সীতা হনুমানকে তা করতে নিষেধ করে এ দাসিদের ক্ষমা করেন। রামের নিকট উপস্থিত হলে রাম সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে সীতাকে যথা ইচ্ছা যেতে বলেন। সীতা অভিমান ভরে রামকে তিরস্কার করে লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বলেন এবং অগ্নিতে প্রবেশ কালে বলেন যে, যদি তিনি সতী হন এবং রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকেন, তবে স্বয়ং অগ্নিই তাঁকে রক্ষা করবেন। অগ্নিদেব স্বয়ং সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে ওঠেন এবং তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা বলে রামকের পুনরায় তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তাঁকে গ্রহণ করতে অযোধ্যায় ফিরে আসেন ও ভরতের কাছ হতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এরপর সীতা অন্তঃসত্ত্বা হন। সীতার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে রাম নিঃসন্দেহ হলেও ভদ্র নামক জনৈক হাস্যকারের সাহায্যে জানতে পারেন যে, প্রজাদের মনে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এ লোকাপবাদে প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্যই রাম সীতাকে লক্ষ্মণকে দিয়ে তমসার তীরবর্তী বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত করেন। এখানে যথাসময়ে সীতার কুশ ও লব নামে দুটি যমজ সন্তান হয়। বাল্মকি এঁদের জাতকর্ম সম্পাদন করে নিজের রচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করান। রাম অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, নিমন্ত্রিত বাল্মীকির সঙ্গে কুশ ও লব এ যজ্ঞে এসে রামায়ণ গান করেন। এঁদের গান শুনে রামের বিশ্বাস হয় যে, এ ছেলেরা সীতারই ছেলে। সীতাকে পুনরায় গ্রহণের জন্য রাম বাল্মীকির কাছে সংবাদ পাঠান; সীতা যদি নিষ্পাপ হন, তবে তিনি যেনো বাল্মীকির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করেন ও সকলের সমক্ষে শপথ করেন। বাল্মীকি সম্মত হয়ে জানান যে, সীতা প্রয়োজনীয় শপথ ও পরীক্ষা দেবেন। পরদিন সভামধ্যে বাল্মীকি সীতার নির্দোষিতার কথা প্রকাশ করেন। রাম বাল্মীকিকে বলেন, সীতার শুদ্ধ স্বভাবের কথা তিনি জানেন, কেবল লোকাপবাদ ভয়েই সীতাকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন; সেজন্য বাল্মীকি যেনো রামকে ক্ষমা করেন। সীতার প্রতি যেনো রামের প্রীতি জন্মায়। সীতা তখন সর্বসমক্ষে কৃতাঞ্জলি হয়ে নিম্নদিকে তাকিয়ে বললেন, যদি আমি সতী হই এবং রাম ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনে চিন্তা না করে থাকি– মনে, কর্মে, বাক্যে রামকেই অর্চনা করে থাকি, তবে পৃথিবী দেবি যেনো বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দেন। শপথ কালে ভূতল থেকে নাগবাহিত এক আশ্চর্য রথে বসুমতী উত্থিত হয়ে সীতাকে উভয় বাহুতে ধারণ করে, সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক রসাতলে প্রবেশ করেন। (রামায়ণ)

সুকন্যা

বৈবস্বত মনুর ছেলে রাজা শর্যাতি সুকন্যা নামে এক মেয়েলাভ করেন। একবার শর্যাতি মেয়েসহ সসৈন্যে এক বনে প্রবেশ করে চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলে সুকন্যা দেখতে পান, এক স্থানে বল্মীক স্তূপের মধ্যে দুটি উজ্জ্বল পদার্থ জ্বলছে। বালিকাসুলভ চাপল্যবশে সুকন্যা এ উজ্জ্বল পদার্থ দুটি প্রকৃতপক্ষে বল্মীকস্তূপমধ্যস্থ তপস্যারত চ্যবনের চক্ষু। দির্ঘকাল তপস্যার ফলে চ্যবনের দেহ বল্মীক, পিপীলিকা ও লতায় আবৃত হয়। এ রূপে কন্টকবিদ্ধ হয়ে হঠাৎ অন্ধ হওয়ায় চ্যবন রেগে গিয়ে শর্যাতির সেনাদের মলমূত্র রুদ্ধ করে দেন। সেনাদের কষ্ট দেখে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে চ্যবনকে বলেন, আমার বালিকা-মেয়ে অজ্ঞানতাবশে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে আপনি ক্ষমা করুন। চ্যবন রাজাকে বলেন, তাঁর মেয়ে দম্ভ ও অবজ্ঞাবশে তাঁকে এরূপ বিদ্ধ করেছে, সেজন্য মেয়েকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। তখন শর্যাতি বাধ্য হয়ে সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করেন। একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় যৌবনদীপ্তা সুকন্যাকে স্নানের পর নগ্নাবস্থায় দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ চ্যবনকে ত্যাগ করে তাঁদের একজনকে গ্রহণ করতে বলেন। তাঁরা সুকন্যাকে আরও বলেন, তাঁরা দেব-চিকিৎসক, চ্যবনকে এ কথা জানালে তিনি সম্মত হন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করেন ও মুহূর্তকাল পরে তিন জনেই দিব্যরূপে ও একই প্রকার বেশে জল থেকে উঠে আসেন। সকলেরই আকৃতি একপ্রকার ও সুন্দর হলেও, সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাকেই বরণ করেন। চ্যবন আনন্দিত হযে রূপ, যৌবন ও স্ত্রী পাবার জন্য দেবরাজের সমক্ষেই অশ্বিনীকুরামদ্বয়কে সোমপায়ি করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তিনি শর্যাতিকে দিয়ে এক যজ্ঞ করিয়ে ইন্দ্রের প্রতিকুলতা সত্ত্বেও, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানের অধিকারি করেন। (মহাভারত)

সুজাতা

মহর্ষি উদ্দালকের মেয়ে। উদ্দালক শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে মেয়ে সুজাতার বিয়ে দেন। সুজাতা গর্ভবতি হলে গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠরত কহোড়কে বলেন, বাবা, আপনার প্রসাদে আমি গর্ভবাস কালেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু আপনার বেদপাঠ ঠিক হচ্ছে না। কহোড় গর্ভস্থ পুত্রের এ কথা শুনে রেগে গিয়ে শিশুকে অভিশাপ দেন। এর ফলে শিশুর দেহের আটস্থান বক্র হয় ও সে জন্য তিনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। পূর্ণগর্ভা অবস্থায় সুজাতা স্বামিকে বলেন, তিনি একেবারে নিঃস্ব। প্রসব বা সন্তান পালনের জন্য তাঁর কোন অর্থই নাই। তখন

কহোড় অর্থসংগ্রহের জন্য পিতারাজার সভায় উপস্থিত হন। সেখানে বরুণ-ছেলে বন্দি কহোড়কে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে জলে নিমজ্জিত করে রাখেন। উদ্দালক এ সংবাদ মেয়ে সুজাতাকে গর্ভস্থ শিশুর কাছে গোপন রাখতে বলেন। জন্মের পর অষ্টাবক্র উদ্দলককেই বাবা বলে মনে করতেন। একদিন তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু তাঁকে উদ্দলকের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলেন, এ তোমার বাবার কোল নয়। তখন সুজাতা ছেলেকে সমস্ত ঘটনা বলতে বাধ্য হন। তারপর অষ্টাবক্র পিতাসভায় গিয়ে বন্দিকে পরাস্ত্র করে বাবাকে উদ্ধার করেন। (মহাভারত– বন)

সুদর্শন

(১) মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্মা সর্ব দেবতার তেজ নিয়ে এক চক্র অস্ত্র প্রস্তুত করেন। পরে দৈত্যদানবাদি বিনাশার্থ এ চক্র মহাদেব বিষ্ণুকে দান করেন। সুদর্শন চক্রই বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র।

(২) দুর্যোধনের এক ভাই।

(৩) লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর নামে এক রাক্ষস এ হস্তীর উপরে আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিল।

(৪) মাহিষ্মতী নগরিতে ইক্ষাকুবংশিয় দুর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁর ঔরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সুদর্শনা নামে এক রূপবতি মেয়ের জন্ম হয়। অগ্নিদের এ মেয়েকে বিয়ে করেন। সুদর্শন অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তিনি স্ত্রীকে অতিথি সেবায় নিয়োজিত করে বলেন, প্রয়োজন হলে স্ত্রী যেনো নির্বিচারে নিজেকেও দান করেন। কারণ, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ নয়। তিনি এ আদেশ পালন করবেন বলে স্বীকৃত হন। একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতি কালে ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে এসে তিনি সঙ্গম কামনা করেন। অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখিয়ে তিনি এঁকে সন্তুষ্ট করতে অসমর্থ হলে স্বামির কথা স্মরণ করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্য গৃহে তিনি মিলিত হন।

এ সময় সুদর্শন গৃহে ফিরে এসে বার বার স্ত্রীকে ডাকতে থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের বাহুপাশ আবদ্ধ থাকায় নিজেকে অশুচি মনে করে তিনি স্বামির এ আহ্বানের উত্তর দেন না। এমন সময় অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহের ভিতর হতে বাহিরে এসে সুদর্শনকে জানান, তোমার স্ত্রী আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। সুদর্শনের পশ্চাতে লৌহ-মুদ্গারধানি মৃতু অদৃশ্য ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য, সুদর্শন অতিথি সৎকার না করলে মৃত্যু সুদর্শনকে বধ করবেন। সুদর্শন অতিথিকে বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে অতিথি সৎকারের জন্য দান করেছি। অতিথি

সুদর্শনকে জানালেন, ইনিই ধর্ম, তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য এখানে এসেছিলেন। মৃত্যু সর্বদা রন্ধ্র অনুসন্ধান করেছিলেন, মৃত্যুকে এখন তিনি জয় করেছেন। তাঁর স্ত্রী পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী, নিজ গুণে রক্ষিতা। তাঁর স্ত্রী নিজের তপস্যার প্রভাবে অর্ধ-শরিরে তিনি নদী রূপে লোক-পাবন করবেন এবং অর্ধ-শরিরে স্বামির অনুগমন করবেন। আর তিনি ও তাঁর সশরিরে অক্ষয় স্বর্গলাভ করবেন। এরপর দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র ঘোড়াযোজিত রথে সুদর্শন ও তার স্ত্রীকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। (মহাভারত– অনুশাসন)

সুভদ্রা

অর্জুনের দ্বিতীয় স্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণের বাবা বসুদেবের ঔসে এবং তাঁর স্ত্রী রোহিণির গর্ভে সুভদ্রার জন্ম হয়। সুতরাং তিনি বলরামের সহোদরা ও শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় বোন। অর্জুন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বার বৎসর বনবাসে থাকার সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি একবার রৈবত পর্বতে গমন করেন। সেখানে অর্জুনের সংবর্ধনার জন্য এক মহোৎসব হয়। অর্জুন সেখানে সুভদ্রার রূপে মুগ্ধ হন। অর্জুনের মনোভাব জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হন। তিনি বলেন, ক্ষত্রিয়দের স্বয়ংবর বিয়েই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সুভদ্রা কার গলায় বরমাল্য দান করবেন, তার কোন স্থিরতা নাই; সে জন্য ক্ষত্রিয়রা বলপূর্বক মেয়ে অপহরণ করে বিয়ে করাকে প্রশস্ত পথ বলেছেন; শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে অপহরণ করে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। শ্রীকৃষ্ণের এ বাক্যে রৈবতকে পূজার পর সুভদ্রা যখন দ্বারকায় ফিরছিলেন, তখন অর্জুন তাঁকে অপহরণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে নিয়ে যান। এতে যাদবরা অপমানিত বোধ করেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্বাক থাকেন। বলরাম ক্রুদ্ধ হদয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা স্থির করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সুভদ্রঅপহরণ ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত বলেন। সত্যভামার উদ্‌যোগে মহাসমারোহে দ্বারকায় সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হয়। অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। পাণ্ডবদের বনবাসকালে সুভদ্রা অভিমন্যুকে নিয়ে পিত্রালয়ে বাস করেন। প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদির বাস করেন। প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদির পাঁচপুত্রও এ সময়ে দ্বারকায় বাস করত। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় তিনি দ্রৌপদির সঙ্গে পাণ্ডব শিবিরে বাস করতেন। মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠির সুভদ্রার পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যাভিষিক্ত করে সুভদ্রাকে ধর্মরক্ষা ও সকলের পালনের ভার দিয়ে যান। (মহাভারত)

সুমেরু

সুবর্ণগিরি। এ পর্বতে বিশ্বদেব ও মরুদগণ সন্ধ্যাকালে সূর্যের উপাসনা করতেন, তারপর সূর্য অস্তাচলে গমন করতেন, এর শিখরে জ্যোতির্ময় বরুণালয় আছে।

তিব্বত দেশের উত্তর এবং চিনদেশের পশ্চিমস্থ পর্বতশ্রেণিকে সুমেরু বলা হয়। সুমেরু পর্বত দেবতাদের বাসভূমি বলে প্রসিদ্ধ।

সুরথ

(১) চন্দ্রবংশের রাজা। ব্রহ্মার ছেলে অত্রি; অত্রির ছেলে চন্দ্র। চন্দ্রের ছেলে বুধ। বুধের ছেলে চৈত্র। চৈত্রের ছেলে সুরথ। দ্বিতীয় মনু স্বরোচিষের অধিকারকালে সুরথ চন্দ্র বংশে শত্রুগণ দ্বারা পরাজিত হয়ে রাজ্য হতে বিতাড়িত হন। অরণ্যে ভ্রমণ কালে সমাধি নামে এক বৈশ্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেও অসাধু ছেলে ও আত্মীয় দ্বারা বনে বিতাড়িত হয়েছিল। উভয়ে শান্তি লাভের আশায় মেধস মুনির আশ্রমে এসে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেন। মেধস মুনির এঁদের জগতের সমস্ত বিষয়ের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং দেবি আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্তন করেন। দেবির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে মেধস দেবিকে আরাধনা করতে বলেন। এ দুজনেই দেবির পূজা করে নিজ নিজ প্রার্থিত বর পান। পৃথিবীতে সুরথ রাজাই প্রথমে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এ মেধস ঋষি দ্বারা কীর্তিত দেবিমাহাত্ম্যই শ্রীশ্রীচণ্ডি নামে খ্যাত। (মার্কন্ডেয় পুরাণ)

(২) সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ছেলে। জয়দ্রথের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের রক্ষক হিসেবে সিন্ধু দেশে উপস্থিত হ'লে তিনি অর্জুনের নাম শুনেই ভয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

(৩) ভদ্রাবতিপুরের বিষ্ণুভক্ত রাজা হংসধ্বজের অন্যতম ছেলে। তিনি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ারক্ষার্থী অর্জুনের হাতে নিহত হন। (মহাভারত)

(৪) সুদেবের ছেলে। শ্বেতকেতুর কনিষ্ঠ ভাই।

সুহোত্র

একদা কুরুবংশের রাজা সুহোত্র পথে উশিনর-ছেলে শিবিরাজাকে দেখতে পান। বয়স অনুসারে তাঁরা দু গুণে দু জনেই সমান ভেবে কেহ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সে সময় নারদ এসে দু জনের নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজারা উত্তর দিলেন– তাঁরা দুজনেই তুল্যগুণশালি; কে শ্রেষ্ঠ, ঠিক করতে না পারায় দু জনেই পথ ছাড়বেন না। তখন নারদ বললেন, শিবিরাজা সুহোত্রর চেয়ে সাধু স্বভাব সম্পন্ন। তাঁরা দু জনেই উদার। যিনি অধিকতর উদার, ইনিই পথ ছেড়ে দিয়ে চরম উদারতা দেখান। তখন সুহোত্র শিবিকে প্রদক্ষিণ করে পথ ছেড়ে দিলেন। এরূপে সুহোত্র তাঁর মাহাত্ম্য দেখালেন।

(২) উতথির ছেলে সুহোত্র। ইন্দ্র এর রাজ্যে এক বৎসর স্বর্ণ বৃষ্টি করেন; ফলে ঐ সময় নদীর প্রবাহে স্বর্ণ বৃস্টি হতো। ইন্দ্র নদীতে স্বর্ণময় কূর্ম, কর্কটক,

মকর ইত্যাদি নিক্ষেপ করতেন। সুহোত্র এগুলি সংগ্রহ করে কুরু-জঙ্গলে যজ্ঞের আয়োজন করেন। সে যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের স্বর্ণাদি দান করেন। (মহাভারত– আদি)

সূর্য

আর্যদের উপাস্য দেবতা সূর্য। আর্যজাতির বিভিন্ন শাখায় তাঁর উপাসনা দেখতে পাওয়ায় যায়। তিনি গ্রিকদের Heoios, লাতিনদের Sol, টিউটনদের Tyr, ইরাণিয়দের 'খুরসেদ'। "সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু"– এ পাঁচটি বিভিন্ন নামে সূর্যের স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে ও মহিমায় সূর্যকে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাস্ক বলেন– আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সে সবিতার কাল। সায়ণ বলেন, সূর্য উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাই সবিতা, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সে সূর্য। এ সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্ত-গমন, এ তিনটি বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। বিবস্বান শব্দের আকাশও বোঝায়। অহোরাত্র বিভাগের কর্তা অর্যমা; তিনি মাত্র ও বরুণের (দিবা ও রাত) মধ্যবর্তি দেবতা।

ঋগবেদের ১০টি সূক্তে সূর্যের স্তুতি আছে। এ সূর্য জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নয়। তিনি সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তি দেবতা। আলোকোদ্ভাসিত আকাশ তাঁর মুখ, সূর্যমণ্ডল তাঁর চক্ষু, তিনি হিরণ্যপাণি। সর্বদর্শি। বিশ্বভুবনের চর। মর্তজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষি। সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র রথে তিনি বিশ্বপর্যটন করেন। বরুণ তাঁর পথ পরিষ্কার করে দেন। সূর্য মনুষ্যকে কর্মে প্রবর্তিত বা জাগ্রহ করেন। স্থাবর ও জঙ্গম, সমস্ত পদার্থের তিনি প্রাণস্বরূপ। সমস্ত প্রাণি তাঁর অধীন। তিনি বিশ্বস্রষ্টা। সূর্যের মা দ্যৌঃ বা অদিতি। ধাতা সূর্য ও চন্দ্রকে কল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। অশ্বিণীকুমারদ্বয় সূর্যের ছেলে। ঊষা সূর্যের জনয়িত্রি। সূর্য প্রণয়ির ন্যায় এ সুন্দরি দেবির অনুগমন করেন। সূর্য ঊষার কোলে দীপ্তি পান। আবার ঊষা তাঁর স্ত্রী। তিনি পুরুষের চক্ষু হতে উৎপন্ন। তিনি আকাশে পক্ষীর ন্যায় বা বৃষের ন্যায় অথবা উজ্জ্বল অশ্বের ন্যায় বিচরণ করেন। তিনি আকাশের রত্ন। উজ্জ্বল অস্ত্র। রথের চক্র। মিত্রবরুণ এঁকে মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করেন। ইন্দ্র সূর্যকে পরাজিত করে তাঁর রথচক্র অপহরণ করেন। অর্থাৎ মেঘে বা সূর্যগ্রহণে সূর্যমণ্ডল আবৃত হয়ে পড়ে। স্বার্ভানু রাক্ষস অন্ধকারে সূর্যকে আচ্ছাদন করে গ্রহণ করে। অত্রি সূর্যকে মুক্ত করে আবার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথর্ববেদে রাহুর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। সূর্য সময়ের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ৩৬০ দিনে সম্বৎসর

তিব্বত দেশের উত্তর এবং চিনদেশের পশ্চিমস্থ পর্বতশ্রেণিকে সুমেরু বলা হয়। সুমেরু পর্বত দেবতাদের বাসভূমি বলে প্রসিদ্ধ।

সুরথ

(১) চন্দ্রবংশের রাজা। ব্রহ্মার ছেলে অত্রি; অত্রির ছেলে চন্দ্র। চন্দ্রের ছেলে বুধ। বুধের ছেলে চৈত্র। চৈত্রের ছেলে সুরথ। দ্বিতীয় মনু স্বরোচিষের অধিকারকালে সুরথ চন্দ্র বংশে শত্রুগণ দ্বারা পরাজিত হয়ে রাজ্য হতে বিতাড়িত হন। অরণ্যে ভ্রমণ কালে সমাধি নামে এক বৈশ্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেও অসাধু ছেলে ও আত্মীয় দ্বারা বনে বিতাড়িত হয়েছিল। উভয়ে শান্তি লাভের আশায় মেধস মুনির আশ্রমে এসে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেন। মেধস মুনির এঁদের জগতের সমস্ত বিষয়ের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং দেবি আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্তন করেন। দেবির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে মেধস দেবিকে আরাধনা করতে বলেন। এ দুজনেই দেবির পূজা করে নিজ নিজ প্রার্থিত বর পান। পৃথিবীতে সুরথ রাজাই প্রথমে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এ মেধস ঋষি দ্বারা কীর্তিত দেবিমাহাত্ম্যই শ্রীশ্রীচণ্ডি নামে খ্যাত। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

(২) সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ছেলে। জয়দ্রথের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের রক্ষক হিসেবে সিন্ধু দেশে উপস্থিত হ'লে তিনি অর্জুনের নাম শুনেই ভয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

(৩) ভদ্রাবতিপুরের বিষ্ণুভক্ত রাজা হংসধ্বজের অন্যতম ছেলে। তিনি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ারক্ষার্থী অর্জুনের হাতে নিহত হন। (মহাভারত)

(৪) সুদেবের ছেলে। শ্বেতকেতুর কনিষ্ঠ ভাই।

সুহোত্র

একদা কুরুবংশের রাজা সুহোত্র পথে উশিনর-ছেলে শিবিরাজাকে দেখতে পান। বয়স অনুসারে তাঁরা দু গুণে দু জনেই সমান ভেবে কেহ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সে সময় নারদ এসে দু জনের নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজারা উত্তর দিলেন– তাঁরা দুজনেই তুল্যগুণশালি; কে শ্রেষ্ঠ, ঠিক করতে না পারায় দু জনেই পথ ছাড়বেন না। তখন নারদ বললেন, শিবিরাজা সুহোত্রর চেয়ে সাধু স্বভাব সম্পন্ন। তাঁরা দু জনেই উদার। যিনি অধিকতর উদার, ইনিই পথ ছেড়ে দিয়ে চরম উদারতা দেখান। তখন সুহোত্র শিবিকে প্রদক্ষিণ করে পথ ছেড়ে দিলেন। এরূপে সুহোত্র তাঁর মাহাত্ম্য দেখালেন।

(২) উতথির ছেলে সুহোত্র। ইন্দ্র এর রাজ্যে এক বৎসর স্বর্ণ বৃষ্টি করেন; ফলে ঐ সময় নদীর প্রবাহে স্বর্ণ বৃস্টি হতো। ইন্দ্র নদীতে স্বর্ণময় কূর্ম, কর্কটক,

মকর ইত্যাদি নিক্ষেপ করতেন। সুহোত্র এগুলি সংগ্রহ করে কুরু-জঙ্গলে যজ্ঞের আয়োজন করেন। সে যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের স্বর্ণাদি দান করেন। (মহাভারত–আদি)

সূর্য

আর্যদের উপাস্য দেবতা সূর্য। আর্যজাতির বিভিন্ন শাখায় তাঁর উপাসনা দেখতে পাওয়ায় যায়। তিনি গ্রিকদের Heoios, লাতিনদের Sol, টিউটনদের Tyr, ইরাণিয়দের 'খুরসেদ'। "সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু"– এ পাঁচটি বিভিন্ন নামে সূর্যের স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে ও মহিমায় সূর্যকে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাস্ক বলেন– আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সে সবিতার কাল। সায়ণ বলেন, সূর্য উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাই সবিতা, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সে সূর্য। এ সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্ত-গমন, এ তিনটি বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। বিবস্বান শব্দের আকাশও বোঝায়। অহোরাত্র বিভাগের কর্তা অর্যমা; তিনি মাত্র ও বরুণের (দিবা ও রাত) মধ্যবর্তি দেবতা।

ঋগবেদের ১০টি সূক্তে সূর্যের স্তুতি আছে। এ সূর্য জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নয়। তিনি সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তি দেবতা। আলোকোদ্ভাসিত আকাশ তাঁর মুখ, সূর্যমণ্ডল তাঁর চক্ষু, তিনি হিরণ্যপাণি। সর্বদর্শি। বিশ্বভুবনের চর। মর্তজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষি। সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র রথে তিনি বিশ্বপর্যটন করেন। বরুণ তাঁর পথ পরিষ্কার করে দেন। সূর্য মনুষ্যকে কর্মে প্রবর্তিত বা জাগ্রহ করেন। স্থাবর ও জঙ্গম, সমস্ত পদার্থের তিনি প্রাণস্বরূপ। সমস্ত প্রাণি তাঁর অধীন। তিনি বিশ্বস্রষ্টা। সূর্যের মা দ্যৌঃ বা অদিতি। ধাতা সূর্য ও চন্দ্রকে কল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। অশ্বিণীকুমারদ্বয় সূর্যের ছেলে। ঊষা সূর্যের জনয়িত্রি। সূর্য প্রণয়ির ন্যায় এ সুন্দরি দেবির অনুগমন করেন। সূর্য ঊষার কোলে দীপ্তি পান। আবার ঊষা তাঁর স্ত্রী। তিনি পুরুষের চক্ষু হতে উৎপন্ন। তিনি আকাশে পক্ষীর ন্যায় বা বৃষের ন্যায় অথবা উজ্জ্বল অশ্বের ন্যায় বিচরণ করেন। তিনি আকাশের রত্ন। উজ্জ্বল অস্ত্র। রথের চক্র। মিত্রবরুণ এঁকে মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করেন। ইন্দ্র সূর্যকে পরাজিত করে তাঁর রথচক্র অপহরণ করেন। অর্থাৎ মেঘে বা সূর্যগ্রহণে সূর্যমণ্ডল আবৃত হয়ে পড়ে। স্বার্ভানু রাক্ষস অন্ধকারে সূর্যকে আচ্ছাদন করে গ্রহণ করে। অত্রি সূর্যকে মুক্ত করে আবার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথর্ববেদে রাহুর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। সূর্য সময়ের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ৩৬০ দিনে সম্বৎসর

গঠন করেন। সূর্যচক্রে ১২টি অরাবা মাস আছে। তা আকাশে ৭২০ বার (৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত) আবর্তিত হয়। অথর্ববেদে ও আরণ্যকে সাত সূর্যের উল্লেখ আছে। তা ঋগবেদের সপ্তাশ্ব ও সাত রশ্মি।

রামায়ণ ও মহাভারত মতে সূর্য কশ্যপ ও অদিতির ছেলে। সে জন্য তাঁর নাম আদিত্য। বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামক তিনটি সন্তান হয়। সূর্যের প্রখর দ্যুতি ও তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা স্বানুরূপা ছায়াকে সৃষ্টি করেন। স্বামির সঙ্গিনিরূপে তাঁর কাছে পাঠিয়ে, উত্তরকুরুবর্ষে ঘোড়ারূপ ধারণ করে ভ্রমণ করতে থাকেন। ছায়া সূর্যের পরিচর্যায় রত হন। ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করে সূর্য তাঁর গর্ভে দু ছেলে ও এক মেয়ে উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠ সাবর্ণি মনু, দ্বিতীয় শনি ও মেয়ে তপতি। পরে সংজ্ঞার শঠতা বুঝতে পেরে সূর্য ঘোড়ারূপ ধারণ করে উত্তরকুরুতে গিয়ে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। ফলে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। তারপর সূর্য সংজ্ঞাকে ফিরিয়ে আনেন। বিশ্বকর্মা-সূর্যের উগ্র তেজ হ্রাস করার জন্যে তাঁর দেহের অষ্টম অংশ ছেদন করে দেন। এ কর্তিত অংশ জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পতিত হলে বিশ্বকর্মা এ জ্বলন্ত অংশদ্বারা বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়ের তরবারি ও অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র প্রস্তুত করেন।

মহাভারত অনুসারে সূর্যের ঔরসে কুন্তির গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। ঋক্ষরজার গ্রীবায় পতিত সূর্যের বীর্য থেকে সুগ্রীবের জন্ম হয়। বৈবস্বত মনু অনুসারে সূর্যের পৌত্র হতে সূর্যবংশের নাম হয়। চন্দ্রবংশিয় সংবরণের সঙ্গে সূর্য-মেয়ে তপতির বিয়ে হয়।

সৃঞ্জয়

সৃঞ্জয় রাজা শ্বিত্যের পুত্র। একদিন দেবর্ষি নারদ ও পর্বত তাঁদের বন্ধু রাজা সৃঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে একটি পরমাসুন্দরি মেয়েকে দেখতে পান। নারদ জানতে পারলেন এ সৃঞ্জয়ের মেয়ে। তখন নারদ এ মেয়েকে স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করলেন। পর্বত ঋষি রেগে গিয়ে নারদকে বললেন, তিনিও এ মেয়েকে মনে মনে বরণ করেছেন। তিনি নারদকে অভিশাপ দিলেন যে, নারদ নিজের ইচ্ছা অনুসারে স্বর্গে যেতে পারবেন না। তখন নারদও পর্বতকে শাপ দিলেন, আমার সঙ্গ ভিন্ন তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পরের অভিশাপের ফলে দু জনই সৃঞ্জয়ের কাছে বাস করতে লাগলেন। এরপর রাজা সৃঞ্জয় ব্রাহ্মণদের সেবা করতে তাঁদের কাছ থেকে বর চাইলেন এবং এর ফলে তাঁর এক তেজস্বি ছেলে হলো। এ পুত্রের পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ সবই সুবর্ণময়। এ জন্য পুত্রের নাম হলো

সুবর্ণষ্ঠিবি। একদল দস্যু সুবর্ণলুব্ধ হয়ে এ ছেলেকে হরণ করে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে; কিন্তু তাদের কোনও অর্থ লাভ হলো না। রাজপুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন লুপ্ত হোল। তখন দস্যুরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পরস্পরকে বধ করে নরকে গেল। পুত্রের মৃত্যুতে সৃঞ্জয় মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। তখন নারদ নানা প্রকার উপাখ্যান বলে ছেলেশোকে দূর করে রাজাকে বর দিলেন, তার ছেলে পুনর্জীবিত হবে। এ বরে সুবর্ণষ্ঠীবী আবার বেঁচে উঠলেন। (মহাভারত–দ্রোণপর্ব)

স্কন্দ

সপ্তর্ষি যথা– ১. মরিচি, ২. অত্রি, ৩. অঙ্গিরা, ৪. পুলহ, ৫. পুলস্ত, ৬. ক্রতু ও ৭. বশিষ্ঠদের যজ্ঞকালে অগ্নি হোমকুণ্ড থেকে উঠে সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামাবিষ্ট হন এবং তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্পে বনে গমন করেন। অগ্নির প্রতি আসক্তিবশত দক্ষমেয়ে স্বাহা সপ্তর্ষিগণের এক একজনের স্ত্রীদের রূপধারণ করে অগ্নির সঙ্গে ছ-বার সংগম করেন। কেবল বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতির রূপধারণ করতে পারেননি। স্বাহা ছ-বার সংগম করে ছ-বার কৈলাসে এক কাঞ্চন-কুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করেন। সে স্কন্দ অর্থাৎ স্খলিত শুক্র থেকে স্কন্দ বা কার্তিকের উৎপন্ন হয়। তাঁর ছ-মস্তক, এক ঘাড় ও এক পেট। মহাদেব যে ধনুদ্বারা ত্রিপুরাসুরকে হত্যা করেছিলেন, সে ধনু নিয়ে বালকস্কন্দ গর্জন করে উঠলেন। সপ্তর্ষিদের মধ্যে ছ-জন প্রকৃত ঘটনা না জেনে নিজ পত্নীদের স্কন্দের মা জ্ঞান করে তাঁদের ত্যাগ করলেন। তখন স্বাহা নিজেকে এ পুত্রের মা বলে প্রকাশ করলেন। স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, স্কন্দ অত্যন্ত শক্তিশালি ও বীর্যবান হবে, তাই একে ইন্দ্র হত্যা করুন, কিন্তু ইন্দ্র এতে সাহসি না হওয়ায় দেবতারা স্কন্দকে হত্যা করার জন্য শিবের অনুচারি লোক মাতৃকাদের প্রেরণ করলেন, কিন্তু তাঁরা স্কন্দকে স্তন্যপান করিয়ে মাতৃস্থানিয়া হলেন। ইন্দ্র ভয় পেলে স্কন্দকে দেবসেনাপতি করেন। ব্রাহ্মণরা রুদ্রকে অগ্নি বলে থাকেন। সেজন্য স্কন্দকে মহাদেবের ছেলে বলা হয়। মহাদেব অগ্নির শরিরে প্রবেশ করে এ ছেলে উৎপাদন করেন। ইন্দ্র প্রজাপতির মেয়ে দেবসেনাকে স্কন্দের হাতে সমর্পণ করেন। স্কন্দ দেবসেনাপতি হয়ে দেবাসুরের যুদ্ধে যান।

স্বয়ম্ভু

রঙ প্রথমে সৃষ্টির কামনায় ভগবান বিষ্ণু জল সৃষ্টি করে তার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করেন। জলে এ বীজ নিহিত হলে তা হতে এক সুবর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হয়ে

জলের ওপর ভাসতে থাকে। সে অণ্ডে ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হন। সে জন্য তাঁকে স্বয়ম্ভু বলা হয়। (অগ্নি পুরাণ)

স্মৃতি

পূর্বানুভূত বিষয়ে জ্ঞান। যা মানুষের স্মৃতিশক্তিতে আছে এবং গুরু পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। বেদাঙ্গ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ইত্যাদি স্মৃতির পর্যায়ে পড়ে।

সনাতন

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের খ্যাতিমান সাধু। তাঁর সহোদরের নাম রূপগোস্বামি। তিনি অতিশয় ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি ধর্মের জন্য সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বাস করেন। সনাতন গৌড় দেশের নবাবের কর্মচারি ছিলেন। তিনি সংসারে এতদূর আসক্ত ছিলেন যে, নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অন্যের সুবিধা অসুবিধা বিন্দুমাত্র দেখতেন না। একদিন তিনি নিজ ভদ্রাসন বাটির আয়তন বাড়াবার জন্য সন্নিহিত এক দরিদ্র ব্যক্তির বাসস্থান দখল করতে উদ্যত হন। দরিদ্র ব্যক্তি অন্যোপায় হয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে রূপগোস্বামিকে সমুদয় বিষয় জানান। রূপগোস্বামি যরি, রলা, ইরং, জয় এ আটটি অক্ষর পত্রাঙ্কিত করে তাঁর ভাইয়ের নিকট পাঠান। দরিদ্রব্যক্তি এ আটটি অক্ষরে একটি শ্লোক পূরণ করে সনাতনের হাতে দেন। এ শ্লোক এ–

"যদুপতে ক্বগতা মধুরাপুরি রঘুপতেঃ ক্বতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃস্থিরং জগদিদং ন সদিত্যবধারয়।"

সনাতন শ্লোকের মর্ম অবগত হয়ে চুপ করে রইলেন। পরে তাঁর চৈতন্যদ্বয় হওয়ায় তিনি সে দুঃখি ব্যাক্তিকে নিজ বাড়ি অর্পণ করে সংসার ত্যাগ করেন: সর্বদা ধর্মচর্চা ব্যতীত সাংসারিক ভাব আর কিছুমাত্র তাঁর মনে স্থান পেল না। তিনি চৈতন্যের নিকট হরিনাম গ্রহণ করে অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনবাসে কাটান।

সামবেদ

সামবেদসংহিতা প্রধানত দুভাগে বিভক্ত– ১. আর্চিক ও ২. স্তৌভিক। আর্চিক ৫৮৫ সূক্ত আছে। স্তৌভিকে ১২২৩ সূক্ত আছে। এর অধিকাংশই বামদেব ঋষির রচিত। সামবেদের একটি বিশেষত্ব এ যে, এর স্বরবিজ্ঞান অত্যন্ত দুরূহ। এ বেদের অধিকাংশ সূক্তই সোমযজ্ঞে পাঠ করার উদ্দেশে প্রণীত।

সুগন্ধমাদন (গন্ধমাদন)

হিমালয়ে স্বর্ণময় ঋষভ পর্বত ও কৈলাস পর্বতের মধ্যস্থিত দীপ্তিমান ওষধিপর্বত। এ পর্বতের শীর্ষদেশে মৃত সঞ্জীবনি, বিশল্যকরণি, সুবর্ণকরণি প্রভৃতি মহৌষধি জন্মে। হনুমান রাম-রাবণের যুদ্ধকালে দু বার ওষধিপর্বত উৎপাটন করে আনেন। প্রথম বারে ওষধির গন্ধ আঘ্রাণ করে রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হন এবং বানরেরা সুস্থ হয়। পরে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মৃত প্রায় হলে হনুমান ওষধি চিনতে না পেরে ওষধিশৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসেন। এ ওষধি মৃতকল্পকে জীবন দান করে। ওষধি বৃক্ষের গন্ধ সকলকে মত্ত করে বলে এ পর্বতের নাম গন্ধমাদন।

সুদক্ষিণা

দিলীপের স্ত্রী ও রামের প্রপিতামহি।

সুন্দ-উপসুন্দ

হিরণ্যকশিপুর বংশজাত দু দৈত্য ভ্রাতা। স্বর্গের অপ্সরা তিলোত্তমার রূপে এ ভাইরা মুগ্ধ হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে নিহত হন। এ দু ভাইই প্রবল প্রতাপশালি দৈত্য ছিল। দু ভাই ত্রিলোক বিজয়ের কল্পনায় বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হন। এ তপস্যার ফলে ব্রহ্মার কাছে তাঁরা কামরূপি ও অমর হবার বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলেন যে, অন্য কারও হাতে তাদের মৃত্যু হবে না। যদি মৃত্যু হয় তো পরস্পরের হাতেই পরস্পরের মৃত্যু হবে। এ বর পেয়ে ইন্দ্রলোক, যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসি, নাগ ইত্যাদির ওপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করেন। তখন দেবতা ও মহর্ষিদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক অদ্বিতীয় পরমাসুন্দরি নারী সৃষ্টি করতে বলেন। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের তিল তিল অংশ মিলিত করে বিশ্বকর্মা এক অপরূপ সুন্দরিকে প্রস্তুত করেন। পৃথিবীর সমস্ত উত্তম বস্তুকে মিলিত করে এ নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ব্রহ্মা এর নাম রাখেন তিলোত্তমা। ব্রহ্মা একে সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করার জন্য আদেশ দিলেন। তিলোত্তমা সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট উপস্থিত হলে, তারা এর রূপে মুগ্ধ হয়ে একে হস্তগত করার জন্য নিজেরা ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ বিরোধের ফলে উভয়ে উভয়ের হাতে নিহত হন।

সুগ্রীব

কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালির ছোট ভাই। বাবার মৃত্যুর পর বালি রাজা হন। সুগ্রীব স্ত্রী রুমাকে নিয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকেন। অসুর মায়াবি স্ত্রী-ঘটিত বিরোধে

বালির সাথে যুদ্ধ করতে এলে সুগ্রীব ভাইকে সাহায্য করতে আসেন। ভয়ে মায়াবি গর্তে প্রবেশ করলে বালি সেখানে প্রবেশ করেন এবং সুগ্রীবকে গর্তের দ্বার পাহারা দিতে বলেন। এক বছর সময়েও বালি ফিরে না আসায় সুগ্রীব বালির মৃত্যু হয়েছে মনে করে রাজপদ গ্রহণ ও বালির স্ত্রীকে বিয়ে করেন। পরে অসুরকে হত্যা করে বালি ফিরে এসে সুগ্রীবকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁর স্ত্রী রুমাকে অধিকার করেন। সুগ্রীব ঋষ্যমুক পর্বতে আশ্রয় নেন এবং সেখানে রামের সাথে বন্ধুত্ব হয়। রাম বালিকে হত্যা করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বানিয়ে দেন। সুগ্রীব নিজ স্ত্রী রুমাকে উদ্ধার করেন এবং বালির স্ত্রী তারাকে গ্রহণ করেন। সুগ্রীব বানর সেনাসহ সীতা উদ্ধারে রামকে সাহায্য করেন।

হংস

(১) একজন ক্ষত্রিয় বীর। তাঁর ভাই ডিম্বক। দু ভাই তপশ্চর্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করে বর ও অস্ত্র লাভ করে অজেয় হয়ে ঘোর অত্যাচারি হয়ে ওঠেন এবং একদিন দুর্বাসাকে অপমানিত করে ঋষির কৌপিন ছিন্ন করে দেন। দুর্বাসা নিজের তপস্যা নষ্ট হবে এ আশঙ্কায় এঁদেরকে ভস্মিভূত না করে দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ঘটনা জানান। শ্রীকৃষ্ণ এঁদের বিনাশ করবেন বলে প্রতিশ্রুত হন। বাবার রাজসূয় যজ্ঞে হংস শ্রীকৃষ্ণের কাছ হতে কর যাচঞা করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কর দিতে অস্বীকার করলে উভয়ে যুদ্ধে রত হন। শ্রীকৃষ্ণ হংসকে হত্যা করেন। ডিম্বক ভ্রাতৃশোকে যমুনার জলে নিজের জীবন বিসর্জন দেন। (ডিম্বক দেখুন)

(২) সাধ্যার গর্ভজাত বারো জন পুত্রের মধ্যে অন্যতম।

(৩) ষড়গর্ভ নামে খ্যাত হিরণ্যকশিপুর ছেলেদের অন্যতম।

(৪) সূর্যের এক নাম হংস। তিনি কাশি দর্শন ইচ্ছায় আকাশে অতি দ্রুত গমন করেছিলেন। তাই তাঁর এ নাম হয়।

(৫) ব্রহ্মার বাহন হংস। দক্ষমেয়ের গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে এ হংস ব্রহ্মাকে ফেলে পলায়ন করে। এতে ব্রহ্মা তাঁকে শাপ দেন। পরে ব্রহ্মার নির্দেশে রেবা তীরে ওই হংস এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শাপমুক্ত হয়। (স্কন্দপুরাণ)

হরি

(১) নারায়ণের অপর নাম।

(২) দৈত্যরাজ তাড়কাক্ষের ছেলে। তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে বরলাভ করেন এবং তারই প্রভাবে ত্রিপুরে মৃতসঞ্জীবনি সরোবর নির্মাণ করেন।

সরোবরের এ গুণ ছিল যে, এর মধ্যে মৃত দৈত্য সেনাদের নিক্ষেপ করলে তারা পুনর্জীবিত হয়ে উঠত।

হরিশ্চন্দ্র

হরিশ্চন্দ্র সূর্য বংশের রাজা ত্রিশঙ্কুর ছেলে। তিনি একজন অসাধারণ দাতা ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মহিষির নাম শৈব্যা। শৈব্যার গর্ভে রোহিতাশ্ব নামে তাঁর এক ছেলে জন্মে। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করার জন্য একদিন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সমুদয় রাজ্য দান স্বরূপ গ্রহণ করেন। দক্ষিণার জন্য সপুত্রা শৈব্যা ও পরিশেষে আত্মাকে বিক্রয় করে তাঁকে শ্মশানে চণ্ডালের কর্মে নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে মৃত পুত্রের দাহ্যার্থ শৈব্যা শ্মশানে উপস্থিত হলে হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে একমাত্র পুত্রের জন্য শোক করতে লাগলেন। পরিশেষে বিশ্বামিত্র রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবিত করে তাঁকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করলেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্রের সাথে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

হলায়ুধ

বলরামের অন্য নাম।

হস্তিনাপুর

দিল্লির পূর্বে। মিরাটের নিকট, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।

হারিত

মুণি বিশেষ। তিনি হারিত সংহিতা নামে একখানি স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

হিরণ্যকশিপু

অসুর সম্রাট। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী অদিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। বৈকুণ্ঠে হরির জয় ও বিজয় নামে দু দ্বারপাল ছিলো। একদিন সনন্দাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোকে এলে জয় ও বিজয় তাঁদের অদ্ভুত মুখাকৃতি দেখে পুরির মধ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। তাতে ঋষিরা রেগে গিয়ে তাদের অভিশাপ দেন যে, তারা অসুরযোনি প্রাপ্ত হবে। ঋষিরা দয়াপরবশ হয়ে শেষে বলেন যে, তিন জন্মের পর শাপমুক্ত হবে। এ জয় ও বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, তৃতীয় জন্মে

শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবদানব, মানব বা জন্তু কারও হাতে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয় না। অর্ধনর ও অর্ধসিংহের হাতে তার মৃত্যু হয়। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, দিবসে বা রাত্রে মৃত্যু না হয়ে জানুর ওপর সন্ধ্যাকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিড়িম্বা

হিড়িম্ব রাক্ষসের বোন হিড়িম্বা রাক্ষসি। পাণ্ডবদের হত্যা করতে গিয়ে হিড়িম্বা ভিমের রূপে মুগ্ধ হন এবং সুন্দরি নারীর রূপ ধরে জানান যে তিনি ভিমের অনুরক্তা। প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি বাঁচবেন না বলায় ভিম তাঁর সাথে যৌনসহবাস করেন এবং ভিমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে মহাপরাক্রমশালি ছেলে জন্মে।

হুতাশন

অগ্নির এক নাম। যজ্ঞা দিতে উৎসৃষ্ট সামগ্রি অধিক পরিমাণে ভোজন করে দেবতা ও মহর্ষিরা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হন। তখন তাঁরা প্রতিকার প্রার্থী হয়ে হুতাশনের শরণাপন্ন হন। হুতাশন তাঁদের বলেন– আপনারা আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞাদি কার্যের অন্ন ভোজন করুন, তাহলেই আপনারা অজীর্ণ রোগ হতে মুক্তি পাবেন। এরূপে হুতাশনের দয়ায় দেবতা ও মহর্ষিরা অজীর্ণ রোগ হতে মুক্ত হন। এ জন্য যজ্ঞাদিতে সর্ব প্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করা হয়, তাতে ব্রহ্ম-রাক্ষসরা যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না। (মহাভারত–অনুশাসন)

মহর্ষি ভৃগু একবার হুতাশনকে 'সর্বভুক হও' বলে শাপ দেন। এর উত্তরে হুতাশন বলেন, আমাকে যে আহুতি দেয়া হয়, তাতেই দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন; অতএব আমি সর্বভূক কি করে হবো। এ কথা বলে হুতাশন অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া হতে অন্তর্হিত হলেন। এর ফলে ঋষিরা উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলেন, যিনি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন, তিনি কি করে সর্বভূক হবেন। ব্রহ্মা তখন মিষ্ট কথায় হুতাশনকে বললেন, তুমি ত্রিলোকের ধারয়িতা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক। তুমি সদা পবিত্র, সর্ব শরির দিয়ে তুমি সর্বভূক হবে না। তোমার গুহ্যদেশে যে শিখা আছে এবং তোমার যে মাংসভক্ষক শরির আছে, তাই সর্বভূক হবে। তোমার মুখে যে আহুতি দেয়া হবে, তাই দেবগণের ও নিজের ভাগ রূপে গ্রহণ করো। (মহাভারত– আদি)

ক্ষমা

দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে। দক্ষের চব্বিশটি মেয়ের মধ্যে তিনি একটি। তিনি প্রজাপতি পুলহের স্ত্রী। তাঁর গর্ভে ও পুলহের ঔরসে কর্দম, চার্ববীর ও সহিষ্ণু নামে তিন ছেলে হয়। (গরুড়, কূর্ম ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ)